বাংলাদেশ-ভূটান-মালদ্বীপ সম্পর্ক : ১৯৭১ – ২০০৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদানের শর্তাবলীর অংশবিশেষ পূরণের নিমিত্তে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

সন্‌জিদা খানম

ইতিহাস বিভাগ

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ

নভেম্বর-২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ-ভূটান-মালদ্বীপ সম্পর্ক, ১৯৭১– ২০০৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদানের শর্তাবলীর
অংশবিশেষ পূরণের নিমিত্তে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	০১
ঘোষণাপত্র	০২
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	০৩-০৪
ভূমিকা	০৫-২০
প্রথম অধ্যায় : দেশসমূহের পরিচিতি	
বাংলাদেশ পরিচিতি	২১-২৩
মালদ্বীপ পরিচিতি	২৪-২৭
ভূটান পরিচিতি	২৮-৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায় : পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক দেশসমূহের ইতিহাস ও রাজনৈতিক আলোচনা	
বাংলাদেশের ইতিহাস এবং রাজনীতি	৩৬-৪৩
মালদ্বীপের ইতিহাস এবং রাজনীতি	৪৪-৫০
ভূটানের ইতিহাস এবং রাজনীতি	৫১-৫৫
তৃতীয় অধ্যায় : দেশ সমূহের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা	
বাংলাদেশের অর্থনীতি	৫৬-৬৪
মালদ্বীপের অর্থনীতি	৬৫-৭০
ভূটানের অর্থনীতি	৭১-৭৭
চতুর্থ অধ্যায় : ভূমিকা	**৭৮**
বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি	৭৯-৮৩
মালদ্বীপের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি	৮৪-৮৬
ভূটানের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি	৮৭-৯২

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : পররাষ্ট্রনীতির পর্যালোচনা

ক্ষুদ্ররাষ্ট্র সংজ্ঞায়ন ও তার পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি সমূহ	৯৩-১০৭
বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ	১০৮-১১০
মালদ্বীপের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ	১১১-১১৩
ভূটানের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ	১১৪-১২৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : আঞ্চলিক জোট গঠন

আঞ্চলিক জোট গঠন: সার্ক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সংগঠন	১২৫-১৫১

সপ্তম অধ্যায় : দেশ সমূহের সম্পর্ক আলোচনা

বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ	: (সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক)	১৫২-১৬১
বাংলাদেশ ও ভূটান	: (সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক)	১৬২-১৮৭
মালদ্বীপ ও ভূটান সম্পর্ক	: (সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক)	১৮৮-১৯২

উপসংহার :	১৯৩-১৯৯
গ্রন্থপঞ্জি :	২০০-২০৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সন্‌জিদা খানম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের একজন নিয়মিত গবেষক। তার রেজিস্ট্রেশন নং ৫২। তিনি আমার তত্ত্বাবধায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল ডিগ্রির জন্য "বাংলাদেশ-ভূটান-মালদ্বীপ সম্পর্ক ১৯৭১-২০০৮" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পাদন করেছেন।

এই অভিসন্দর্ভ তিনি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি। আমি তার অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায় পর্যবেক্ষণ করেছি এবং অভিসন্দর্ভটি ইতিহাস বিভাগের এম.ফিল ডিগ্রি প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সুপারিশ করছি।

তারিখ : নভেম্বর ২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে,“বাংলাদেশ-ভূটান-মালদ্বীপ সম্পর্ক ১৯৭১-২০০৮” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণার ফল। এই শিরোনামে ইতিপূর্বে আর কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রকার ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক।

তারিখ : নভেম্বর ২০১৭

সন্‌জিদা খানম
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"বাংলাদেশ-ভূটান-মালদ্বীপ সম্পর্ক ১৯৭১-২০০৮" শিরোনাম নিয়ে আমি আমার এম.ফিল গবেষণার কাজ শুরু করি। অনেকের আন্তরিক সহযোগিতায় আমি আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেছি। যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এমফিল গবেষণার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরীর সাথে দেখা করি, তখন তিনি আমার বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে গবেষণার প্রতিটি ধাপে সাহায্য করেছেন। তিনি প্রতিটি অধ্যায় সংশোধন, সঠিক গবেষণা পদ্ধতি, সার্বক্ষণিক সহযোগিতা, গঠনমূলক পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে আমার এম.ফিল গবেষণা কর্মটি সহজ করেছেন। তাই আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এমফিল গবেষণার প্রথম বর্ষের শিক্ষক ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন এবং ড. আশফাক হোসেন-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। যারা আমার গবেষণা কর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পরামর্শ দিয়েছেন। আমি ভোরের কাগজের সাংবাদিক মাহমুদুল হাসান এর প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি বিভিন্ন বিদেশ সফর সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন। এছাড়া তিনি আমাকে ভূটান এবং মালদ্বীপ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে সহযোগিতা করেছেন। আমি ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, আর্কাইভস, পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বহু তথ্য উপাত্ত দিয়ে যারা সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। মালদ্বীপ এবং ভূটানে কর্মরত অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা আমার গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি সাউথইষ্ট ব্যাংকের নিকট কৃতজ্ঞ, যে প্রতিষ্ঠান আমাকে আমার কাজের ফাঁকে গবেষণার সময় দিয়ে সাহায্য করেছে। আমি আমার বাবা মোহাম্মদ আলী খান এবং স্বামী- শাখাওয়াত হোসেন এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমার বাবা আমাকে অভিসন্দর্ভ সুন্দরভাবে শেষ করার জন্য সব সময়ই উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। তার বড় ইচ্ছা ছিল আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোন একটা ডিগ্রি অর্জন করি। আমার স্বামী আমার গবেষণা কর্মটি যেন সমৃদ্ধ ও সাবলিল হয় সেদিকে সবসময় লক্ষ্য রাখার

উপদেশ দিয়েছেন এবং গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার বিভিন্ন ধাপে তিনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমি অভিসন্দর্ভটি শেষ করতে পেরেছি এজন্য সকলকে ধন্যবাদ।

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্‌জিদা খানম
ঢাকা।

ভূমিকা

“বাংলাদেশ-ভূটান-মালদ্বীপ সম্পর্ক ১৯৭১-২০০৮” এম.ফিল অভিসন্দর্ভের এই আলোচনায় বাংলাদেশ, ভূটান ও মালদ্বীপের বিভিন্ন দিক এবং সহযোগিতার প্রচেষ্টা তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উন্নয়নশীল প্রত্যেকটি দেশ তার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন এবং রাজনৈতিক অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য আঞ্চলিক জোট গঠন করছে। এই সব আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক জোট সফল হলে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পুঁজিবাদী এবং বড় বড় সামরিক শক্তিধর দেশের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। এ তিনটি দেশ ট্রানজিট সুবিধার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রসার ঘটাতে পারে। এছাড়া ট্যারিফমুক্ত বাণিজ্য, মানবসম্পদ রপ্তানি, কৃষি-ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, শ্রমশক্তি আদমানি-রপ্তানি, বিদ্যুৎ, পর্যটন, বাণিজ্য, কারিগরি ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রভৃতির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তাছাড়া এ তিনটি দেশের পার্শ্ববর্তী বড় দেশ ভারত। তাই এ তিনটি দেশের সুসম্পর্কের মাধ্যমে ভারতের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে বলে আশা করা যায়। সুতরাং নিজেদের জাতীয় স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা রক্ষার্থে এ তিনটি দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ, ট্রানজিট, কৃষি, শিক্ষা, মানবসম্পদ রপ্তানি, পর্যটন প্রভৃতির সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।[১] এছাড়া এমফিল অভিসন্দর্ভের এই আলোচনায় বাংলাদেশ-ভূটান-মালদ্বীপ মধ্যকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক সম্পর্কের খুঁটিনাটি দিক ও তিন দেশের সার্বজনীন ধারণা পাওয়া যাবে।

ক. দক্ষিণ এশিয়া ও এর সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে নেপাল, ভূটান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারত মহাসাগরে অবস্থিত শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ার অর্ন্তগত। এসব দেশের অধিকাংশই বিগত কয়েক দশকে স্বাধীনতা লাভ করেছে।[২] দক্ষিণ এশিয়ার মোট আয়তন প্রায় ৪৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮৯২ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতের আয়তন প্রায় ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৯০ বর্গ কিলোমিটার। ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র মালদ্বীপের আয়তন প্রায় ৩শত বর্গকিলোমিটার (বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০০)। সমগ্র এশিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ লোক দক্ষিণ এশিয়ায় বাস করে(বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা ২০০৮)। দক্ষিণ এশিয়া দেশগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অধিক জনসংখ্যা

বৃদ্ধির হার, সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য অত্যন্ত বেশি, অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত ও দরিদ্র। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতা প্রতিটি দেশের সামাজিক অবস্থানকে দুর্বল করে তুলেছে। এসব দেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী লোক বসবাস করে যার মধ্যে বাংলাদেশে ও মালদ্বীপে মুসলিম এবং ভূটানে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ 'দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা' সংক্ষেপে- 'SAARC' গঠন করে। ভারত ব্যতীত সার্কভুক্ত এ দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত।[৩]

দেশ	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যা
বাংলাদেশ **	১,৪৭,৫৭০	০.১৪২৩১৯ কোটি
ভূটান *	৪৭,০০১	০.২৩ লাখ
মালদ্বীপ *	৩০০	০.০৩ লাখ

(বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট ২০০৮ ** ও আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট-২০১১*)

প্রাচীনযুগে এই অঞ্চলে শান্তি বিরাজ করলেও পরবর্তী সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এ অঞ্চলের মানুষ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি এই অঞ্চল থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই অঞ্চলের উপনিবেশিকতার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাই এই অঞ্চলের দেশগুলো সবসময়ই চায় বড় শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে নিজেদের মাঝে বিভিন্ন সহযোগিতার জন্য আঞ্চলিক জোট গঠন করতে। কিন্তু এ দেশগুলো যে কোন সমস্যার সমাধান করতে (তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ সমস্যা, পারস্পরিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক কোন্দলের কারণে) অনেক সময় পরাশক্তির আন্তর্জাতিক কূটনীতির জালে জড়িয়ে পড়ে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষে পরাশক্তির প্রভাব একেবারে এড়িয়ে চলা সম্ভব হয় না। এসব দেশগুলো পররাষ্ট্রনীতিতে সব সময়ই নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বিশ্বাস করে।[৪] তবে এ অঞ্চলের বেশির ভাগ দেশেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজমান। এই অঞ্চলের সমস্যাবলির সঙ্গে সম্পর্কিত বৃহৎ পরাশক্তির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন) প্রভাব ছাড়াও ভারতের প্রভাব বিদ্যমান। দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগলিক অবস্থান, এ অঞ্চলের দেশগুলোকে ভারত অভিমুখী করে তুলেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, কিছুটা মালদ্বীপও। মোটামুটি বলা চলে পাকিস্তান ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্যেকটি

Dhaka University Institutional Repository

দেশ ভারতমুখী। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যা জনগণের মাঝে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে এ অঞ্চলের লোকজন ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকার থেকে কিছুটা বঞ্চিত। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মাঝে কিছু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিদ্যমান। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নেপাল ব্যতীত প্রতিটি দেশই কম বেশি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। প্রত্যেকটি দেশই সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ফলে নিজের স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন। প্রত্যেকটি দেশই তার প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ, ভারত অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও অন্য দেশগুলো অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যার ফলে এ দেশগুলো বরাবরই চেষ্টা করেছে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক জোট গঠন করে ট্রানজিট সুবিধা এবং ট্যারিফ মুক্ত বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে, যার-ই উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল সার্ক।[৫] পৃথিবীর সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত ও রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অঞ্চলের নাম দক্ষিণ এশিয়া। এখানে বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ আছে। মানবসম্পদে আছে মেধাবী ও কর্মক্ষম এক বিশাল তরুণসমাজ। কিন্তু সেই তরুণদের কাজে লাগানোর জন্য যে সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করা দরকার, রাষ্ট্রনেতাদের চিন্তা ও কর্মে তার লক্ষণ দেখা যায় না। বরং তা রা ঐতিহাসিক ভ্রান্তির বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর থেকে জাতিগত ও ধর্মগত অভ্যন্তরীণ বিরোধে এ অঞ্চলের দেশগুলো যেমন ন্যুব্জ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে, তেমনি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও ক্রমাগত শক্তি ক্ষয় করে চলেছে (ব্যতিক্রম ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ)। এই অঞ্চলের সরকারগুলোর নানা দুর্বলতা ও হঠকারিতার পাশাপাশি গণবিরোধী ভূমিকার কথা উঠে আসে। আরও উঠে আসে দক্ষিণ এশিয়া র বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, আন্তরাষ্ট্রীয় ও অভ্যন্তরীণ বিরোধ, পরমাণু অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, আন্তসীমান্ত বিরোধ ও সন্ত্রাসবাদের ভেতর -বাহির। আলোচিত হয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে গণমাধ্যমের দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের বিষয়টি ও। পৃথিবীর সব অঞ্চলেই রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধ আছে। কিন্তু সেই বিরোধ জিইয়ে রেখে কেউ অমঙ্গলকে আলিঙ্গন করেননি, যেমনটি করেছেন দক্ষিণ এশীয় নেতারা। বিভিন্ন অঞ্চলের দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বিরোধ মেটাতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষত কাটিয়ে উঠতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো যে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তারই সফল পরিণতি আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। তারা একটি কার্যকর অর্থনৈতিক জোটই করেনি, অভিন্ন মুদ্রা ও ভিসাও চালু করেছে। এছাড়া কার্যকর আঞ্চলিক জোট গঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় (আসিয়ান), আফ্রিকায় (আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা) ও ল্যাটিন আমেরিকায় (ল্যাটিন আমেরিকান ইকোনমিক কো-অপারেশন)। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার নেতারা সেরকম কার্যকর আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁরা মুখে ঐক্যের কথা বললেও কাজ করেন ঐক্যের বিপক্ষে। তিন দশক আগে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) এখন একটি প্রায় ভঙ্গুর ও অকার্যকর জোটে পরিণত হয়েছে। সার্ক কার্যকর না হওয়ার কারণ কী? অনেকে বলেন ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধ, খানিকটা সত্য। আরও সত্য আছে, এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কও সৌহার্দ্য পূর্ণ নয়। যে প্রতিদান তারা প্রতিবেশীর কাছে আশা করে, সেই প্রতিদান দিতে প্রস্তুত নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি না করেই আসিয়ান দেশগুলো চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগসহ সার্বিক সহযোগিতা বাড়িয়েছে, কিন্তু সার্কভূক্ত দেশগুলো তা পারেনি। এখনো বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকগুলোতে ঘুরেফিরে পুরোনো বিষয়গুলোই স্থান পাচ্ছে- সড়কের গতিবিধি কী হবে, পানিবণ্টন চুক্তি হবে কি না, সীমান্ত বিরোধ মিটবে কবে, ভিসা ব্যবস্থা আরও সহজ করা যাবে কি না ইত্যাদি। এসব সমস্যা জিইয়ে দ্বি-পাক্ষীয় সম্পর্ক খুব বেশি এগিয়ে নেওয়া যায় না। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ২৬ শতাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য হলেও সার্ক দেশগুলোর মধ্যে হচ্ছে মাত্র ৪ দশমিক ৩ শতাংশ, এটি মৈত্রী নয় বৈরিতার লক্ষণ। সম্ভবত দুটি কারণে দক্ষিণ এশিয়ার নেতারা সংকটের সমাধান না করে জিইয়ে রাখেন। প্রথমত, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দেশের জনগণের মধ্যে একধরনের যুদ্ধংদেহী মনোভাব জাগিয়ে রাখা। দ্বিতীয়ত, প্রতিবেশীর কাছ থেকে হুমকি আসতে পারে এই অজুহাতে জনগণকে মৌলিক ও মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা। তবে অনেক দেশের সেই ক্ষমতাও নেই। ১৯৪৭ সালে এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান নেতারা সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ বপন করেছিলেন, সেটাই এখন বিষবৃক্ষে রূপ নিয়েছে। সমূলে এই বিষবৃক্ষের উৎপাটন ছাড়া এ অঞ্চলে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আনা যাবে না। দেশভাগের সময় নেতারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন যে, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করা গেলেও কোন দেশ থেকে ভিন্ন ধর্মালম্বী মানুষকে একেবারে উচ্ছেদ করা যায় না। সংখ্যালঘু নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত ও উৎপীড়িত রেখে দেশকেও খুব বেশি এগিয়ে নেওয়া যায় না। পূর্ব ও পশ্চিমের যেসব দেশ এসব সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে সচেষ্ট হয়েছে, তারা কিছুটা হলেও এগিয়ে গেছে। আর যেসব দেশ গায়ের জোরে ভিন্ন মতকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে, সেসব দেশে ঘোষিত-অঘোষিত গৃহযুদ্ধ চলছে। আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যই হলো সব নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ। দুর্ভাগ্য দক্ষিণ এশিয়ার বেশির ভাগ রাষ্ট্রের অধিপতিরা সেটি বুঝতে চান না। তাঁদের কাছে রাষ্ট্র মানে ব্যক্তি ও

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠীস্বার্থ। তাঁরা রাষ্ট্রীয় বিরোধ জিইয়ে রেখে, প্রতিবেশীকে শত্রুজ্ঞান করে নিজের নীতি ও কৌশল ঠিক করেন। সবকিছু দেখেন সংকীর্ণ জাতীয়তা কিংবা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁরা সীমান্তের ওপার দূরে থাক, নিজ দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছাও বুঝতে চান না।[৬]

ভৌগোলিক দিক থেকে চিন্তা করলে ভূটান এবং মালদ্বীপের অবস্থানগত কারণে এ দুটি দেশ আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। ভূটানের অবস্থান ভারত এবং চীনের মাঝখানে। ভূটানে ভারত বা চীন কেউ-ই-চায় না যুদ্ধ লাগুক। যুদ্ধ হলে এ দুটি দেশ একে অপরের বাধা হয় দাঁড়াবে।[৭] অপরদিকে মালদ্বীপের অবস্থান ভারত মহাসাগরের (Astride line) বরাবর, যা ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের যোগাযোগ রক্ষা করে। সুতরাং ভারত মহাসাগরের যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে মালদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরাশক্তিসমূহ সবসময়ই ভারত মহাসাগরের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট। ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপের কাছে তার অবস্থানই তার সম্পদ এবং দায় (Liability)।[৮] উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি দেশের অসম সামাজিক ব্যবস্থা, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা, দূর্বল প্রশাসন ব্যবস্থা, বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির সংমিশ্রন, দূর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপলব্ধি করা যায়। যা আলোচিত দেশসমূহকে পরাশক্তির মুখাপেক্ষী করে। এই ক্ষুদ্র দেশগুলোর মজবুত কোন সাংগঠনিক জোট-ই পারে এই অবস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজেদেরকে স্বাবলম্বি করে তুলতে।

খ. আন্তর্জাতিক বিশ্ব ও ভারত উপমহাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত গুরুত্ব

ভারত মহাসাগর দখল করে আছে এমন একটি স্থান যা দক্ষিণ এশিয়াকে পরিচালনা করার জন্য সর্বোত্তম ও সুপরিকল্পিত স্থান। জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব অবিচ্ছেদ্যভাবে এর সাথে জড়িত। ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল নিয়ে মহাশক্তিধর দেশসমূহের মধ্যে ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের দখলের উপর অনেক দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন হয়। ভারত মহাসাগরের প্রান্তিক এসোসিয়েশন, আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য রয়েছে; যেমন-বিমসটেক (BIMSTECK), গঙ্গা-মেকঙ্গ (Ganga-mekong) ইত্যাদি। ভারত মহাসাগর হল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। পৃথিবীর মোট জলভাগের ২০ শতাংশ এই মহাসাগর অধিকার করে আছে। এই মহাসাগরের উত্তর সীমায় রয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশ, পশ্চিমে রয়েছে পূর্ব আফ্রিকা, পূর্বে রয়েছে ইন্দোচীন, সুন্দাদ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণে রয়েছে দক্ষিণ মহাসাগর (সংজ্ঞান্তরে অ্যান্টার্কটিকা)। ভারত মহাসাগর বিশ্ব মহাসাগরগুলির সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২০° ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা আটলান্টিক মহাসাগর থেকে এবং ১৪৬.৫৫° পূর্ব দ্রাঘিমা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ভারত মহাসাগরের সর্বউত্তর অংশটি পারস্য উপসাগরের ৩০° ডিগ্রি অক্ষরেখায় অবস্থিত। দক্ষিণ ভাগ (আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত) ভারত মহাসাগরের প্রস্থ প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার (৬,২০০ মাইল)। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরসহ এই মহাসাগরের মোট আয়তন ৭৩,৫৫৬,০০০ বর্গকিলোমিটার (২৮,৩৫০,০০০ বর্গমাইল)। ভারত মহাসাগরের ২৯২,১৩১,০০০ ঘন-কিলোমিটার (৭০,০৮৬,০০০ ঘন মাইল)। মহাসাগরের মহাদেশীয় প্রান্তসীমায় অনেক ছোট ছোট দ্বীপ অবস্থিত। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্রগুলি হল মাদাগাস্কার (বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দ্বীপ), রিইউনিয়ন দ্বীপ, কোমোরোজ, সেচেলেস, মালদ্বীপ, মরিশাস ও শ্রীলঙ্কা। ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ এই মহাদেশের পূর্ব সীমায় অবস্থিত। ভারত মহাসাগরের সাথে সরাসরি মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং ইউরোপ-আমেরিকাসহ পুর্ব এশিয়ার সাথে সামুদ্রিক রুট রয়েছে। ফার্সী উপসাগরীয় অঞ্চল ও ইন্দোনেশিয়ার তেল ক্ষেত্র হতে পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যবহনের সামুদ্রিক পথ ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলো সামুদ্রিক মাছ ধরে অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে যা ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত চিংড়ি ও টুনা মাছ ধরার জন্য রাশিয়া, কোরিয়া, জাপান ও তাইওয়ান এই মহাসাগরকে কাজে লাগায়। সৌদি আরব, ইরান ও ওয়েস্ট অষ্ট্রেলিয়া থেকে এই পথে হাইড্রোকার্বন পরিবহন করা হয়।[৯] বাংলাদেশ, ভূটান ও মালদ্বীপের অবস্থান ভারত মহাসাগরের সামুদ্রিক রুটের পাশে হওয়ায় এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। যারফলে এ তিনটি দেশকে সুদক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ এবং সুনিপুণভাবে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে চলতে হবে নয়তো যেকোন সময় বড় শক্তির কবলে পড়তে পারে যা এদেশগুলোর স্বাধীনতার পূর্ব ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসা পর্তুগিজ, ডাচ্ ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা এসব দেশে প্রথমে ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসলেও পরবর্তীকালে দেশ দখল করে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করে।[১০] যা কোন দেশের জন্য কাম্য নয়। সুতরাং অভিসন্দর্ভে আলোচিত দেশগুলোর অবশ্যই পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুকৌশলী ও যুগোপযোগী নীতিমালা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যকীয়।

গ. কাল বিভাজন

ভারত মহাসগারের কৌশলগত গুরুত্ব ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারত উপমহাদেশ ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ রাজনৈতিক কারণে তৎকালীন বিশ্ব সমাজকে নাড়া দিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে সমর্থন প্রদান করে এবং মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে সাহায্য করে। সোভিয়েতের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে তার প্রতিপক্ষ আমেরিকা ও চীনকে হীনবল করবে।[১১] সোভিয়েত রাশিয়া ভারতকে আশ্বাস দেয় যে যুক্তরাষ্ট্র বা চীন যুদ্ধে সম্পৃক্ত হলে তারা এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই আলোকেই ১৯৭১ সালের আগস্টে ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদিত হয়। আমেরিকা বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করলে সোভিয়েত রাশিয়া এর জবাবে দুটি সাবমেরিন পাঠায়। ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট ছিল পাকিস্তানের প্রধানতম মিত্র এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয়ভাবেই সহায়তা করে। পাকিস্তানের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় আঁচ করতে পেরে নিক্সন ইউএসএস এন্টারপ্রাইজকে বঙ্গোপসাগরে মোতায়েন করেন, যা ভারতীয়রা নিউক্লিয়ার যুদ্ধ শুরু করার হুমকি হিসেবে উল্লেখ করে। এন্টারপ্রাইজ ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর গন্তব্যে পৌঁছায়। যুক্তরাষ্ট্রের এই হুমকির জবাব হিসেবে সোভিয়েত নৌবাহিনী ৬ ও ১৩ ডিসেম্বর নিউক্লিয়ার মিসাইলবাহী দুটি ডুবোজাহাজ ভ্লাডিভস্টক থেকে বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করে, যারা ইউএস টাস্কফোর্স ৭৪-কে ১৮ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে তাড়া করে বেড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র ১৬ ডিসেম্বর নিরাপত্তা কাউন্সিলের আরেকটি অধিবেশনের আহবান জানায়। তবে এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে হতে এবং এতে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, যার ফলে এ অধিবেশনের কেতাবী গুরুত্ব ছাড়া আর কোন অর্থ থাকে না।[১২] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের অবদান অপরিসীম। শরণার্থীদের আশ্রয় প্রদান, প্রবাসী সরকার গঠনে সহায়তা এবং সর্বোপরি মুক্তিবাহিনীর সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্র সরবরাহে ভারতের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ।[১৩] ১৯৭১-সালের শেষভাগে রুশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির মাধমে সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থন নিশ্চিত হওয়ার পর ভারত সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করে যার ফলে এই যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয়নি।[১৪] অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসেবে উল্লেখ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তাদের কিছুই করার নেই বলে অভিমত প্রকাশ করেন। পাকিস্তানের পুরনো বন্ধু চীন কৌশলগত কারণে যুদ্ধ বিরতির জন্যে চাপ প্রয়োগ করেছিল।

অন্যদিকে দীর্ঘ আলোচনার পর ৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে আহবান জানায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে।[১৫] তবে বিশ্বজনমত ছিল পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ মানুষের পক্ষে। পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের বিষয়ে জাতিসংঘের অবহেলা ও নিস্পৃহতা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভূটান ও মালদ্বীপ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তেমন কোন ভূমিকা রাখেনি। ক্ষুদ্র দেশ হওয়ায় এই রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তান - বাংলাদেশ দ্বন্দ্বে নিজেদের জড়াতে চায়নি। তারা এই দ্বন্দ্বকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে প্রথমে মন্তব্য করে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে তারা অস্বীকার করেনি। দক্ষিণ এশিয়ার এদেশগুলো একে একে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আন্তরিকতার দিকে মোড় নিতে থাকে।[১৬] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মালদ্বীপের তেমন কোন ভূমিকা না থাকলেও ভূটানের ভূমিকা বিদ্যমান। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন ও অন্যান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ ভূটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিয়েনপো উদিয়েন তেসারিংকে সম্মাননা প্রদান করেছে। ভূটানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইমতিয়াজ আহমেদ ভূটানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উগিয়েন তেসারিংয়ের হাতে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননার ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেন। ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, ভূটানের পরাষ্ট্রমন্ত্রী লিয়েনপো উগিয়েন তেসারিং ১৯৭১ সালে একজন সমাজকর্মী হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন জানানোর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। গত ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননা জানানোর চতুর্থ পর্বের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ভূটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রদূত ইমতিয়াজ আহমেদ তার হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদ তুলে দেন। ওই অনুষ্ঠানে ভূটানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এবং সংবাদ মাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।[১৭] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্ম, যে কারণে এই সালটি বাংলাদেশের জন্য স্মরণীয়। নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের পরাজিত করে পৃথিবীর মানচিত্রে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে নেয়। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ প্রতিবেশী সকল দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা কামনা করে আসছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়ে ভূটান বাংলাদেশের কাছে ভারতের পরই নিজের স্থান করে নেয়। তখন মালদ্বীপের তেমন কোন ভূমিকা না থাকলেও পরবর্তীতে মালদ্বীপ বাংলাদেশ সম্পর্ক বিভিন্ন সহযোগিতায় মোড় নেয়। বাংলাদেশ, ভূটান এবং মালদ্বীপের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার পর ২০০৮ সালে প্রত্যেকটি দেশে একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন

লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন।[১৮] ২০০৮ সালে ভূটানে নতুন সংবিধান গ্রহণ করা হয়, যেখানে ভূটানের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে।[১৯] মালদ্বীপে ২০০৮ সালে বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে পৃথক করা হয়। মালদ্বীপের সংবিধান অনুযায়ী "বিচারকরা হলেন স্বাধীন শুধু সংবিধান ও আইনের অধীন", এছাড়া ২০০৮ সালে মালদ্বীপে সাধারণ জনগণের বিক্ষোভের ফলে প্রেসিডেন্ট নাশিদের পদত্যাগ মালদ্বীপের রাজনৈতিক পরিবেশকে অস্থিতিশীল করে। সুতরাং লক্ষ্য করলে দেখা যায় ২০০৮ সালে তিনটি দেশের ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে যা প্রত্যেকটি দেশকে নতুনভাবে উদ্দীপনা যুগিয়েছে।[২০] যেকোন দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সে দেশের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রভাব ফেলে। ২০০৮ সালটিও তেমনি আলোচনাধীন তিনটি দেশের উপর বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

ঘ. গবেষণা বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব :

আধুনিক গবেষণা অনুশীলনের ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় যোগ হয়েছে। এই নবতর প্রয়াসের লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও অবস্থা বুঝে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরি করা। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরি করা একটি গবেষণার বিষয়। সমগ্র বিশ্বে প্রতিনিয়ত যা কিছু ঘটছে, সে সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নীতি তৈরি করতে হয়, এর আলোকে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রের পরিবর্তন, আদর্শিক বিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কাঁচামালের অভাব, ভোগ্যপন্যের চাহিদা, পরিবেশ ও প্রতিবেশগত হুমকি এবং এসব ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা। আঞ্চলিকতা ও উপ-আঞ্চলিকতা এসব পর্যায়ে সহযোগিতা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং কৌশলগত অবস্থান নিতে সাহায্য করে। এই আঞ্চলিক সহযোগিতাকে কেন্দ্র করে ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় ৭টি দেশ নিয়ে সার্ক এর জন্ম হয়। কিন্তু এ সাতটি দেশের মধ্যে জনসংখ্যা, আয়তন, সম্পদ, অর্থনৈতিক প্রসার, সামরিক শক্তি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ইত্যাদির কারণে এ অঞ্চলে ভারতের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতের কৌশলগত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলিক সহযোগিতায় কতটুকু ভূমিকা রাখবে তা প্রশ্নাতীত। তাছাড়া বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তা প্রদান ভারত অনেক বড় করে দেখে। আবার ভূটান ছিল ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আশ্রিত দেশ যা ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারত কর্তৃক স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে স্বাধীন হয়। ফলে ভূটান এখনও ভারতের তদারকি এবং সতর্ক প্রহরাধীন বিশেষ করে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতিতে ভূকৌশলগত অবস্থানের কারণে ভারত ভূটানকে নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য মনে

করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত মালদ্বীপকে ভারত নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে দেখতে চায়। ভারত জোট নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, ধর্মনিরপেক্ষতা, অহিংসা, অন্যদেশে হস্তক্ষেপ না করা, বন্ধুপ্রতিম আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথা বললেও তার আদর্শিক ও ইতিবাচক নীতিসূত্রের আড়ালে আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখে। সুতরাং দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর উচিত ভারতের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে অন্য দেশেগুলোর সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা। যেমন- বাংলাদেশ ও ভূটান ট্রানজিট, বিদুৎ উৎপাদন ও বিতরণ অপরদিকে বাংলাদেশ-মালদ্বীপ পর্যটন শিল্প উন্নয়ন এবং জনশক্তি রপ্তানি। এগুলোর সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা এসব অঞ্চলে সুফল বয়ে আনবে। [২১] ইতোপূর্বে বাংলাদেশ-ভূটান এবং বাংলাদেশ-মালদ্বীপ নিয়ে বাংলাদেশে গবেষণামূলক কোন কাজ না হওয়ায় বাংলাদেশের সাথে অপর দুটি দেশের সম্পর্কের স্তর নির্ধারণ একটি কঠিন বিষয়। এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে ভূটান এবং মালদ্বীপের সম্পর্কের প্রাথমিক স্তর নির্ণয়ের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

৬. গবেষণা উপাদান

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনৈতিক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে সঠিক উপাদানের স্বল্পতা একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশ-ভূটান-মালদ্বীপ সম্পর্ক গবেষণার ক্ষেত্রে ভূটান ও মালদ্বীপ দৃশ্যত সফর করতে না পারায় ঐ দুটি দেশের আর্কাইভস ও সরাসরি দলিলপত্র থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যদিও সাক্ষাৎকার, মৌখিক ও লিখিত, অন্যান্য উপাদানের ভিত্তিতে এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করা হয়েছে। যেকোন গবেষণার ক্ষেত্রে দু'ধরনের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়-

(১) মুখ্য উপাদান এবং

(২) গৌণ উপাদান।

(১) মুখ্য উপাদান : মুখ্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে সরাসরি দলিলপত্র, আন্তর্জাতিক রিপোর্ট, বিভিন্ন সরকারি পরিসংখ্যান, তথ্য বিবরণী, বিভিন্ন জরিপ, সাক্ষাৎকার, বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রায় আয়-ব্যয়ের হিসাব, সরকারি দলিলের মাধ্যমে বিভিন্ন চুক্তি, সার্ক-এর সনদ, বাংলাদেশ রাজস্ব বোর্ড, সংবিধান, পররাষ্ট্র ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিবরণী।

(২) গৌণ উপাদান : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষণার ক্ষেত্রে গৌণ উপাদান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে। বাংলাদেশ-ভূটান-মালদ্বীপ সম্পর্কের উপর কোন বিশেষ গ্রন্থ রচিত না হলেও প্রকাশিত আনেক গ্রন্থে এদেশসমূহের সম্পর্কের প্রেক্ষাপট ও রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিক্ষিপ্ত তথ্য বিদ্যমান। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে এ দুটি দেশের সম্পর্কের সূচনা, বাণিজ্যিক সম্পর্ক,

অর্থনৈতিক অবস্থা, নির্ধারকের নিয়ামক, সামাজিক অবস্থা, পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্ক তথ্য নেয়া হয়েছে। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, পি.এইচ.ডি ও এমফিল অভিসন্দর্ভ হতে তথ্য নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ, ভূটান ও মালদ্বীপ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল এর বেশ কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িকী হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া বইপত্র, সাময়িকী পত্র-পত্রিকা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আত্মজীবনী ও গণমাধ্যমকে গৌণ উৎস বিবেচনা করে। এই অভিসন্দর্ভের উৎসের ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে। বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমকেও গবেষণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেতার, বিবিসি, ইন্টারনেট, ভয়েজ অব আমেরিকা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সুতরাং মুখ্য ও গৌণ উপাদানের ভিত্তিতে এমফিল গবেষণার অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে এসব তথ্যের বেশির ভাগই বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে আর্কাইভস থেকে সরাসরি এবং ভূটান ও মালদ্বীপের গ্রন্থাগার থেকে পরোক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

চ. গবেষণা পদ্ধতি

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত ৫টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যথা-

(১) ঐতিহাসিক পদ্ধতি,

(২) আইনগত পদ্ধতি,

(৩) বর্ণনামূলক পদ্ধতি,

(৪) আদর্শভিত্তিক পদ্ধতি এবং

(৫) সমন্বিত পদ্ধতি।

(১) ঐতিহাসিক পদ্ধতি : ইতিহাস থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে Mortan A. Kaplan বলেছেন,"ইতিহাস হচ্ছে এক মহাপরীক্ষাগার সেখানে সকল আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়"।[২২] ইতিহাস ও অতীত থেকে বর্তমানের ক্রমাবস্থা, বিভিন্ন সম্পর্কের গতিধারার দৃষ্টান্ত,আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের নীতিমালা, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। এমনকি ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তগত প্রক্রিয়া, জনমত, দল ও উপদলের স্বার্থ উদ্দেশ্য, অভ্যন্তরীণ ও পরারাষ্ট্রনীতির মধ্যে সম্পর্কের ধারণাটি সম্পর্কে জানা যায়। ইতিহাস যে কোন রাষ্ট্রের সকল কিছুর সাক্ষী হিসেবে থাকে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন- কোন এক সময়ের লিখিত ইতিহাস পরবর্তীকালে সমৃদ্ধ উপাদানের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে, এতে ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট গতিধারার দারুণ অভাব পরিলক্ষিত হয়।[২৩] ঐতিহাসিক পদ্ধতির এই সীমাবদ্ধতা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দলিলের সহযোগিতায় কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করেছি।

(২) আইনগত পদ্ধতি : গবষেণার এই পদ্ধতিতে সাধারণত আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক আইন, চুক্তি ও সংবিধান এর মাধ্যমে আলোচনা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই পদ্ধতি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে, যার ফলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের সব প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মেলে না। তাই বলা যায় এই পদ্ধতির মাধ্যমে কেবল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আংশিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

(৩) বর্ণনামূলক পদ্ধতি : অনেক গবেষক গষেষণার প্রয়োজনে ব্যক্তিগত বিচার ও মতামতের ভিত্তিতে কিছু বিশেষ ঘটনা বা সমস্যা বিশ্লেষণ করে থাকেন। এই পদ্ধতির প্রধান সমস্যা সম্পর্কে H. K. Chhabra বলেন, "Scholars have tended to give some attention to maintain items without giving full attention to any specific problem"।[২৪] বর্ণনার প্রয়োজনে এই পদ্ধতির ব্যবহার করতে হয়।

(৪) আদর্শভিত্তিক পদ্ধতি : পররাষ্ট্রনীতি অধ্যয়নে আদর্শভিত্তিক পদ্ধতির গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম বিশ্বাসের আদর্শের ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতি অধ্যায়ন করার কথা থাকলেও বর্তমানে আধুনিক রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণে আদর্শই একমাত্র পদ্ধতি হতে পারে না। জ্যাঁ জ্যাক রুশো ও ইস্যানুয়েল ইষ্ট আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণের আদর্শভিত্তিক চিন্তা ধারার প্রবর্তনের ওপর জোর দেন।[২৫] বর্তমানে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আদর্শ ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব চলে এবং চূড়ান্ত বিচারে জাতীয় স্বার্থই প্রাধান্য পায়।

(৫) সমন্বিত পদ্ধতি : সমন্বিত পদ্ধতি হচ্ছে বিভিন্ন পদ্ধতির অপরিহার্য অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্যাডেল ফোর্ড, লিঙ্কন ও অলভি এই পদ্ধতির প্রবক্তা।[২৬] তবে একটি মাত্র পদ্ধতি ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক সমস্যার তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সম্ভব না। তাই বিভিন্ন পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণের সমন্বয়ে বিশ্লেষণী কাঠামো গঠন করা অপরিহার্য। ফলে, এসব কারণে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিল বিষয়াদির বিশ্লেষণে একাধিক পদ্ধতির ব্যবহার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহারের পরও অভিসন্দর্ভে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত, ভূটান ও মালদ্বীপের অনেক তথ্য দৈনিক ও মালদ্বীপের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে লিখিত হয়েছে। ভূটান এবং মালদ্বীপের ব্যাপারে প্রাথমিক উৎস এবং পরিসংখ্যানের অভাবে অনেক তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভূটান এবং মালদ্বীপের ভাষা জানা না থাকায়, এ দুটি দেশের ওপর বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় লিখিত তথ্যের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে নির্ভরশীল তথ্য উপস্থাপনের নিরলস প্রচেষ্টা করেছি। দলিল ও অন্যান্য উৎসবের ভিত্তিতে যাচাই করে এবং সাক্ষাৎকার থেকে ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রচনায় সাক্ষাৎকার প্রাথমিক উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয় যা গবেষণার শূন্যতা পূরণ করে। [২৭]

তথ্য নির্দেশ

১. ড. আবুল কালাম,“আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ : তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ”, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৯৯) পৃপৃ-২৩১-৩৫২।

২. ড. আবুল কালাম, পৃপৃ-২৩১-৩৫২। ।

৩. (বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটাশিট- ২০০০), (বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটাশিট- ২০০৮) সূত্র : ওয়েবসাইট।

৪. Md. Abdul Halim,“Principles of International Relations”, (Dhaka University Press Ltd, 1981), p.p.-148-155.
And Emajuddin Ahamed,“Bangladesh and the Policy of Peace and Non alignment”, (Asian Affairs, Voll. III. No.2 June, 1981) p.126

৫. ড. আবুল কালাম, পৃপৃ- ২৩১-৩৫২।

৬. প্রথম আলো ১৫ মার্চ ২০১৪

৭. ড. আবুল কালাম, পৃপৃ- ২৩১-২৫২।

৮. Urmila Phadnis, “Political dynamics of the island state: Comparative stude of SriLanka and Maldives”, (IDSA Journal Vol XII. No. 3 January, March 1980), P-317.

৯. মোস্তফা কামাল, “আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাংলাদেশ”, (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারী ২০০২), পৃ-৭৮।

১০. Ihtesham Kazi, “International Affairs : Global Concerns of the 21st century”, (New Delhi : Pip International Publication, 2008), p.p-34-42.

১১. আশফাক হোসেন, “বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ”, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, মে ২০০২), পৃ-৩৭।

১২. http://bn.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_liberation_war

১৩. আশফাক হোসেন, পৃ-৩৭।

১৪. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন,"বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা", (ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, ১৯৮২) পৃ-৯।

১৫. ঐ, আশফাক হোসেন, পৃ-১১৫ ।

১৬. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন,"বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা", (ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩) পৃ-২৮।

১৭. মাহমুদুল হাসান মনি, রির্পোটার, ভোরের কাগজ, মে ২০১৩। (তথ্য সহযোগিতা)

১৮. Bangladesh Election Commission 18.0.18.1 Constitutional Amendments. (Website).

১৯. টাইমস ওয়ার্ল্ড ২৪ ডটকম /মোঃ/ ১৬ এপ্রিল ২০১৩

and Choden Phuntsho (2007-12-05),"Another Shot at Selection", Kuensel (online). Retrieved 2011-09-18.

২০. Judicial Services Comission of Maldives. (Official Website).

২১. ঐ, ড. আবুল কালাম, পৃপৃ- ২৩১-৩৫২।

২২. Mortan A. Kaplan,"System and process in international politics", (New York : John Wiley and sons, 1957), P-3.

২৩. Mortan A. Kaplan, p.p- 25-26.

২৪. H. K. Chhabra,"Relations of motions foreign policy of Major countries",(Delhi : Surjeet publications, 1983), P.P 3-4.

২৫. James E. Dourgherty and Robert L Ptatt groffjr,"Contending Theories of International Relations",(Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1971), P.P 3-4.

২৬. Norman J. Padelford, George A Lineolon and Lee D. Olvey, "The Dynamic of International Politics",(New York : Maemillan, 1976), P.P 48-50.

২৭. সাক্ষাৎকারের প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Anthony seldom,"Interviews in contemporary history practice and method", (Oxford : Busil Black well Ltd., 1988), P.P -1-16.

গবেষণার পদ্ধতি আলোচনায় গবেষক যেসব গ্রন্থসমূহ থেকে সহযোগিতা পেয়েছেনঃ

(১) ড. আবুল কালাম,"আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোন", (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃপৃ ২২-২৩।

(২) "বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক, ১৯৭১-১৯৮১", আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচডি, পৃপৃ, ১-২৪।

(৩) "বাংলাদেশ-নেপাল সম্পর্ক, ১৯৭১-১৯৮১",সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পি.এইচ.ডি, পৃ-২৬।

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিচিতি

World atlas : Map Of Bangladesh

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ যা সরকারিভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত, যার রাজধানী ঢাকা।[১] ভৌগোলিক সীমানুযায়ী বাংলাদেশের উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার ও জলপাইগুঁড়ি জেলা, মেঘালয় রাজ্য, গারো ও খাসিয়া জয়ন্তিকা পাহাড়ের পাদ্‌ভূমি, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্য,

দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার, পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি বিদ্যমান।[২] ভৌগোলিকভাবে গঙ্গা-ব্রক্ষ্মপুত্রের উর্বর অববাহিকায় অবস্থিত এই দেশটিতে প্রায় প্রতি বছর বন্যা হয়, আর ঘুর্ণিঝড়রও খুব সাধারণ ঘটনা। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ, যার দক্ষিণ-পূর্বাংশে রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত। জলবায়ুর দিক থেকে দেশটি নাতিশীতোষ্ণ। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। কিন্তু আয়তনের হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বে ৯৩তম, ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। তবে ১৯৭৫ সালের তুলনায় বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি (মূল্যস্ফীতি সমন্বয়কৃত) প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং ১৯৯০-এর শুরুর দিককার তুলনায় দারিদ্র্যতার হার প্রায় ২০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।[৩] বাংলাদেশ “Next Eleven” অর্থনীতিসমূহের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য শহরের পরিবর্ধন বাংলাদেশের এই উন্নতির চালিকা শক্তিরূপে কাজ করছে। এর কেন্দ্রবিন্দুতে কাজ করেছে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত শ্রেণির ত্বরিৎ বিকাশ।[৪] বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি. মি. এবং এর মোট ভূ-প্রকৃতির ৭.০ শতাংশ পানি। ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত আদমশুমারীর প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ১.৩৪ শতাংশ। এই আদমশুমারীর প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.২ শতাংশ। উক্ত আদমশুমারীর প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী পুরুষ ও নারীর সংখ্যা, যথাক্রমে ৭ কোটি ১২ লাখ ৫৫ হাজার এবং ৭ কোটি ১০ লাখ ৬৪ হাজার অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অনুপাত, ১০০:১০৩।[৫] ২০০৯ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদন $৭৩.৮৯ বিলিয়ন এবং মাথাপিছু আয় $৪৬৩ (১৫৭তম)। বাংলাদেশের মুদ্রার নাম টাকা। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান। যদিও বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান তথাপি রাজনৈতিক বিধি আইন মূলতবি ছিল বিধায় দুই বছরের জরুরি আইন এর কারণে (১১ জানু ২০০৭-১৭ই ডিসেম্বর ২০০৮) তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশে এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট বিদ্যমান যার নাম জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদের ৩৫০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছে এর মধ্যে ৫০টি মাহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন।[৬]

বাংলাদেশে সাতটি প্রশাসনিক বিভাগ রয়েছে। যথা- বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও রংপুর। এই বিভাগগুলো আবার জেলায় বিভক্ত। বাংলাদেশের জেলার সংখ্যা মোট ৬৪টি। জেলার চেয়ে ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক অঞ্চলকে উপজেলা বা থানা বলা হয়। সারাদেশে উপজেলা রয়েছে

৫০৭টি। এই থানাগুলো ৪,৪৮৪টি ইউনিয়নে; ৫৯,৯৯০টি মৌজায় এবং ৮৭,৩১৯টি গ্রামে বিভক্ত।[৭] বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ এবং সীমিত উচ্চভূমি ছাড়া সমগ্র দেশ এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

- পাহাড়ি এলাকা ।
- সোপান অঞ্চল ।
- প্লাবন ভূমি বা পাললিক সমভূমি অঞ্চল।

➢ পাহাড়ি এলাকা :

পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা নিয়ে পাহাড়ি এলাকা গঠিত।

➢ সোপান অঞ্চল :

ভাওয়ালের গড় ও কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় নিয়ে সোপান অঞ্চল গঠিত।

➢ প্লাবন ভূমি বা পাললিক সমভূমি অঞ্চল :

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের অসংখ্য উপনদী ও শাখা নিয়ে প্লাবন ভূমি গঠিত।

বাংলাদেশ; কমনওয়েলথ, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক, বিমস্টেক, ওআইসি, ডি-এইট এবং ডব্লিউটিও এর অন্যতম সদস্য দেশ। এছাড়া দেশটি জাতিসংঘ এর সদস্য। বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশ মানব উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন- স্বাক্ষরতার হার, নারী-পুরুষ সমতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। তবে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির দরুণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।[৮]

মালদ্বীপ পরিচিতি

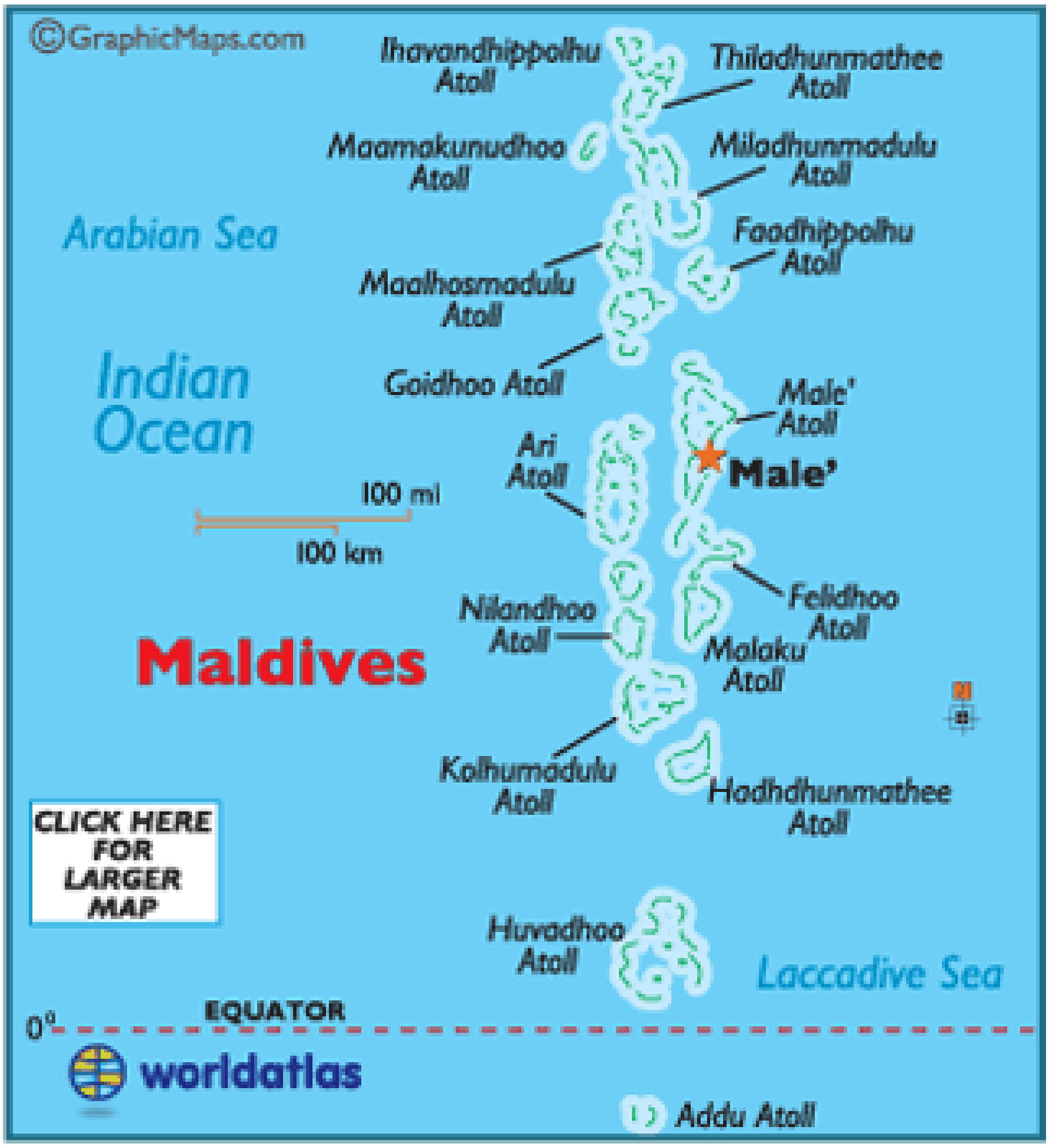

World atlas: Map of Maldives

মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। এর রাজধানীর নাম মালে।[৯] দেশটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক জোট সার্ক এর সদস্য। The Maldives অথবা মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ-এর অফিসিয়াল পরিচিত গণপ্রজাতন্ত্রী মালদ্বীপ হিসেবে।[১০] মালদ্বীপ নামটি সম্ভবত 'মালে দিভেহী রাজ্য' হতে

উদ্ভূত যার অর্থ হল মালে অধিকৃত দ্বীপরাষ্ট্র। কারো কারো মতে সংস্কৃত 'মালা দ্বীপা' অর্থ দ্বীপ-মাল্য বা 'মহিলা দ্বীপা' (নারীদের দ্বীপ)[১১] হতে মালদ্বীপ নামটি উদ্ভূত। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতে এরকম কোন অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়না, তবে প্রাচীন সংস্কৃতে লক্ষদ্বীপ নামক এক অঞ্চলের উল্লেখ রয়েছে। লক্ষদ্বীপ বলতে মালদ্বীপ ছাড়াও লাক্কাদ্বীপপুঞ্জ অথবা চাগোস দ্বীপপুঞ্জকেও বোঝান হয়ে থাকতে পারে। অপর একটি মতবাদ হলো তামিল ভাষায়   'মালা তিভু' অর্থ দ্বীপমাল্য হতে মালদ্বীপ নামটি উদ্ভূত।[১২] মধ্যযুগে ইব নে বতুতা ও অন্যান্য আরব প র্যটকরা এই অঞ্চলকে 'মহাল দিবিয়াত' নামে উল্লেখ করেছেন।[১৩] আরবিতে 'মহাল' অর্থ প্রাসাদ । বর্তমানে এই নামটিই মালদ্বীপের রাষ্ট্রীয় প্রতীকে লেখা হয়। মালদ্বীপ নামটি মূলত উৎপত্তি লাভ করেছে 'Maale Dhivehi Raajje', যা মালদ্বীপের স্থানীয় নাম।[১৪] কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে 'মালদ্বীপ' সংস্কৃত 'Maladvipa' থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যার অর্থ 'পুষ্পসাফল্যের দ্বীপ' (Garland of islands)।[১৫] মালদ্বীপ মূলত বিভিন্ন উপহ্রদ দ্বারা গঠিত, যা দক্ষিণে-ভারতের Lakshaweep দ্বীপ পর্যন্ত (এই দ্বীপের মাঝখানে Minicoy মিনিকউ দ্বীপ ও Chagos Archipelago দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে) এবং শ্রীলঙ্কার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগরের Laccadive সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, শ্রীলঙ্কা হতে আনুমানিক ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ১০১০টি প্রবাল দ্বীপ নিয়ে গঠিত। অনেকে মালদ্বীপকে মহলদ্বীপও বলে। মহল মানে (আরবিতে) প্রাসাদ। সংস্কৃতে মালদ্বীপকে লক্ষদ্বীপও বলা হয়েছে। এর অর্থ লক্ষ দ্বীপের সমাহার। আসলে মালদ্বীপ লক্ষ দ্বীপের সমাহার নয় , রয়েছে ২৬টি অ্যাটোল (অ্যাটোল মানে লেগুন ঘেরা প্রবাল দ্বীপ)। ২৬টি অ্যাটোল আর ১১৯২টি ক্ষুদ্র দ্বীপ, যার মধ্যে কেবল ২০০টি বাসযোগ্য।[১৬]

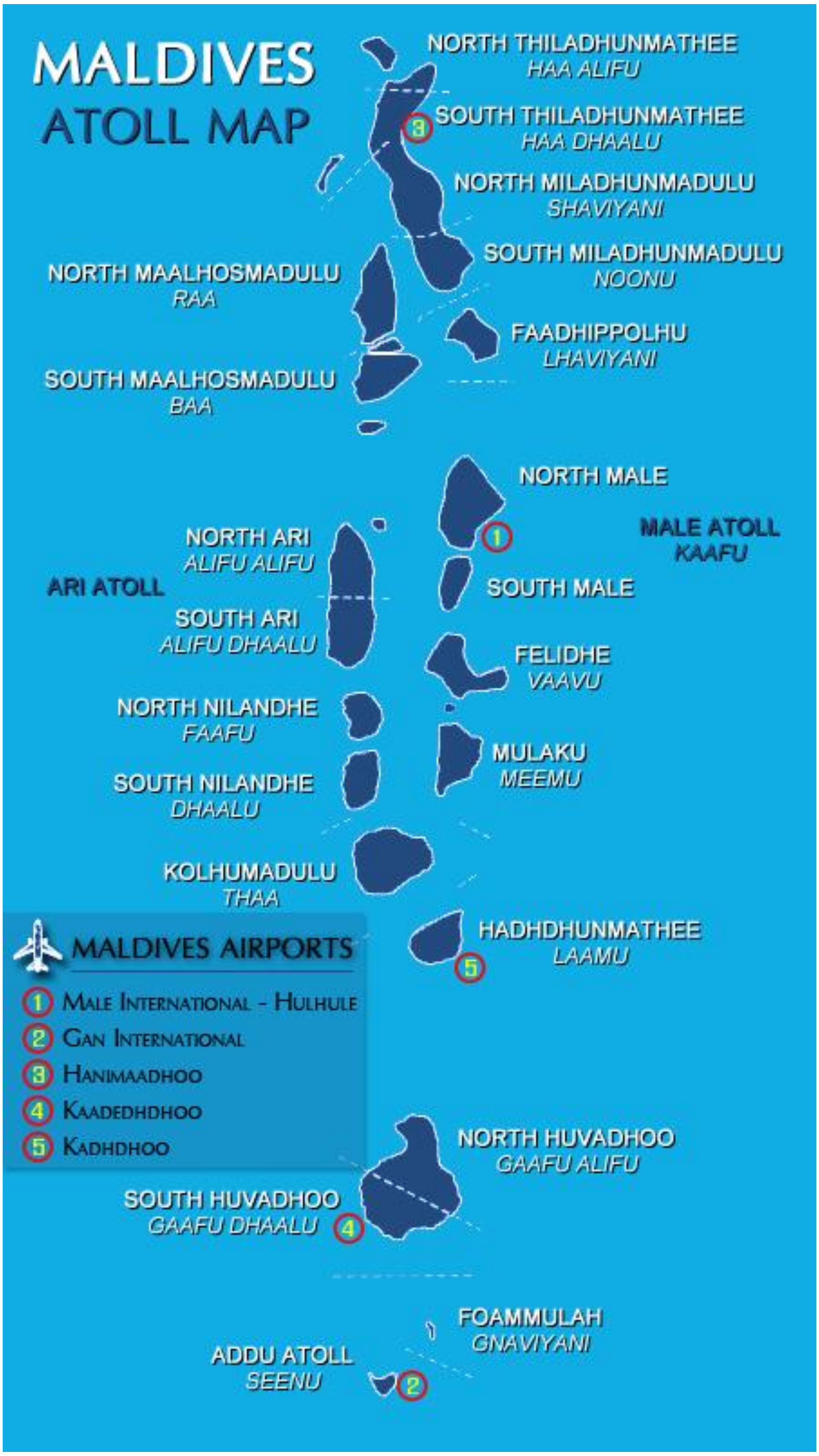

World atlas : Atoll Map of Maldives

প্রাচীন শ্রীলঙ্কার ঐতিহাসিক গ্রন্থে মালদ্বীপকে বলা হয়েছে মহিলা দ্বীপ। পৃথিবীর অন্যতম নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ ভারত মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্র মালদ্বীপ। প্রকৃতি যেন দু'হাত ভরে সাজিয়েছে যা দুনিয়া জোড়া মানুষকে মুগ্ধ করে। প্রতি বছর বিশ্বের নানাপ্রান্ত হতে মানুষ মালদ্বীপের সৌন্দর্য উপভোগ করতে ছুটে আসে। মালদ্বীপ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র দুই মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মালদ্বীপেই বিশালকায় সাবমেরিনে করে সমুদ্র তলদেশ ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে। যার ফলে গভীর সমুদ্রের তলদেশে বিশাল বিশাল মাছ, গাছ-গাছালি, ভয়ংকর প্রাণী, উঁচু-নিচু পাহাড় দেখে পর্যটকরা মুগ্ধ হয়। মালদ্বীপের পর্যটন শিল্পগুলোতে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। মালদ্বীপে আসা বাংলাদেশি পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ মালদ্বীপের রাজধানী মালের বড় মসজিদ। এছাড়া মালদ্বীপের বহু বছরের অনেক ছোট ছোট মসজিদ রয়েছে, যা পর্যটকদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। মালদ্বীপের জাদুঘর পৃথিবীর সমৃদ্ধ জাদুঘরের মধ্যে অন্যতম, যেখানে রয়েছে পুরনো স্থানীয় মুদ্রা, বিশাল-বিশাল মাছের কংকাল এবং মালদ্বীপের লোকজ শিল্পের সংগ্রহ।[১৭] অশোকের শাসনামল থেকেই মালদ্বীপের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং তার পূর্বে সম্ভবত তারা হিন্দু ছিল। ১১৫৩ সালের দিকে মালদ্বীপে ইসলাম ধর্মের সূচনা হয়েছে। ১৫৫৮ সালের দিকে মালদ্বীপ পর্তুগিজদের অধীনে চলে আসে ও ১৬৫৪ সালে ডাচ্‌দের অধীনে চলে যায়। পরবর্তিতে ১৮৮৭ সালে এটি ব্রিটিশরা তাদের অধীনে নিয়ে যায়। মালদ্বীপ ১৯৬৫ সালের ২৬শে জুলাই ব্রিটিশ-এর কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করেছে। ১৯৬৮ সালে মালদ্বীপে সুলতানাত পর্বের সমাপ্তি ঘটে ও গণপ্রজাতন্ত্রী মালদ্বীপের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[১৮] ১৯৯৮ সালে মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে বাংলাদেশের আবাসিক মিশন খোলার পর থেকে দুদেশের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়। মালদ্বীপের অফিসিয়াল ভাষা Dhivehi, জাতীয়তা মালদ্বিভিয়ান এবং সরকার ব্যবস্থা Presidential Republic (রাষ্ট্রপতির গণপ্রজাতন্ত্র)।[১৯] মালদ্বীপের মোট আয়তন ৩০০ বর্গ কি. মি.।[২০] মালদ্বীপের জনসংখ্যা ২৯৮,৮৪২ (২০০৬ জরিপ) এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি. এ ১,১০৫। মালদ্বীপের মুদ্রার নাম মালদ্বীভিয়ান রুপিয়া। মালদ্বীপ জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ছোট ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের একটি দেশ। [২১]

ভূটান পরিচিতি

Visit Bhutan.com : Map of Bhutan

পূর্ব হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ভূটান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।[২২] ভূটান হল দক্ষিণ এশিয়ার সম্পূর্ণ স্থলবেষ্টিত একটি দেশ, যা হিমালয় পর্বতের পূর্ব প্রান্তের শেষে অবস্থিত। ভূটানের দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে ভারত এবং উত্তরে চীনের তিব্বত অবস্থিত।[২৩] ভূটান ভারতের একটি রাষ্ট্র সিকিম দ্বারা নেপাল থেকে পৃথক হয়েছে।[24] ভূটানের উত্তরাংশ বরফাবৃত ও পবর্তময়। মধ্যভাগের উপত্যকা অঞ্চলের উর্বর ভূমিতে অধিকাংশ লোক বাস করে।[২৫] ভূটানের জলবায়ু উত্তরে আল্পীয়, মধ্যভাগে নাতিশীতোষ্ণ এবং দক্ষিণে উপক্রান্তীয়, জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। স্থলবেষ্টিত দেশ ভূটানের আকার, আকৃতি ও পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি অনেকটা সুইজারল্যাণ্ডের সদৃশ বলে দেশটিকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ড বলে ডাকা হয়, এর প্রায় ৭০% এলাকা অরণ্যাবৃত।[২৬] ভূটানের চিড়িয়াখানায় একটি মাত্র প্রাণীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, এটি ভূটানের জাতীয় প্রাণী যার নাম টাকিন। এই প্রাণীটি গরু এবং ছাগলের একটি শংকর, মুখটা ছাগলের মতো আর শরীর গরুর মতো।[২৭] ভূটানের আয়তন ৪৭,০০১ বর্গকিলোমিটার।[২৮] এর রাজধানী থিম্পু। ভুটানের রাজধানী থিম্পু, দেশটির মধ্য পশ্চিম অংশে অবস্থিত। ভূটানের উল্লেখযোগ্য শহরগুলো হলো পারো,

ফোয়েন্তশোলিং, পুনাখা ও বূমথং। এর ভূ-প্রকৃতি পর্বতময়। ভূটান চার ঋতু বিদ্যমান- বসন্তকাল, গ্রীস্মকাল, শরৎকাল এবং শীতকাল (Spring, Summer, Autumn and Winter)। ভূটানের উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা, মধ্য ও দক্ষিণভাগে নিচু পাহাড় ও মালভূমি এবং দক্ষিণের প্রান্ত সীমানায় রয়েছে সাভানা তৃণভূমি ও সমভূমি। ভূটানের মধ্যভাগে যে মালভূমি রয়েছে তার মধ্যকার উপত্যকাগুলিতেই বেশির ভাগ লোকের বসবাস।[২৯]

Visit Bhutan.com : Map of Bhutan

ভূটানের অধিবাসীরা ভূটানিজ নামে পরিচিত। ভূটানের রাষ্ট্রধর্ম ভাজ্রায়ানা বুদ্ধিজম (Vajrayana Bbuddhism) এবং অধিকাংশ জনসংখ্যাই হল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।[৩০] এছাড়াও হিন্দু ধর্ম হল ভূটানের দ্বিতীয় আধিপত্যশীল ধর্ম।[৩১] ভূটানের রাজধানী ও বৃহৎ শহর হল থিম্পু যার আয়তন ৪৭,০০১ বর্গকি.মি, জনসংখ্যা ০.২৩ কোটি এবং প্রতি বর্গকিলোমিটার এ জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৪। ১৯ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৯০৭) ডিসেম্বর থেকে ভূটানে Wangchuk Dynasty শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ রাজতান্ত্রিক শাসনের পর ২০০৮ সালের মার্চ

মাসে ভূটানে সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) এবং দ্রুক ফুয়েনসাম সোগপা (ডিপিটি)/ভূটান পিস এ্যাড প্রসপারিটি পার্টি নামে দুটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নেয়। এর মাধ্যমে শতাব্দীর প্রাচীন রাজতন্ত্রের বিলোপ হয়। ডিপিটি ৪৪ টি আসন এবং পিডিপি অবশিষ্ট ৩টি আসন লাভ করে। ১৮ জুলাই ২০০৮ ভূটানের পার্লামেন্টে নতুন সংবিধান পাস হয়। ২৭ বছর বয়সী রাজা জিগমে খেসার নামগায়েন ওয়াংচুক সোনালি কালিতে সংবিধানের মূলকপিতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে ভূটানে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান।[৩২] ভূটানের সাংবিধানিক নাম 'কিংডম অফ ভূটান'। ভূটান হল দক্ষিণ এশিয়ার সম্পূর্ণ স্থলবেষ্টিত একটি দেশ। ভূটান জাতিসংঘ ও সার্কের অন্যতম একটি সদস্য রাষ্ট্র। ভূটানের স্বাক্ষরতার হার হল ৫৯.৫ শতাংশ। ভূটানের অধিবাসীদের গড় আয় ৬৬.২ বছর। তবে নারীর ক্ষেত্রে ৬১ বছর ও পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৪.৫ বছর।[৩৩] ভূটানের অধিবাসীরা তাদের দেশকে "Druk Yul" নামে অভিহিত করে যার অর্থ "Land of the Thunder Dragon" (ড্রাগনের বজ্রধ্বনির দেশ)।[৩৪] ভূটান পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম একটি বিচ্ছিন্ন দেশ। কিন্তু ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক ও ক্যাবল টেলিভিশনের ব্যবহার এই বিচ্ছিন্নতার রুদ্ধ দ্বারকে অনেকাংশে উন্মুক্ত করেছে। তথাপি, ভূটান আধুনিকায়নের সাথে তার প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুপম সমাবেশ ঘটিয়েছে। ২০০৬ সালের "Business Week" ভূটানকে এশিয়ার অন্যতম সুখী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে।[৩৫] ভূটান সরকার তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে অক্ষুন্ন রাখার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে যদিও ভূটানিজরা বিদেশে ভ্রমন করে। কিন্তু অনেক পর্যটকদের কাছে ভূটান অপ্রবেশযোগ্য। ভূটান ভ্রমণ অনেক বেশি ব্যয়বহুল হওয়ায় পর্যটকরা ভূটান ভ্রমণে কম আগ্রহী। বাংলাদেশ ও ভারতের নাগরিকদের জন্য ভূটানে প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত, কিন্তু অন্যান্য দেশের জনগণকে ভূটানিজ ট্যুর গাইডে স্বাক্ষর করতে হয় এবং এর জন্য প্রতিদিন ব্যয় হয় USD.200। ভূটানে এককভাবে কোন পর্যটক ভ্রমণ করতে পারেনা। এমনকি ভারত ও বাংলাদেশে অধিবাসীদেরকেও নিরুৎসাহিত করা হয়। ভূটানে কোন ভারতীয় ও বাংলাদেশিদের আত্মীয় অবস্থান করলে ভ্রমণে কোন বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় না।[৩৬]

এই অধ্যায়ে তিনটি দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচনার মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশ-মালদ্বীপ ও ভূটানের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সামঞ্জস্য রয়েছে, যা তিনটি দেশের মধ্যে গভীর বন্ধত্বপূর্ণ

এবং সহযোগীতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যপারে অত্যন্ত সহায়ক। তিনটি দেশেরই ভৌগলিক অবস্থান, রাজনৈতিক মতাদর্শ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি নিজেদের মধ্যে দৃঢ় সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যপারে অত্যন্ত উপযোগী। বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও ভূটানের অবস্থান ভারত মহাসাগরের সামুদ্রিক রুটের পাশে হওয়ায় এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক। বাংলাদেশ-ভূটান-মালদ্বীপ সম্পর্ক গবেষণা করতে গেলে প্রথমেই তিনটি দেশের পরিচিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন। তারই নিমিত্তে আলোচ্য তিনটি দেশের সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য ও সমৃদ্ধ পরিচিতি প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হল। পরবর্তী অধ্যায়ে এই দেশ তিনটির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো পর্যায় ক্রমে আলোচনা করা হলো।

তথ্যনির্দেশ

১. Verinder Grover,“Asian countries politices & government”,Chapter- “Bangladesh”, (New Delhi : Deep and Deep, 2000), P-822, ISBN-8171009425,

২. htt://www.answers.com/topic.bangladesh#ixzzlnz24XFC.

৩. Latest Sigar from the world bank development indicators database is 1090 per km^2. (Website)

৪. Investment Bank Goldman Sachs of America, আমেরিকার গোল্ডম্যান স্যাকস বিনিয়োগকারী ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত। (Website)

৫. ২০১১ সালে অনুষ্টিত আদমশুমারীর প্রাথমিক হিসাব । সূত্র : ওয়েবসাইট)।

৬. Ihtesham Kazi,“International Affairs Global Concerns of the 21st century”, (New Delhi : Pip International Publication 2008), p-101.

৭. The CIA World Fact Book, 2005.(Official Website).

৮. বাংলাদেশ ভূ-প্রকৃতি (সূত্রঃ ওয়েবসাইট)।

৯. Verinder Grover,“Asian countries politices & government”,Chapter- “Maldives”, (New Delhi : Deep and Deep, 2000), P-2, ISBN-8171009425,

১০. David Levinson, “Ethnic groups worldwide”, A ready reference handbook. (Oryx Publishers:1947). ISBN 978-1-57356-019-1.
And Verinder Grover, “Asian countries politices & government”,Chapter- “Maldives”, (New Delhi : Deep and Deep, 2000), P-2, ISBN-8171009425.

১১. Cologne Digital Sanskrit Lexicon (from Monier-Williams' 'Sanskrit-English Dictionary') mahilā f. (accord. to Un2. i , 55 fr. √1. mah) a woman , female Hit. Sa1h. (cf. mahelā dvīpa mn. (fr. dvi ap Pa1n2. 5-4 , 74 ; vi , 3 , 97) an island, peninsula , sandbank RV.S3Br.MBh.&c dvīpa p=813, 3 [L=163636] f. a wreath, garland , crown Gr2S3rS. MBh. &c (webside).
And Press : time news bd.com 19 january, 2014

১২. Oxford English Dictionary.

১৩. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যের জন্য- Ibn Batuta,"Travels in Asia and Africa",Translated by A.R.Gibb. p.p-1325-1354, The Adventures of Ibn Battuta : A Muslim Traveller of the Fourteenth Century,

And http://www.answers.com/topic/maldives.

১৪. Ibid, Verinder Grover, "Asian countries politices & government", Chapter- "Maldives", (New Delhi : Deep and Deep, 2000), ISBN-8171009425.

১৫. Hogendorn Jan Johnson marion, "The Shell Money of the Slave Trade", p. 20-22. and. Jump up to : Hogendorn Jan and Johnson Marion (1986). "The Shell Money of the Slave Trade". African Studies Series 49, (Cambridge University Press, 1986), Cambridge ISBN 0521541107, p.p. 20–22.

১৬. Muhammadu Ibrahim Lutfee, Divehiraajjege Jōgrafīge Vanavaru. G. Sōsanī. Malé 1999 (web), And https://en.wikipedia.org/wiki/maldives.

১৭. Interview of Rahat Khan, Ex. Editor, The Daily Ittefaq, 2013.

১৮. New Encyclopedia Britannica,Volume-7, MACROPEDIA, (Peter B. Norton President and Chief Executive Officer, Joseph j. Esposito, President Publishing, 15th edition 1968), p.732.

১৯. David Levinson, "Ethnic groups worldwide", A ready reference handbook. (Oryx Publishers 1947) ISBN 978-1-57356-019-1.

২০. বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা ২০০৮। (সূত্রঃ ওয়েবসাইট)।

২১. ড. আবুল কালাম, "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ : তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ",

(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, নভেম্বর- ১৯৯৯), পৃ-২৭১।

বিস্তারিত দ্রষ্টব্যের জন্য- Clarence Maloney, People of the Maldive Islands orient longman,Review (Website),Maloney Clarence, "Maldives pepole", International Institute for Asian Studies Retrieved - 22 june, 2008.

২২. Economic and Political Relations between Bhutan and Neighbouring Countries. A Joint Research Project of The Centre for Bhutan studies (CBS) and Institute of Developing Economies, Section-2, p-81 (PDF BOOK). (online)

২৩. Verinder Grover,“Asian countries politices & government”,Chapter-“Bhutan”, (New Delhi : Deep and Deep, 2000), P.P-1,31, ISBN-8171009425.

২৪. www.loc.gov (Website).

২৫. Social Sceience,(Class Six Capter South Asia) Published by Bangladesh Govt.

২৬. Verinder Grover,“Asian countries politices & government”,Chapter-“Bhutan”, (New Delhi : Deep and Deep, 2000), P-31, ISBN-8171009425.

২৭. Tourism sector of Bhutan. (Official Website)

২৮. বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা ২০০৮। (সূত্রঃ ওয়েবসাইট)।

২৯. Ibid, Interview.

৩০. Insights into Buddha Dordenma Project and Bhutan World Almanac and Book of Facts (2008): (752-753). World Population Prospects- The 2006 Revision, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (online)

৩১. Kuensel Newspaper - Durga Puja in the capital (Website).

৩২. Coronation (Website).

৩৩. World Population Prospects- The 2006 Revision, United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (online)

৩৪. www.loc.gov (Website).

৩৫. The Worlds Happiest Conuntries, Business Week-11October, 2006. And Royel Govt.of Bhutan 2000 : Development Towards Gross National Happiness, p.p-15-23. And Ministry of finance (2000), Development towards Gross National Happiness, Royel Govt.of Bhutan, Thimphu.

৩৬. Bhutan foreign ministry. (gov. website)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের ইতিহাস এবং রাজনীতি

বাংলা চার হাজার বছর পূর্বের সভ্যতার অংশবিশেষ যখন বাংলায় দ্রাবিড়, তিব্বতি-বার্মান এবং অষ্ট্রো-এশিয়াটিক জাতিগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছিল। বাংলা শব্দের উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস জানা সম্ভব হয়নি, তবে ধারণা করা হয় যে ১০০০ বিসিতে দ্রাবিড়ীয় ভাষাভাষি (Bang) ব্যাংগ উপজাতি থেকে বাংলা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।[১] তবে প্রাচীন যুগে এ অঞ্চলের কোনো বিশিষ্ট নাম ছিল না। বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, রাঢ়, পুণ্ড্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। এসব জনপদ একত্রে 'বাংলা' অথবা "বাঙ্গালা" নামে সর্বপ্রথম পরিচিত হয়েছিল মুসলমানযুগে। সপ্তম শতাব্দীতে গঙ্গারিডাই (Gangaridai) রাজ্যে ইন্দো-আর্যদের আগমন ঘটে।[২] পরবর্তীকালে গঙ্গারিতাই রাজ্যবিহারে সংযুক্ত হয়। বাংলায় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্ত ও হর্ষ (Harsha) সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এই সাম্রাজ্যের পতনের পর শশাঙ্ক গতিশীল ও কার্যকর একটি রাজ্য গড়ে তোলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে শশাঙ্ক প্রথম স্বাধীন শাসক ছিলেন বলে মনে করা হয়। রাজা শশাঙ্কের পতনের পর বাংলায় অরাজকতা দেখা দেয়।[৩] এরপর বৌদ্ধ পালবংশ চারশত বছর ধরে বাংলায় রাজত্ব করে।[৪] এছাড়াও হিন্দু সেনবংশ কিছু কাল বাংলা শাসন করে।[৫] বার শতাব্দীতে বাংলায় ইসলাম ধর্মের সূচনা ঘটে আরব মুসলিম ব্যবসায়ী ও সুফী মিশনারিজ এর মাধ্যমে। এছাড়াও মুসলিম বিজয়ী শাসকরা বাংলায় ইসলাম ধর্মের বিস্তারে ভূমিকা রাখে। তুর্কি সৈনিক বখতিয়ার খিলজি সেন বংশের শাসক লক্ষণসেন কে পরাজিত করে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চল দখল করেন।[৬] এরপর কয়েকশত বছর সুলতান ও সামন্ত শাসকরা বাংলা শাসন করেন।[৭] মুঘল সাম্রাজ্য ১৬শতাব্দীতে বাংলা শাসন করে এবং ঢাকা ছিল মুঘল প্রশাসনিক কাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক কেন্দ্র।[৮] ইউরোপীয় বনিকরা ১৬শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলায় আগমন করে।[৯] ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে ব্রিটিশ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী শাসন ক্ষমতা দখল করে।[১০] ১৮৫৭ সালে রক্তক্ষয়ী সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। যার ফলে ব্রিটিশ শাসকদের টনক নড়ে ওঠে।[১১] ঔপনিবেশিক শাসনামলে

ভারতীয় উপমহাদেশে ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয় যা ৫০ লাখ মানুষের জীবনহানি ঘটায়।[১২] ১৯০৫-১৯১১ সালের মাঝে বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করার নিষ্ফল প্রচেষ্টা গৃহীত হয়।[১৩] ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে, বাংলার পূর্বপ্রান্ত মূলত ধর্ম সংক্রান্ত কারণে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয় ও পশ্চিমপ্রান্ত ভারতের সাথে সংযুক্ত হয়। পূর্ব বাংলা প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা।[১৪] ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলায় ভূমি সংস্কার আইন প্রবর্তিত হয় এবং সামন্ততান্ত্রিক জমিদারি ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে।[১৫] অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যা তাত্ত্বিকভাবে পূর্ব বাংলা সমৃদ্ধশালী হলেও পাকিস্তানসরকার পূর্ব বাংলায় তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানসরকারের আধিপত্য ধ্বংসের বলিষ্ঠ আহব্বান। পূর্ব বাংলার জনগণের বিশাল অসন্তুষ্টি থেকে ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ গঠিত হয়।[১৬] পূর্ব বাংলার মানুষের প্রতিবাদের ভাষাকে আরও দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করে গড়ে তোলার জন্য ১৯৬০ সালে আওয়ামী লীগ স্বায়ত্বশাসনের জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ে।[১৭] ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাবদ্ধ করা হয় এবং ১৯৬৯ সালের অ-নির্ধারিত গণ-অভ্যুত্থানের কারণে শেখ মুজিবুর রহমানকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।[১৮] ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আকারে সাইক্লোন আঘাত হানে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে ব্যাপক উদাসীনতা দেখায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ব্যাপক ভোটে জয়লাভ করে।[১৯] এরপর ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনায় বসেন। ইয়াহিয়া খানের আদেশে ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাবদ্ধ করা হয় এবং অপারেশন সার্চলাইট পরিচালিত হয়।[২০] এরপর পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাংলার জনগণের উপর ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের এ হত্যাযজ্ঞের লক্ষ্য ছিল বাংলার বুদ্ধিজীবীরা। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামে যে দেশটি হয়েছিল, তার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান শোষণ, বৈষম্য, নিপীড়নের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী নয় মাসের যুদ্ধের পর ত্রিশলক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সূচনা ঘটে। বাংলাদেশের গণ-পরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন করা হয় ১২ই অক্টোবর ১৯৭২ সালে। বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের সংসদীয় নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে

সারাদেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের সূচনা ঘটে এবং ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান এক দলভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক আইন বাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন।[২১] ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। পরবর্তীকালে জেনারেল জিয়াউর রহমান বহুদলীয় রাজনৈতিক শাসনের প্রবর্তন করেন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ও তাঁর শাসনব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৮২ সালে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ শাসন ক্ষমতা দখল করে এবং এর বিস্তার ছিল ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জিয়াউর রহমানের বিধবা স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জন করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে বেগম খালেদা জিয়া প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। তবে পরবর্তীকালে ২০০১ সালে পুনরায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতা লাভ করে।[২২] ২০০৭ সালের ২২শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচন অনির্ধারিতভাবে মূলতবি ঘোষণা করা হয় এবং ২০০৭ সালের ১১-ই জানুয়ারি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মনোনীত হন ফখরুদ্দিন আহমেদ। এ সময় দেশে ব্যাপক দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক সহিংসতা দেখা দেয়। নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অনেক বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও অফিসিয়াল, দলীয় ব্যক্তি দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয় ফখরুদ্দিন আহমেদ নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রধান দুটি দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে আটক করে রাখা হয়। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। সংসদীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় আওয়ামী লীগ সংসদের ৩০০ সিটের মধ্যে ২৩০ সিট লাভ করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা জয়লাভ করেন এবং ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারিতে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।[২৩] বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান।[২৪] প্রধানমন্ত্রী এককক্ষ বিশিষ্ট সংসদ এর অর্ন্তগত। বাংলাদেশের ১৮ বছর বয়সী সকল নাগরিকের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে পাঁচবছর মেয়াদী সরকার গঠন করা হয় যার নাম জাতীয় সংসদ। পার্লামেন্ট ভবনটি

জাতীয় সংসদ ভবন নামে পরিচিত। যার স্থপতি হলেন লুই আইকান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান, যিনি কেবিনেট গঠন করেন ও রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্যাবলি পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রের প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির পদ একটি আনুষ্ঠানিক পদ যা পার্লামেন্টের ভোটে নির্বাচন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ বেড়ে যায়। কারণ সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থার আসনে রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। বিচারকরা রাষ্ট্রপতি দ্বারা নির্বাচিত হয়। বিচার সম্বন্ধীয় এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দুর্বল এবং দুর্নীতির উর্ধ্বে নয়।[২৫] ২০০৭ সালের ১লা নভেম্বর বিচার বিভাগ থেকে নির্বাহী বিভাগের পৃথকীকরণ ঘটেছে। বিচার সংক্রান্ত আইনগুলো মূলত ইংরেজি সাধারণ আইনকে শিথিলভাবে গ্রহণ করেছে এবং পারিবারিক আইন মূলত বিবাহ, উত্তরাধিকার আইন ধর্মীয় গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে।[২৬] বাংলাদেশের প্রধান দুটি দল হল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। খালেদা জিয়া দ্বারা পরিচালিত বিএনপি, জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে জোট সরকার গঠন করে থাকে। অপরদিকে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা আর মিত্রতা ঘোষণা করেছেন বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর সাথে। বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা সবচেয়ে তিক্ততাপূর্ণ প্রতিপক্ষ, যারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এছাড়াও বাংলাদেশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দল হল জাতীয় পার্টি দল, যা পরিচালিত হয়েছে সামরিক শাসক এরশাদের দ্বারা। ছাত্ররাজনীতি বাংলাদেশে বেশ সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে। ছাত্ররাজনীতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের দুটি ইসলামী দল হলো জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (JMJB) এবং জমায়েতুল মুজাহেদীন বাংলাদেশ (JMB)।[২৭]

তথ্যনির্দেশ

১. James Heitzman and Robert L. Worden,“Early History, 1000 B.C.-A.D. 1202”, Bangladesh : A country study,(Library of Congress-1989.) ISBN 8290584083. OCLC 15653912.

And Website: http://memory.loc.gov/frd/cs/bdtoc.html

২. ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম, ড . আব্দুল মমিন চৌধুরী, ড . এ .বি.এম.মাহমুদ, ড . সিরাজুল ইসলাম, “বাংলাদেশের ইতিহাস”, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৯ ও পরবর্তী সংযোজন), পৃপৃ-২৪-৩১।

৩. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম,পৃ- ৬৫।

৪. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম,পৃ.৭১,

And Abdul Momin Chowdhury,“Dynastic History of Bengal”, (Dacca : Asiatic society of Pakistan,1967, Appendix-1), pp. 271-275.

http://wwwdli.ernet.in/handle/2015/148627 (online)

৫. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম,পৃ. ১২৫।

৬. Eaton, “The Rise of Islam and the Bengal Frontier”,(University of California Press-1996), ISBN 0-520-20507-3. OCLC 26634922 76881262.

৭. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম , পৃপৃ. ১৫৩ ও ১৭৬। বিস্তারিত দ্রষ্টব্যের জন্য A. M. Chowdhury, “Dynastic History of Bengal 750-1200AD”, (Dacca: Asiatic society of Pakistan, 1967, Appendix-1), pp.252-258. And Indian Historical Quarterly, xxx, p.134.

৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্যের জন্য - Bharadwaj,“The Ancient Period”, in RC Majumder, “History of Bengal”,(Delhi : B. R. Publishing Crop, 2003).

৯. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম, পৃ.২৫৮ ও ৩০৯।

১০. Dravidian James Baxter,-c(1997),"Bangladesh, from a nation to a state",(Westview press-1997).pp30-80, ISBN-0-8133-3632-5 OCLC47885632. (online)
And "Maldives". Dictionary.reference.com. Retrieved 2 April 2013.

And World Wildlife Fund (2001)."Maldives-Lakshadweep-Chagos Archipelago tropical moist forests", WildWorld Ecoregion Profile, National Geographic Society, Archived from the original on 2010-03-08, Retrieved 30 December 2010.

১১. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম ,পৃ.৩৯৭।

১২. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম,পৃ. ৩৩৭।

১৩. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম, পৃ . ৪০৩। And Sen Amartya,"Poverty and Famines", (Oxford University Press, 1973), ISBN 0-19-828463-2. OCLC 10362534 177334002 191827132 31051320 40394309 53621338 63294006 (online)

১৪. ^ Collins L : D Lapierre, "At Midnight", (New Delhi : Vikas Publishers, 1986). ISBN 0-7069-2770-2.

১৫. Baxter,C (1997) "Bangladesh, from a Nation to a State", (Westview Press,1997)

ISBN 0-8133-3632-5. OCLC 47885632, P.72

And Banglapedia, National Encyclopedia of Bangladesh Land Reforms,Wikipedia, Bangladesh Awami League

১৬. ^ Baxter, P.P.62-63,

এবং প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম,পৃ-৪৫৫।

And Al Helel Bashir, "Language Movement", In Islam Sirajul Jamal Ahmed, Banglapedia : National Encyclopedia of Bangladesh(Second.ed), Asiatic Society of Bangladesh.

১৭. প্রাগুক্ত,ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম, পৃ.৪৬৬।

১৮. প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম, পৃপৃ ৪৭৪-৪৭৮।

১৯. Baxter, p.p. 78-79. এবং প্রাগুক্ত, ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহিম, পৃ-৪৮৬।

২০. Salik Siddiq, "Witness to Surrender",(Oxford University Press, 1978), ISBN 0-19-577264-4.

২১. Sen Amartya, "Poverty and Famines",(Oxford University Press, 1973), ISBN 0-19-828463-2. OCLC 10362534 177334002 191827132 31051320 40394309 53621338 63294006 . And Rummel Rudolph J., "Statistics of Democide : Genocide and Mass Murder Since 1900", ISBN 3-8258-4010-7, Chapter 8, table 8.1. Rummel comments that, In East Pakistan (now Bangladesh) [General Agha Mohammed Yahya Khan and his top generals] also planned to murder its Bengali intellectual, cultural, and political elite. They also planned to indiscriminately murder hundreds of thousands of its Hindus and drive the rest into India. And they planned to destroy its economic base to insure that it would be subordinate to West Pakistan for at least a generation to come. This despicable and cutthroat plan was outright genocide. (online)

২২. Ihtesham Kazi,"International Affairs Global Concerns of the 21st century", (New Delhi : Pip International Publications, 2008), P.P-102-111

২৩. Bangladesh Election Commission 18.0.18.1 Constitutional Amendments. Website (online)

২৪. Constitution of Bangladesh. Part V. Chapter-1, Article-66. And http://www.pmo.gov.bd/constitution/index.htm Constitution of Bangladesh. (Website)

২৫. https://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশ #cite_ref-32, সরকার ব্যবস্থা

২৬. বাংলাদেশ আইন মন্ত্রণালয়, (সূত্র : ওয়েবসাইট)।

২৭. বিচিত্রা, এপ্রিল ২৭, ১৯৮৪ ।

বিস্তারিত দ্রষ্টব্যের জন্য -Kobir Bhuian Md. Monoar,“Bangladesh politics and government”, (New Delhi : South Asian, 2006)

মালদ্বীপের ইতিহাস ও রাজনীতি

কেউ কেউ বলেন মালদ্বীপ বা দ্বীপের মালা শব্দটি সংস্কৃত শব্দ থেকে উদ্ভব। আবার কেউ কেউ বলেন যে মালে দিভেই রাজ্যে থেকে মালদ্বীপ শব্দটির উদ্ভব। মালে দিভেই রাজ্যে এই কথার অর্থ দ্বীপরাজ্য। অনেকে মালদ্বীপকে মহলদ্বীপও বলে ন। মহল মানে (আরবিতে) প্রাসাদ। দ্বাদশ শতক থেকেই মালদ্বীপে মুসলিম শাসন শুরু হয় ।[১] ইবনে বতুতা মালদ্বীপ গিয়েছিলেন ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে।[২] সংস্কৃতে মালদ্বীপকে লক্ষদ্বীপও বলা হয়েছে। সম্রাট অশোকের সময়েই অর্থাৎ সেই খ্রি ষ্টপূর্ব ৩য় শতকেই কতিপয় বৌদ্ধ ভিক্ষুক নাকি গি য়েছিল লক্ষদ্বীপে । এরপর দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ওই দ্বীপে গিয়ে বাস করতে থাকেন।[৩] দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী সম্ভবত ওখানে গিয়েছিল দক্ষিণ ভারত থেকে। এর পর শ্রীলঙ্কা থেকে সিংহলীরা মালদ্বীপ যায়, সিংহলীরা ছিল বৌদ্ধ। এরপর মুসলিমরা ঐ দ্বীপে মুসলিম সংস্কৃতি প্রোথিত করে দ্বাদশ শত কে।[৪] মালদ্বীপের ইতিহাসে ১৪০০ বছরের বৌদ্ধ শাসনামলের মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে।[৫] অশোকের শাসনামল থেকে মালদ্বীপে অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী ধারণা করা হয়। মালদ্বীপের বৌদ্ধ ধর্ম শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছে এবং তার পূর্বে সম্ভবত তারা হিন্দু ছিল।[৬] আরবরা আস্তে আস্তে ভারত মহাসাগর দিয়ে ব্যবসা করতে মালদ্বীপ আসে। ১১৫৩ সালের দিকে মালদ্বীপে আরবদের প্রভাবে ইসলাম ধর্মের সূচনা হয়। ১১৫৩ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল অবধি-এই ৮০০ বছর ৯২ জন সুলতান নিরবিচ্ছিন্নভাবে শাসন করে দ্বীপটি । ১৫০৭ সালে পর্তুগিজ পর্যটক দম লোরেনকো দে আলামেইদা মালদ্বীপে পৌঁছায়। সে সময় পশ্চিম ভারতের গোয়ায় ছিল পর্তুগিজদের বাণিজ্য কুঠি। ১৫৭৩ সালে পর্তুগিজরা বলপূর্বক কর আদায় করত । ১৫৫৮ সালের দিকে মালদ্বীপ পর্তুগিজরা ব্যবসার জন্য আসলেও আস্তে আস্তে মালদ্বীপ পর্তুগিজদের অধীনে চলে যায়। ১৯৫৯ সালে মালদ্বীপে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলন শুরু হয়, যার ফলে পর্তুগিজ আধিপত্যের অবসান হয়। তখন মালদ্বীপের সুলতান ছিলেন সুলতান থাকুরুফানি আল-আযম। তিনি পর্তুগিজদের মালদ্বীপ থেকে বহিস্কার করেন। সুলতান থাকুরুফানি আল-আযম মালদ্বীপের নবযুগের দ্রষ্টা। তিনিই নতুন লেখনির প্রচলন করেন, গড়ে তোলেন সামরিক বাহিনী। ১৬৫৪ সালে মালদ্বীপ আবার ডাচ্ ব্যবসায়ীদের অধীনে চলে যায়। ব্রিটিশরা ১৮৮৭ সালে ডাচদের বিতাড়িত করে ব্রিটিশ প্রটেকটোরেট এর অধীনে নিয়ে আসে। ব্রিটিশরা ১৮১৫ সালে শ্রীলঙ্কা পদানত করে, পদানত করে মালদ্বীপও। ব্রিটিশ মালদ্বীপকে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের দিকে ধাবিত করে। ১৯৩২ সালে সংবিধান প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হলে জনগণ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আন্দোলন শুরু করে। এভাবে ১৯৫৩ সালে

সালতানাত যুগের অবসান হয় ও মালদ্বীপ হয়ে ওঠে রিপাবলিক। মালদ্বীপের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন আমিন দিদি। তিনি আধুনিকতা ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। ফলে গোঁড়ারা আমিন দিদি এর উৎখাতের জন্য আন্দোলন শুরু করে । ফলে আমিন দিদি উৎখাত হয়ে যান। এরপর আইনসভা পূনরায় সালতানাত এর পক্ষে রায় দেয়। নতুন সুলতান হন মোহাম্মদ দিদি। তিনি ব্রিটিশদের সামরিক ঘাঁটি তৈরির অনুমতি দিলে ব্যাপক জনবিক্ষোভ সংগঠিত হয়। ১৯৬৫ সালের ২৬ জুলাই মালদ্বীপ ব্রিটিশদের কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৬৮ সালে মালদ্বীপের সুলতানাত পর্বের সমাপ্তি ঘটে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী মালদ্বীপের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ইব্রাহিম নাসের মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি হন এবং আহমেদ জাকিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন, তার সময়কাল ছিল (১৯৬৮-১৯৭৮)।[৭] গণপ্রজাতন্ত্রী হিসেবে মালদ্বীপের সংবিধান ১৯৬৮ সালে কার্যকারিতা লাভ করে। ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি হন মামুন আবদুল গাইয়ুম (Maumoon Abdul Gayoom), তার সময়কাল ছিল (১৯ ৭৮-২০০৩) সাল। ১৯৯৭ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি মামুন আবদুল গাইয়ুম (Maumoon Abdul Gayoom) এর সম্মতিক্রমে অন্য একটি সংবিধান প্রণীত হয়। এই সংবিধান ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে কার্যকারিতা লাভ করে। সকলেই মন্তব্য করেন যে, মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতিই হলেন রাষ্ট্রের প্রধান, সরকার প্রধান ও সেনাবাহিনীর প্রধান।[৮] ২০০৫ সালের জুলাই মাসে মালদ্বীপে প্রথমবারের মত রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। পার্লামেন্টের ৩৬ জন সদস্য Dhivehi Raiyyathunge Party (the Maldivian People's Party) এবং Maumoon Abdul Gayoom-কে সভাপতিত্বের জন্য নির্বাচিত করা হয়। পার্লামেন্টের বারোজন সদস্য Maldivian Democratic Party-এর বিপরীত দল গঠন করে এবং দুইজন সদস্য স্বাধীনভাবে অবস্থান করে।[৯] ২০০৬ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতি একটি বিস্তারিত রোডম্যাপ তৈরি করে সংসদ পরিচালনার জন্য। এছাড়াও একটি নতুন সংবিধান তৈরি করা হয় এবং আইনী কাঠামোকে আরও আধুনিক করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়। ২০০৮ সালে নাশিদ প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন।[১০] মালদ্বীপের সরকার ব্যবস্থা হল রাষ্ট্রপতি শাসিত। রাষ্ট্রপতি হল মালদ্বীপের সরকার প্রধান। রাষ্ট্রপতি নির্বাহী বিভাগকে পরিচালনা করে ও কেবিনেট নিযুক্ত করে। সাধারণত রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। গোপন ভোটের মাধ্যমে পার্লামেন্ট গঠিত হয়। মালদ্বীপের পার্লামেন্ট মজলিশ পঞ্চাশ সদস্য নিয়ে গঠিত যা পাঁচ বছর মেয়াদী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে। মালদ্বীপের সংবিধানে অমুসলিমদের ভোট দেয়া থেকে বিরত রাখা হয়। মালদ্বীপে একুশটি প্রশাসনিক

বিভাগ রয়েছে। মালদ্বীপের প্রত্যেকটি এটল (atoll) থেকে দুইজন সদস্য নির্বাচিত করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।[১১] মালদ্বীপের রাজধানী মালে ছাড়া মালদ্বীপকে সাতটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছে । এই সাতটি প্রদেশের অধীনে রয়েছে বিশটি প্রশাসনিক বিভাগ এবং মালেতে রয়েছে একটি প্রশাসনিক বিভাগ। যথা :

১. Mathi-Uthuru Province: consists of Haa Alif Atoll, Haa Dhaalu Atoll and Shaviyani Atoll.

২. Uthuru Province: consists of Noonu Atoll, Raa Atoll, Baa Atoll and Lhaviyani Atoll.

৩. Medhu-Uthuru Province: consists of Kaafu Atoll, Alifu Alifu Atoll, Alifu Dhaalu Atoll and Vaavu Atoll.

৪. Medhu Province: consists of Meemu Atoll, Faafu Atoll and Dhaalu Atoll.

৫. Medhu-Dhekunu Province: consists of Thaa Atoll and Laamu Atoll.

৬. Mathi-Dhekunu Province: consists of Gaafu Alifu Atoll and Gaafu Dhaalu Atoll.

৭. Dhekunu Province: consists of Gnaviyani Atoll and Addu City.[১২]

রাষ্ট্রপতির দ্বারা আটজন সদস্য নির্বাচিত হয়। আর এই প্রক্রিয়ায় নারীরা সংসদে প্রবেশ করতে পারে। ২০০৮ সালের ৭ই আগস্ট বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে পৃথক করা হয়। মালদ্বীপের সংবিধান অনুসারে "বিচারকরা হলেন স্বাধীন তবে শুধু সংবিধান ও আইনের অধীন"। এই কমিশন বিচারক নিয়োগ ও বাতিলের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। মালদ্বীপের সুপ্রীম কোর্ট প্রধান বিচারকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে যিনি বিচার বিভাগের প্রধান। মালদ্বীপ UNDP এর সহায়তায় পৃথিবীর প্রথম মুসলিম Criminal Code তৈরি করেছে। মালদ্বীপের সংবিধান অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্র ইসলামের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত (Article-02)।

এছাড়াও কোন অমুসলিম মালদ্বীপের নাগরিক হতে পারবে না (Article-09)।[১৩] মালদ্বীপ আপন সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখতে ব্যর্থ করে দিয়েছে ভারতীয় চক্রান্ত আর রুখে দিয়েছে ভারতীয় আধিপত্যবাদের করাল থাবা। দেশপ্রেম ও ইসলামী মূল্যবোধে বলীয়ান মালদ্বীপবাসীর প্রতিরোধের প্রক্রিয়া আলোচনা করা হল । মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নাশিদ ছিলেন কট্টর ভারতপন্থী। দেশের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়ে সে ভারতকে নিজ দেশে বিভিন্ন অন্যায্য বাণিজ্যিক সুবিধা দিতে থাকে। পাশাপাশি ইসলামের বদলে মালদ্বীপে সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠার মিশন নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। এর ফলে ফুঁসতে থাকে মালদ্বীপের সাধারণ জনগণ। এরপর পুলিশ, জনতা, আর্মি যৌথ সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন ভারতপন্থী নাশিদ। এরপর দায়িত্ব নেয় অন্তবর্তীকালীন সরকার। তারা গত ৭ই সেপ্টেম্বর সেখানে সাধারণ নির্বাচন দেয়। যে নাশিদকে জনতা অভ্যুত্থান করে ক্ষমতাচ্যুত করে আশ্চর্যজনকভাবে নির্বাচনে সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। চমকে ওঠে মালদ্বীপবাসী। কিন্তু সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ৫০% ভোট না পাওয়ায় সে সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়। মালদ্বীপের সংবিধান অনুযায়ী ২য় দফা ভোট অনুষ্ঠান অবধারিত হয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে মালদ্বীপের সাধারণ জনগণ প্রথম দফা নির্বাচনে ভারতপন্থী নাশিদের বিজয়কে চ্যালেঞ্জ করে, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভোট জালিয়াতি এবং দেশের বাইরের শক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার অভিযোগ আনেন। আদালতে নির্বাচন কমিশনের ভারত দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া এবং মারাত্মক কারচুপির অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এর ফলে মালদ্বীপের সুপ্রিম কোর্ট গত ৭ সেপ্টেম্বর প্রথম দফা নির্বাচনের ফলাফল অবৈধ ও বাতিল করে দেয় এবং আগামী ২০ অক্টোবর আবার নতুন করে ভোট আয়োজনের নির্দেশ দেন। কিন্তু ভারতের আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন আদালতের আদেশ অমান্য করে প্রথম দফা নির্বাচনের ফল ঠিক রেখে ২য় দফা ভোট আয়োজনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু অন্তবর্তীকালীন সরকার আদালতের সিদ্ধান্তকে সমুন্নত রাখতে হস্তক্ষেপ করে। তৎক্ষণাৎ মালদ্বীপের স্পেশাল অপারেশন ফোর্স ভারতের আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশনে হানা দেয়, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করে এবং অবৈধ ব্যালট পেপার বাজেয়াপ্ত করে। যার ফলে আদালত নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয় ভোটার রেজিস্ট্রি কোর্টে জমা দেওয়ার জন্য। আদালত এই ভোটার রেজিস্ট্রি বা তালিকার সাথে ব্যালট পেপার সামঞ্জস্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেন যা বিচারকদের হতবাক করে দেয়। বিচারকগণ দেখেন ৭ সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে ভারতপন্থী নাশিদের পক্ষে প্রায় কয়েক লক্ষ ভুয়া ভোট পড়ে। আদালতে প্রমাণিত হয় যেসব ব্যক্তি ভোটার হননি এবং যাদের ন্যাশনাল আইডি নেয় এরকম অগণিত ভোটারের ভোট নাশিদের পক্ষে পড়ে। আদালত পর্যবেক্ষণে বলেন, নির্বাচন কমিশন ভারতের

কারণে মালদ্বীপের সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকারকে পদদলিত করে এবং ভোটার লিস্টে অগনিত ভুয়া ভোটার অন্তর্ভুক্ত করে কারচুপির নির্বাচন আয়োজন করে। আদালতে প্রমাণিত হয়, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' মালদ্বীপের নির্বাচন তথ্য ও ডাটাবেইস হ্যাক করে চুরি করে। এজন্য আদালত সরকারকে নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটা বেইস নেটওয়ার্ক সার্ভারের সুরক্ষা কার্যকরভাবে বৃদ্ধির নির্দেশ দেন। পাশাপাশি আদালত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যালট পেপারসহ যাবতীয় নির্বাচনী সামগ্রীর সুরক্ষার নির্দেশ দেন। এরপরই মালদ্বীপের সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায়ে ভারতপন্থী নাশিদের বিজয় অবৈধ ঘোষণা করে তা বাতিল করে দেয়। আর এভাবেই একটা ছোট দ্বীপ দেশের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ব্যর্থ হয়ে যায় ভারতীয় সব চক্রান্ত। মুখ থুবড়ে পড়ে ভারতীয় আধিপত্যবাদের করাল থাবা। মালদ্বীপের জনগণ নিজ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রাখতে সফল হয়। সে দেশে প্রেসিডেন্ট যুগপৎ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান অর্থাৎ অনেক ক্ষমতাবান| নাশিদ পরিবর্তনের প্রবক্তা হিসেবে বিশেষ ইমেজের অধিকারী ছিলেন| জনগণের সঙ্গত প্রত্যাশা ছিল তিনি গণতন্ত্রকে বিকশিত এবং সুশাসন কায়েম করবেন| বাস্তবে ব্যর্থতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, দমনপীড়ন, সংবিধান লঙ্ঘন প্রভৃতি কারণে জনগণ শুধু হতাশ নয়, প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ| সরকারের আর্থিক অব্যবস্থাপনায় বাজেট ঘাটতির পরিণামে দ্রব্যমূল্য অনেক বেড়ে গেছে| নাশিদ আধুনিক ও প্রগতিশীল মালদ্বীপ গড়তে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে জনগণের বিশ্বাস ও মূল্যবোধে আঘাত হেনেছেন| মালদ্বীপের এবারের ঘটনা আকস্মিক নয়| অনেক দিনের ক্ষোভ ও অসন্তোষ জমা হয়েছিল| একটার পর একটা কারণ যোগ হয়ে মানুষের হতাশা ও উদ্বেগ বাড়িয়েছে| ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে রাজনৈতিক উত্তাপ-উত্তেজনা|[১৪]

The Maldives National Defence Force (MNDF) হচ্ছে মালদ্বীপের সম্মিলিত নিরাপত্তা নিশ্চিতকারক দল যারা মালদ্বীপের সকল প্রকার অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখবে। এছাড়াও তারা Exclusive Economic Zone (EEZ) এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। মালদ্বীপ দেশটি পানিবেষ্টিত দেশ হওয়ায় এর নিরাপত্তা সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলের নিরাপত্তার উপর নির্ভর করে। দেশটির ৯০% শতাংশ সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোষ্টগার্ড (Coast Guard) এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্র সংকেত জানানো ও সামুদ্রিক বিভিন্ন দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোষ্টগার্ড ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।[১৫]

তথ্যনির্দেশ

১. New Encyclopedia Britannica,Volume-7, Macropedia, 15th edition, 1968, Peter B. Norton President and Chief Executive Officer, Joseph j. Esposito, President, Publishing, p-731-732. Group. Chicago/ Auckland/ London/ Madrid/ Manila/ Paris/ Rome/ Seoul/ Sydney/ Tokyo. P-731-732. (online)

২. 'Ibn Batuta Travels in Asia and Africa', Translated by A. R. Gibb. Review (Website)

৩. Xavier Romero-Frias,"The Maldive Islanders : A Study of the People, Culture of an Ancient Ocean Kingdom", (Barcelona Press-NEI 1999), ISBN 84-7254-801-5.

৪. XRF, Folk Tales of the Mldives, Nordic Institute of Asian studies 2012. "Conversion of the Maldives to Islam", maldivesstory.com.mv (Website) archived from the original on 2003-05-09.

৫. Clarence Maloney, "People of the Maldive Islands", Orient Black Swan, 2013.(Website)

৬. H. C. P. Bell,"The Maldive Islands, An account of the Physical Features, History, Inhabitants, Productions and Trade",(Colombo Press -1883) ISBN 8-206-1222-1, Historical Research.

And H.C.P Bell, "The Maldives Islands, Monograph on the history, Archaeology and Epi graphy, Reprimt Colombo 1940",(council ton linguistic and Historical Research,Male-1989)

৭. Macmillan, "The Family Encyclopedia " (Published in Great Britain in 1983) p-87.

And Press : timenewsbd.com. ph.02-9355846,01783592799.

৮. Verinder Grover, "Asian countries politices & government", Chapter-'Maldives', (New Delhi : Deep and Deep 2000), ISBN-8171009425, P.P-13-21,54

৯. "Maldives begin historic election" BBC,8Oct-2008 (Website) Archived from the original on 4 Nov 2015, Retrived 2-april 2013 And Ahmed Shareef,'Fourth National Report to the Convention on Biological Diversity of Maldives',2010, Ministry of Housing and Environment ISBN 99915-96-15-1, P-7,Archived from the original on 4 nov 2015,Retrieved 2April 2013

১০. "Maldives begin historic election", BBC, October 8, 2008

এবং জাস্ট নিউজ, ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৩।

১১. "Maldives Atolls", Statoids.com. Retrieved 30 June 2010. (online)

১২. Divehiraajjege Jōgrafīge Vanavaru. Muhammadu Ibrahim Lutfee (Website).

১৩. Francis Krishan,(2012-02-14), "Maldives Museum Reopens Minus Smashed Hindu Images", Huffingtonpost.com. Retrieved 2013-04-02.(Webside) And Constitutions of Maldives (Article-02) (Article-09) (online)

১৪. মাহমুদুল হাসান মনি, রির্পোটার, ভোরের কাগজ, মে ২০১৩। (তথ্য সহযোগিতা)

১৫. Maldives National Defence Force Divission.Foreign.gov.mv/news (Website)

ভূটানের ইতিহাস ও রাজনীতি

ভূটানের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সেখানে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর চেয়ে বেশি সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না। সেখানে হয়ত খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দেও বসতি ছিল। [১] তবে ৭ম শতকে ভূটানে তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের প্রচলনের পরেই এলাকাটির সম্পর্কে আরও জানা যায়। [২] সেসময় বহু তিব্বতি বৌদ্ধ ভিক্ষুক পালিয়ে ভূটানে চলে আসেন। ১২শ শতকে এখানে দ্রুকপা কাগিউপা নামের বৌদ্ধ ধর্মের একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটিই বর্তমানে ভূটানের বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান রূপ। ভূটানের বৌদ্ধ মন্দির ও ধর্মশিক্ষালয় দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাসের ওপর সবসময় প্রভাব ফেলেছে।[৩] ১৬১৬ সালে নগাওয়ানা নামগিয়াল নামের এক তিব্বতি লামা তিনবার ভূটানের উপর তিব্বতের আক্রমণ প্রতিহত করলে ভূটান এলাকাটি একটি সংঘবদ্ধ দেশে পরিণত হতে শুরু করে। নামগিয়াল-বিরোধী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে পদানত করেন, একটি ব্যাপক ও সূক্ষ্ম বিবরণসমৃদ্ধ আইন ব্যবস্থা প্রচলন করেন এবং একটি ধর্মীয় ও সিভিল প্রশাসনের উপর নিজেকে একনায়ক বা শাবদ্রুং হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর অ র্ন্তকোন্দল ও গৃহযুদ্ধের কারণে পরব র্তী ২০০ বছর শাবদ্রুঙের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। ১৮২৭ সালে ভূটানের প্রাচীন রাজধানী পুনাখা আগুনে পুড়ে যাওয়ায় ভূটানের অনেক ইতিহাস বিলুপ্ত হয়ে গেছে।[৪] ১৮৮৫ সালে (Ugyen Wangchuk) উগিয়েন ওয়াংচুক শক্ত হাতে ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম হন এবং ভারতের ব্রিটিশ প্রশাসনের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। ১৯০৭ সালে উগিয়েন ওয়াংচুক (Ugyen Wangchuk) ভূটানের রাজা নি র্বাচিত হন এবং ঐ বছর ডিসেম্বরের ১৭ তারিখ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার উপাধি ছিল দ্রুক গিয়ালপো বা ড্রাগন রাজা। ১৯১০ সালে রাজা উগিয়েন ও ব্রিটিশ শক্তি পুনাখার চুক্তি স্বাক্ষর করে যেখানে ব্রিটিশ ভারত ভূটানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক না গলানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। উগিয়েন ওয়াংচুক (Ugyen Wangchuk) মারা গেলে তার পুত্র জিগমে ওয়াংচুক (Jigme Wangchuk) পরবর্তী শাসক হন। ১৯২৬-১৯৫২ সাল পর্যন্ত জিগমে ওয়াংচুক (Jigme Wangchuk) ভূটান শাসন করেন।

JigmeWangchuck

http://www.cgb.fr/bhoutan-1-sertum-40e-anniversaire-de-laccession-du-roi-jigme-wangchuck-1966,fwo_184919,a.html

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর ভূটান একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে গণ্য হয়। ১৯৪৯ সালে ভূটান ও ভারত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যেখানে ভূটান ভারতের কাছ থেকে বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে পথনির্দেশনা নেবার ব্যাপারে সম্মত হয় এবং পরিবর্তে ভারত ভূটানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।[৫] ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের একটি সদস্য রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তাঁর সময়েই ভূটানে একটি জাতীয় সংসদ, নতুন আইন ব্যবস্থা, রাজকীয় সেনাবাহিনী এবং একটি উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৬] ১৯৫২-১৯৭২ সাল পর্যন্ত জিগমে দর্জি ওয়াংচুক (Jigme Dorji Wangchuk) ভূটান শাসন করেন। তিনি ১৯৫৮ সালে ভূটান থেকে দাস প্রথা বিলপ্ত করেন।[৭] ১৯৭২ সালে জিগমে দর্জি ওয়াংচুক (Jigme Dorji Wangchuk) পুত্র জিগমে সিঙিয়ে ওয়াংচুক ১৬ বছর বয়সে ক্ষমতায় আসেন। তাঁর আমলে ভূটান পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে এগোতে থাকে। তিনি আধুনিক শিক্ষা, সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, পর্যটন এবং পল্লী উন্নয়নের মত ব্যাপারগুলির উপর জোর দেন। তিনি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি জনগণের সামগ্রিক সুখের একজন প্রবক্তা। উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর দর্শন কিছুটা ভিন্ন এবং এই ভিন্নতার কারণে তিনি আন্তর্জাতিক পরিচিত পেয়েছেন। তার আমলে ধীরে ধীরে ভূটান গণতন্ত্রায়নের পথে এগোতে থাকে।[৮] ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি রাজার পদ ছেড়ে দেন এবং তাঁর ছেলে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক ভূটানের রাজা হন।[৯] ২০০৭ সালে একটি রাজকীয় আদেশবলে রাজনৈতিক দল নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া হয়। বর্তমান সংবিধানে দেশটিতে একটি দু,দল বিশিষ্ট

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নি র্মাণের কথা বলা হয়েছে। জিগমে খেসার নামগিয়াল ওয়াংচুক বর্তমানে ভূটানের রাজা।[১০] ২০০৮ সালের ১৮ই জুলাই ভূটানের সংসদ একটি নতুন সংবিধান গ্রহণ করে।[১১] ভূটানে অতীতে একটি পরম রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এটি একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। ভূটানের রাজা, যার উপাধি দ্রাগন রাজা, হলেন রাষ্ট্রের প্রধান। মন্ত্রীদের একটি কাউন্সিল রাষ্ট্রের নির্বাহী কার্যপরিচালনা করে। সরকার ও জাতীয় সংসদ উভয়ের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত। এছাড়াও যে খেনপো উপাধিবিশিষ্ট দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা রাজার সবচেয়ে কাছের পরামর্শদাতার একজন।[১২] এই ঐতিহাসিক দিন (২০০৮ সালের ১৮ই জুলাই) থেকে ভূটানে পরম রাজতন্ত্রের সমাপ্তি ঘটে এবং ভূটান একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্রে পরিণত হয়।[১৩] ভূটানে দ্বিপাক্ষিক সংসদ বিদ্যমান।[১৪]

বাংলাদেশ, ভূটান এবং মালদ্বীপ এই তিনটি দেশের ইতিহাস এবং রাজনীতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই তিনটি দেশের অবস্থান একই উপমহাদেশে এবং তিনটি দেশেই বিট্রিশ উপনিবেশে ছিল যার কারণে এই দেশগুলোর ইতিহাস এবং রাজনীতি প্রায় একই বৃত্তের। বর্তমানে তিনটি দেশের গনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় তিনটি দেশই টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশগুলোর টেকশই উন্নয়নের স্বার্থেই নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের সম্পর্ক অনেক উন্নয়ন হয়েছে যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে । তবে এই অধ্যায়ে আলোচ্য তিনটি দেশের ইতিহাস এবং রাজনীতি আলোচনা করার প্রাসঙ্গিক কারণ ইতিহাস এবং রাজনীতি পর্যালোচনা ব্যতীত দেশগুলোর মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ক অনুধাবণ করা অত্যন্ত দুরূহ। দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের জন্যও দেশগুলোর একে অপরের ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশ

১. "Bhutan", World Institute for Asian Studies, 21 August 2006. Retrieved 23 April 2009

২. The Macmillan Familly, Encyclopedia, ISBN 0333352645, (Great Britain : 1983, By Macmillan London Ltd, 1983), P.P-235-236.

৩. Sailen Debnath, "Essays on Cultural History of North Bengal", ISBN 978-81-86860-42-7; & Sailen Debnath, "The Dooars in Historical Transition", ISBN 978-81-86860-44-1. (online)

৪. Robert L.Worden, "Rivalry among the Sects", Bhutan : A country study (Savada, Andrea Matles, ed.). Library of Congress Federal Research Division. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.

And Robert L. Worden, "Arrival of Buddhism", Bhutan : A country study (Savada, Andrea Matles, ed.).Administrative Integration and conflict with tibet,1651-1728. Library of Congress Federal Research Division. This article incorporates text from this source, which is in the public domain. (online)

৫. The Macmillan Familly, Encyclopedia, ISBN 0333352645, (Great Britain, By Macmillan, New York, London, 1983) p-235-236.

৬. Ihtesham Kazi, "International Affairs Global Concerns of the 21st century". (New Delhi : Pip International Publications 2008), p.p-102-111.

৭. BBC News online. 2010-05-05. Retrieved 2010-10-01.

৮. New Encyclopedia Britannica,Volume-14, Macropedia, Knoledge in depth 15th edition, 1768, Jaeob E.Safra Chairman of the board Jouge Anguilar-cauz, President, Chicago/London/New Delhi/Paris/Seoul/Sydney/Taipei/Tokyo.p.

And Crossette, Barbara (2007-04-30),“Wary of Democracy in Bhutan”.Christian Science Monitor online. Retrieved 2011-09-18. (online)

৯. New Encyclopedia Britannica,Volume-14, Macropedia, Knoledge in depth 15th edition, 1768, Jaeob E.Safra Chairman of the board Jouge Anguilar-cauz, President, Chicago/London/New Delhi/Paris/Seoul/Sydney/Taipei/Tokyo.-p.p-898-902 (online)

১০. Timesworld24.com/md/16april2013

১১. Dorji Khandu-Om, “A Brief History of Bhutan House in Kalimpong”, (2002), (PDF book). Retrieved 2011-08-12. (Online)

১২. Foreign Ministry of Bhutan. http//www.bhutan.govt.bt(Online)

১৩. টাইমস ওয়ার্ল্ড ২৪ ডটকম /মোঃ/ ১৬ এপ্রিল ২০১৩

and Choden Phuntsho,“Another Shot at Selection”,(2007-12-05). Kuensel (online), Retrieved 2011-09-18.

১৪. “Border to be Sealed Ahead of Bhutan Polls”, The Hindu News online (2007-12-27) Retrieved 2011-09-18, And “National Council Elections on December 26”, Hindustan Times online, Press Trust Of India, 2007-10-21, Retrieved 2011-09-18.

[N.B.-The **International Standard Book Number :** (**ISBN**) is a unique numeric commercial book identifier. An ISBN is assigned to each edition and variation (except reprintings) of a book. For example, an e-book, a paperback and a hardcover edition of the same book would each have a different ISBN. The ISBN is 13 digits long if assigned on or after 1 January 2007, and 10 digits long if assigned before 2007. The method of assigning an ISBN is nation-based and varies from country to country, often depending on how large the publishing industry is within a country.]

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের অর্থনীতি

১৩ শতাব্দীতে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল মূলত বৃষ্টি নির্ভর। এ অবস্থা চলে প্রায় ১৮ শতাব্দী পর্যন্ত পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশের অবকাঠামোর উন্নয়নে ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এখন ধান, চা, কাপড়, আম, পাট ইত্যাদি থেকে তৈরি পণ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি শুরু হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ প্রথমে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করলে ও পরবর্তীতে অর্থনীতিতে ভারতের প্রভাব পড়ে। ১৯ ও ২০ শতাব্দীতে প্রাচীন কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক কৃষি চাষের পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। এর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে । অতীতে পাট ছিল বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস।[১] ১৯৪০ সালের শেষের দিকে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্ব বাজারে পাটের রপ্তানি ছিল ৮০% ও ১৯৭০ সালের শেষের দিকে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৭০% ছিল পাটজাত দ্রব্য।[২] আস্তে আস্তে বিশ্বব্যাপী পাটের পরিবর্তে পলিপ্রোপাইলিন এর ব্যবহার বেড়ে যায় এবং পাটের চাহিদা কমে যায়। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ, ধান, চা এবং সরিষা উৎপাদিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের আবহাওয়া (আর্দ্র আবহাওয়া, উর্বর ভূমি, উপযুক্ত পানি) বেশি উপযোগী।[৩] কিন্তু স্বাধীনতার পরপর বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সংকটে পতিত হয়।

<u>সারণী-১</u>

সন	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	বৈষম্য	বৈষম্যের অনুপাত
১৯৪৯/৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
১৯৫৪/৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১
১৯৫৯/৬০	২৭৭	৩৬৭	৯০	৩২৫
১৯৬৪-৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭	৪৫.২
১৯৬৯/৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২	৬১.০

(তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশের অভ্যুদয়, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য- রহমান সোবহান, পৃষ্ঠা-৪৫)

তাই অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করার জন্য প্রয়োজন ছিল বর্হিবাণিজ্যের, কিন্তু সে সময় বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু আমদানীর চাহিদা বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে পূরণ করা সাময়িক হতে পারে দীর্ঘদিন চলতে পারে না। আমদানি চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন রপ্তানি বণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ।[৪] বাংলাদেশ সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরু করে ১৯৭৩ সালে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদেশী সাহায্য ছিল অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।[৫] এতে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৬২%।[৬] ১৯৭২ সালে এর ১৪ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে পশ্চিমা অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করলে, তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "I will accept anything from anybody to save my people provide it is given without any condition"।[৭] ১৯৭৪ সালে তিনি পুঁজিবাজারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ান।[৮] ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ওআইসি (Organization of the Islamic Conference) এর সদস্য হয়। ফলে সমগ্র আরব রাষ্ট্র থেকে এখন কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যায়।[৯] ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের লক্ষণীয় অগ্রযাত্রা সাধিত হয়। কৃষি ক্ষেত্রে ধান উৎপাদন হয় ১১১.১৮ লাখ টন।[১০] জুলাই ১৯৭৫-১৯৭৬ অর্থবছরে পাটজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য হ্রাস পায়।[১১] ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ লাভ করে। ব্যাংকিং, টেলিযোগাযোগ, বিমান পর্যটন বিদ্যা, গণযোগাযোগ মাধ্যম এবং পাট শিল্পের বিকাশ শুরু হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে, অদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে আস্তে আস্তে অর্থনৈতিক বিকাশ কমতে থাকে। ১৯৮০ সালের পর তা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, এ সময় বিভিন্ন অর্থনৈতিকনীতি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত ফার্মগুলোতে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং বিনিয়োগ করা হয়। বেসরকারি খাত গুলোকে বিভিন্ন সুযোগ প্রদান করা হয়। ১৯৮০-এর দশকের দিকে গার্মেন্টস শিল্পের সহজলভ্য শ্রমিক ও নিম্নপরিবর্তনশীলতার ব্যয় বৈদেশিক বিনিয়োগকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছে।[১২] বিশ্বব্যাংকের মতে, বাধা সত্ত্বেও ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৫% শতাংশ। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহম্মদ ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা

ছিল ২৩ লাখ, অন্যান্য সাহায্য সংস্থারও প্রায় ২৫ লাখ সদস্য রয়েছে।[১৩] ১৯৯১-৯৩ সালে আইএমএফ (International Monetary Fund) থেকে বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের চেষ্টা করে কিন্তু অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য সবটুকু সফল হয়নি। যার ফলে ২০০০-২০০১ সাল পর্যন্ত বর্হিবিশ্বের বিনিয়োগ কমে যায়।[১৪] ২০০২ সালে গার্মেন্টস শিল্প ৫ মিলিয়ন মূল্যের পণ্য রপ্তানি করে। এই শিল্পে বর্তমানে ৩ মিলিয়ন শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে, যার ৯০% মহিলা শ্রমিক।[১৫] ২০০৩ সালে আইএমএফ (IMF) ৩ বছরের বাংলাদেশের উর্বর ভূমি ধান, পাট, বিভিন্ন ফল, গম ও শস্য অন্যান্য শস্য উৎপাদিত হয়। যা বর্তমান বছরগুলোতে আরো বেড়েছে। ষড়ঋতুর প্রাকৃতিক বৈচিত্রতার ফলে ধান ও ফলমূলের বৈচিত্রতা ও লক্ষনীয়।[১৬] বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক বহুজাতিক সংস্থা এবং স্থানীয় বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন-বেক্সিমকো (Beximco), স্কয়ার (Square), আকিজ গ্রুপ (Akij Group), ইস্পাহানি (Ispahani), নাভানা গ্রুপ (Navana Group), হাবিব গ্রুপ (Habib Group), কেডিএস গ্রুপ (KDS Group) এবং বহুজাতিক সংস্থা যেমন : ইউনিকল কর্পোরেশন (UNOCAL Corporation), সেভরন (Chevron) বাংলাদেশের ব্যাপক বিনিয়োগ করে থাকে, আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতটি। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর বাংলাদেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক জিডিপি (Gross Domestic Product) এর প্রবৃদ্ধি ধার্য করেছে ৬.৫%।[১৭] দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে উন্নয়নের ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশে একটি উন্নয়নশীল দেশ। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল $১৪০০, যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করলে গড়ে হবে $ ১২,২০০।[১৮] যদিও বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ কৃষক রয়েছে তারপরেও দেশের তিন-চতুর্থাংশ রপ্তানি আয় মূলত তৈরি পোশাক শিল্প থেকে আসে। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার বেশির ভাগ আসে রপ্তানিকৃত পোশাকশিল্প থেকে। পূর্বে বাংলাদেশের মসলিন ও সিল্ক বিখ্যাত ছিল।[১৯] বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক বিদেশে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছে ফলে শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। সুতরাং বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার আরেকটি বড় অংশ আসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো অর্থ থেকে।[২০] বিশ্বব্যাংকের মতে, "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বাধা হল দুর্বল শাসন ব্যবস্থা এবং দুর্বল সরকারি প্রতিষ্ঠান"। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন করেছে। দেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যর

সিংহভাগ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর, মংলা সমুদ্র বন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।[২১] বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কৃষিজ কাঁচামাল যেমন-পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, মাছ, তামাক, পোশাক ইত্যাদি। এছাড়াও বাংলাদেশের আমদানি দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে শিল্পজাত দ্রব্য যেমন-কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, লৌহ ইত্যাদি।[২২] বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি নিম্ন আয়ের, উন্নয়নশীল এবং স্থিতিশীল অর্থনীতি। এই অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে মধ্যম হারের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, পরিব্যাপ্ত দারিদ্র, আয় বণ্টনে অসমতা, শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য বেকারত্ব, জ্বালানী, খাদ্যশস্য এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য আমদানী নির্ভরতা, জাতীয় সঞ্চয়ের নিম্নহার, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ক্রমবৃদ্ধিমান নির্ভরতা এবং কৃষিখাতের সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশ অর্থনীতিতে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প বিশ্বের বৃহত্তম শিল্পের মধ্যে অন্যতম। ১৯৮০ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত পাট ও পাটজাত পণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এসময় পাট রপ্তানী করে দেশটি অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করত। কিন্তু পলিপ্রোপিলিন পণ্যের আগমনের ফলে ১৯৭০ সাল থেকেই পাটজাত দ্রব্যের জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্য কমতে থাকে। বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭০-এর দশকে সর্বোচ্চ ৫৭% প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। তবে এ প্রবৃদ্ধি বেশি দিন টেকেনি। ১৯৮০-এর দশকে এ হার ছিলো ২৯% এবং ১৯৯০-এর দশকে ছিলো ২৪%।[২৩] বাংলাদেশ বর্ধিত জনসংখ্যার অভিশাপ সত্ত্বেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ধান উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে তৃতীয়। বাংলাদেশের চাষাবাদের জমি সাধারণত ধান ও পাটচাষের জন্য ব্যবহৃত হলেও সাম্প্রতিক সময়ে গমের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের দিক দিয়ে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ।[২৪] বাংলাদেশের কৃষি মূলত অনিশ্চিত মৌসুমী বায়ু এবং নিয়মিত বন্যা ও খরার উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। দেশের যোগাযোগ, পরিবহন ও বিদ্যুৎখাত সঠিকভাবে গড়ে না ওঠায় দেশটির উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশাল খনি রয়েছে এবং কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতির ছোটখাট খনি রয়েছে। বাংলাদেশের শিল্প-কাঠামো দুর্বল হলেও এখানে অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা অঢেল এবং মজুরিও সস্তা। বাংলাদেশের প্রধান দাতাগোষ্ঠির মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সৌদি আরব ও পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার এখনও অনেক বেশি। মোট জনসংখ্যার প্রায়

অর্ধেক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে এবং ভারত ও চীনের পর বাংলাদেশেই সর্বোচ্চ সংখ্যক দরিদ্র মানুষ বসবাস করে। একই আয়ের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সামাজিক সেবার মান অনেক কম।[২৫] বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবেই বিরাট বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে এবং এর অর্থনীতি বর্তমানে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকের পাঠানো রেমিটেন্সের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সবচেয়ে কম পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে রিজার্ভ স্থিতিশীল রয়েছে। ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরের শুরুর দিকে রিজার্ভ প্রায় ৩.১ বিলিয়ন ডলার ছিল। ২০০৬ সালে সেপ্টেম্বরে রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৬ বিলিয়ন ডলারে।[২৬] অধিকাংশ বাংলাদেশি কৃষিকাজের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। আগে থেকেই ধান ও পাট বাংলাদেশের প্রধান ফসল হিসেবে সুপরিচিত থাকলেও ইদানিং গম চাষের উপর গুরুত্ব বেড়েছে। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে চা উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের উর্বর ভূমি এবং সহজলভ্য পানির উৎসের কারণে এদেশের অনেক স্থানে বছরে তিনবার ধানের ফলন হয়। অনেক নিয়ামকের কারণে বাংলাদেশের কায়িক-শ্রমনির্ভর কৃষি ধীরগতিতে উন্নতি লাভ করছে। বিরূপ আবহাওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। সাম্প্রতিককালে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থাপনা, সারের পরিমিত ব্যবহার এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে সঠিক মূলধন ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। ফলে আরও উন্নতি আশা করা হচ্ছে। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের প্রধান শস্য ধান উৎপাদিত হয়েছে ২০০০০০০.২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ২০০৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে ধান চাষের জন্য বিভিন্ন কীটনাশক যেমন: দানাদার কার্বোফুরান, সিন্থেটিক পাইরিথ্রয়েড এবং ম্যালাথিয়ন বিক্রয় হয়েছে ১৩,০০০ টনেরও বেশি। এই কীটনাশক ব্যবহার বৃদ্ধি কেবল পরিবেশ দূষণই ঘটাচ্ছে না, বরং দরিদ্র ধানচাষীদের চাষাবাদের খরচও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে কীটনাশক ব্যবহার কমাতে কাজ করে যাচ্ছে। ধানের বিপরীতে ১৯৯৯ সালে গম উৎপাদিত হয়েছে ১.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে চাষযোগ্য ভূমির ওপর ক্রমই চাপ বাড়ছে। এ কারণে জমির উর্বরাশক্তি প্রতিনিয়ত কমে যাচ্ছে। এ কারণে খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে। এই সংকট মোকাবেলার বৈদেশিক সাহায্য ও বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়। বেকারত্ব এখনও একটি ভয়ঙ্কর সমস্যা এবং কৃষিকাজ এই সকল বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মের যোগান দিতে পারে কি না, তা চিন্তার বিষয়। বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ভবিষ্যত সরকারগুলোর একটি প্রধান দায়িত্ব। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের মানুষের উপার্জনের আরেকটি অন্যতম উৎস হল পশুসম্পদ। এই খাতটি অতি দ্রুত উন্নতি করছে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের

অর্থনীতিতে অনেক পথ পাড়ি দিয়েছে। ১৯৯০ দশকে প্রভূত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধিত হলেও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের এখনও বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের অদক্ষতা সত্ত্বেও এখানে দ্রুত শ্রমিক শ্রেণি বৃদ্ধি পেয়েছে যাদেরকে কেবল কৃষি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। এ কারণে সরকার বিভিন্ন বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানিকে অনুমোদন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রশাসনের বিরোধিতা সত্ত্বেও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অনুমোদন উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার পর দেশটির অর্থনীতি আবার বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে শুরু করে। অবশ্য এখন পর্যন্ত পূর্ব এশীয় অর্থনৈতিক মন্দাবস্থার কোন প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়েনি।[২৭] ২০০৫ অর্থবছরে রপ্তানি ছিল প্রায় ১০.৫ বিলিয়ন ডলার যা অনুমিত পরিমাণের চেয়ে ০.৪ বিলিয়ন ডলার বেশি। ২০০৬ সালের জন্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ১১.৫ বিলিয়ন ডলার। ২০০৬ অর্থবছরের জন্য জিডিপি লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬.৭%। ২০০৫-৬ অর্থবছরে বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস পেলে ও বিগত ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৪.৬৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৮] ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ মুদ্রণ ও প্রকাশনা, ০.০৭% চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য ০.১০%, বস্ত্র ২৩.০৫%, খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্য ০.১৩%, কৃষিজাত ৮.৮৯, সেবা ২০.৬৯%, প্রকৌশল ক্ষেত্রে ৩১.৯৭% বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৯]

তথ্যনির্দেশ

১. "Background Note : Bangladesh", Bureau of South and Central Asian Affairs (March-2008), Accessed June 11, 2008, This article incorporates text from this source, which is in the public domain. (online)

২. "Jute Bangladesh", Asiatic Society of Bangladesh, Retrieved on 2006-07-14, And Wood Geoffrey D,"Bangladesh : Whose ideas, whose interests?" (Intermediate Technology Publications,1994), p. 111. ISBN 1-85339-246-4. (online)

৩. Roland, B (2005) "Bangladesh Garments, Aim to Complete", BBC. (online)

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৮-১৯৭৯ এর অর্থবছরের রিপোর্ট, প্রকাশকাল : নভেম্বর, ১৯৭৯।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৩-১৯৭৩ এর অর্থবছরের রিপোর্ট, প্রকাশকাল : জুলাই, ১৯৭৪।

৬. মুনীর উদ্দিন আহমেদ, "বাংলাদেশ : বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর",(ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮০), পৃ-১৪৫।

৭. keeping's contemporary Archives. Bristol,1971-1972, Page-2511.

৮. Virendra Narain and S. R. Chakravarti, 'Bangladeshi : Global Politics',(Delhi : South Asian Publishers, 1988),Vol-3 P.P-11-12.

৯. Denis Wright, "Bangladesh Origins and Indian Ocean Relation 1971-1974", (Dhaka : Academic Publishers, 1988), P.P- 225-234.

১০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৩-১৯৭৪ এর অর্থ বছরের রিপোর্ট, প্রকাশকাল:১৯৭৪।

১১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৫-১৯৭৬ অর্থ বছরের রিপোর্ট, প্রকাশকাল : জুলাই ১৯৭৭।

১২. Begum N., 2001(Enforcement of Safety Regulations in Garment Sector in Bangladesh.) Proc. Growth of Garments Industry in Bangladesh Economic and Social Dimension, p.p- 2008-226 (online) .

১৩. Schreiner Mark,“A cost-Effectiveness Analysis of the Grameen Bank of Bangladesh”,(Analysis-2003), Development Policy Review 21(3) : 357-382. doi10.IIII/467-7670.00215. (Online)

১৪. Bureau of South and Central Asian Affairs, (March-2008), Accessed June 11, 2008.

১৫. Begum N., (Enforcement of Safety Regulations in Garment Sector in Bangladesh.) Proc. Growth of Garments Industry in Bangladesh Economic and Social Dimension-2001, p.p-2008-226 (online)

১৬. Bureau of South and Central Asian Affairs, (March-2008), Accessed June 11, 2008.

১৭. “Annual Report 2004–2005, Bangladesh Bank”, Bangladesh-bank.org. Archived from the original on 11 August 2007, Retrieved 3 July 2010.

And Schreiner Mark , “A cost-Effectiveness Analysis of the Grameen Bank of Bangladesh”,(Analysis-2003), Development Policy Review 21(3) : 357-382. doi10.IIII/467-7670.00215

১৮. Ibid, Begum N., (2001) Enforcement

১৯. Roland B., (2005) “Bangladesh Garments, Aim to Complete”, BBC

২০. Begum N., 2001 (Enforcement of Safety Regulations in Garment Sector in Bangladesh. Proc. Growth of Garments Industry in Bangladesh Economic and Social Dimension. p.p-2008-226. (online)

২১. Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS).[dead link] Bangladesh Sangbad Sangstha (National News Agency of Bangladesh).

২২. Bangladesh EPZ. (Website)

২৩. বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৫-৭৬ এর অর্থবছরের রিপোর্ট, প্রকাশ কাল : জুলাই-১৯৭৭।

২৪. Bureau of South and Central Asian Affairs, (March 2008), Accessed June 11, 2008.

২৫. Social Sceience,(Class Six Capter South Asia),Bangladesh Govt. Publication.

২৬. “Politics and managing the national economy : How to achieve sustainable economic growth”. The Financial Express, Retrieved August 22, 2013.

২৭. তথ্য সংগ্রহ : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর, ঢাকা, কৃষি মন্ত্রণালয় ও শ্রম মন্ত্রণালয়। (তথ্য ওয়েবসাইট)

২৮. বাংলাদেশ অর্থসমীক্ষা রিপোর্ট, ২০০৫-২০০৬, পৃ. ১৮৭।

২৯. বিনিয়োগ বোর্ড রিপোর্ট, এপ্রিল ২০০৮।

মালদ্বীপের অর্থনীতি

মালদ্বীপের প্রতিবেশী দেশ ভারত ও শ্রীলঙ্কা।[১] এ দু'টি দেশের সাথে মালদ্বীপের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক লেনদেন বিদ্যমান। প্রাচীনকালে এশিয়া এবং আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলে বিনিময় মুদ্রা হিসেবে মালদ্বীপের কড়ি ব্যবহৃত হতো।[২] ১৬ শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরের মাধ্যমে মালদ্বীপে ব্যবসা সহজ হওয়ায় মালদ্বীপে পর্তুগিজ, ডাচ ও ফ্রান্সের ব্যবসায়ীরা আসে। ১৯ শতকে মালদ্বীপ ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯৬৫ সালে মালদ্বীপ ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৮৯ সালে মালদ্বীপের সরকার অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি শুরু করে। প্রথমত এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমদানি কোটা তুলে দেয়া হলেও (Private Sector) বেসরকারী খাতে কিছু রপ্তানি করা হতো। পরবর্তীকালে মালদ্বীপ সরকার আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা গুলোকে শিথিল করে এবং বৈদেশিক মূলধনকে উৎসাহিত করেছে। ১৯৯০ সালের দিকে মালদ্বীপে অর্থনৈতিক উন্নয়ন (মৎস্য, কৃষি, পর্যটন) এবং আধুনিকায়নের প্রয়োজন জরুরি হয়ে পড়ে। প্রাচীনকালে মালদ্বীপ বিখ্যাত ছিল (Cawry Shells) কড়িখোসা, (Coirrope) নারিকেল ছোবড়া, শুকনা টুনা মাছ (Ambergris), (তিমি মাছের অন্ত্রজাত সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ), (Coco demer) ইত্যাদির জন্য। মালদ্বীপ ব্যবসার ক্ষেত্রে মূলত শ্রীলঙ্কার উপর নির্ভরশীল।[৩] স্থানীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যতরী প্রথমে রপ্তানী পণ্যসামগ্রী শ্রীলঙ্কায় পরিবহন করে এবং পরবর্তীতে ভারত মহাসাগরের মাধ্যমে অন্যান্য পোতাশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।[৪] প্রাচীনকালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হত মালদ্বীপের কড়িকে। কড়ি বর্তমানে মালদ্বীপের অর্থসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। বেশির ভাগই খাদ্য জাতীয় পণ্য মালদ্বীপ আমদানী করে।[৫]

চিত্র : মালদ্বীপের কড়ি

বর্তমানে মালদ্বীপের সর্ববৃহৎ শিল্প হল পর্যটন শিল্প।[৬] মালদ্বীপের জিডিপিতে পর্যটন শিল্পের অবদান ২৮%। মালদ্বীপ সরকারের ৯০% রাজস্ব আসে পর্যটন সংক্রান্ত কর থেকে। মৎস্য হচ্ছে মালদ্বীপের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণখাত। মালদ্বীপের চাষযোগ্য জমি ও শ্রমিকের অভাব রয়েছে। অধিকাংশ প্রধান খাদ্য মালদ্বীপ আমদানী করে থাকে। শিল্প বলতে গার্মেন্টস তৈরি, নৌকা নির্মাণ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জিডিপিতে যার ভূমিকা মাত্র ৭%। মালদ্বীপের ভূমি কৃষি কাজের জন্য তেমন উপযোগী নয়। মালদ্বীপে নারকেল, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, আম, পান, মরিচ, মিষ্টি আলু এবং পেঁয়াজ চাষ করা হয়। কৃষি পণ্য মালদ্বীপের জিডিপিতে ৬% আবদান রাখে।[৭] ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে মালদ্বীপে সুনামি আঘাত হানে এবং এতে ১০৮ জন মৃত্যুবরণ করে।[৮] ১২,০০০ স্থানচ্যুত হয় ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয় প্রায় $৪০০ মিলিয়ন (million)।[৯] সুনামি সংঘটিত হওয়ার ফলে মালদ্বীপের জিডিপি কমে গিয়ে ৬২% হয়।[১০] সুনামি উত্তর পরিস্থিতিতে পর্যটন শিল্প জিডিপি উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে এবং ২০০৬ সালে তা ১৮% বৃদ্ধি পায়। ২০০৭ সালে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে মালদ্বীপ সর্বোচ্চ মাথাপিছু জিডিপি $৪,৬০০ মিলিয়ন (million) অর্জন করে। পর্যটনখাতে মালদ্বীপের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭২ সালে মালদ্বীপে সর্বপ্রথম ট্যুরিস্ট রিসোর্ট (Tourist Resort) তৈরি করা হয় বান্দুস দ্বীপে। যা পরবর্তীতে পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। বর্তমানে পর্যটন হল মালদ্বীপের সর্বোচ্চ আয়ের উৎস। ১৯৭২ সালে মালদ্বীপে মাত্র দুইটি পর্যটন কেন্দ্র ছিল। ২০০৭ সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯২টি ।[১১] ১৯৭৯ সালে মালদ্বীপে পর্যটন শিল্পের জন্য একটি আইন পাশ হয়। ১৯৮২ সালে পর্যটন বিভাগ তৈরি হয় এবং ১৯৮৮ সালে (tourism sector) পর্যটন ক্ষেত্রে উপদেষ্টা কাউন্সিলর নিযুক্ত করা হয়।[১২]

চিত্র : মালদ্বীপের পর্যটন কেন্দ্র

মালদ্বীপে ২০০৮ সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৯টি । পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, কুটিরশিল্পের উন্নয়নেও ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। মালদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী কুটিরশিল্প অর্ন্তভুক্ত করে মাদুর তৈরি, নারিকেলের ছোবড়া থেকে দড়ি তৈরি (handi craft) ইত্যাদিকে।[১৩] তবে সাম্প্রতিককালে প্রিন্টিং, পিভিসি পাইপ তৈরি, সামুদ্রিক জাহাজ মেরামত, ইট তৈরি ইত্যাদির প্রসার শিল্পক্ষেত্রে অবদান রাখছে।[১৪]

Gross Domestic Production at 1985

Constant Prices (in million Rufiyya)

Gross Domestic product	933.853
Agriculture	85.130
Fisheries	142.208
Coral and Sand mining	15.891
Construction	78.272
Manufacturing (including Electricity)	53.454
Distribution	161.851
Transport	49.838
Tourism	170.391
Real Estate	40.605
Services	56.829
Govt. Administration	79.420

Source: An Economic Brief, Information 2, Dept. of Information and Broadcasting Male, Rebublic of Maldives, May, 1991, pp. 7-8.

মাছ এবং নারকেল এ দুটি পণ্য মালদ্বীপ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে, অর্থনীতিতে সমতা রক্ষার চেষ্টা করে। মৎস্য রপ্তানি থেকে মূলত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ১৯৭০ সালে মালদ্বীপ আধুনিক নৌকার প্রচলন হয়। যা দিয়ে মাছ শিকার আগের চেয়ে সহজ হয়। আধুনিকায়নের যুগে মালদ্বীপের এসব জেলেদের জীবনযাত্রার মান তেমন উন্নত হয়নি।[১৫] মৎস্যখাতের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালে ঐতিহ্যবাহী মাছ ধরার নৌকা ধনি (Dhoni) তৈরি করা হয় যা মৎস্যখাতের উন্নয়নে মাইলফলকের সৃষ্টি করে ও দেশটির অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কায় শুকনো মাছ রপ্তানি করে যা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মালদ্বীপ ৯৯%

মৎস্য শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি করে।[১৬] মৎস্যখাতের উন্নয়নের জন্য মালদ্বীপ সরকার Exclusive Ecomomic Zone (EEZ) তৈরি করে। বর্তমানে মালদ্বীপের জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ১৫% এর বেশি এবং এই খাতে প্রায় ৩০% লোক নিয়োজিত রয়েছে। পর্যটন শিল্পের পরে মৎস্যখাত মালদ্বীপের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক উৎস।[১৭]

চিত্র : মালদ্বীপের মৎস্যখাত

মালদ্বীপের ব্যবসার ক্ষেত্রে মূলত শ্রীলঙ্কার উপর নির্ভরশীল। মালদ্বীপ আমদানী করে মূলত : খাদ্য এবং প্রাণী (basic manufactures),পানি, তেল, মেশিনারি (transport equipment), তামাক, রাসায়নিক দ্রব্য, কাঁচামাল ইত্যাদি। মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কা ব্যতীত জাপান, ইউকে, থাইল্যান্ড, থেকে আমদানী করে। রপ্তানি করে শুকনো মাছ, লবণাক্ত মাছ ইত্যাদি।[১৮] অদক্ষ জনবল, শিল্পের দ্রুত পরিবর্তন, কৃষিক্ষেত্রে আধুনীকায়নের অভাব মালদ্বীপের অর্থনীতিকে অসম অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করেছে।[১৯]

তথ্যনির্দেশ

১. www.gomapper.com › Asia › Maldives, And https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080806051749AA5Wvr5

২. Hogendorn Jan and Johnson Marion,"The Shell Money of the Slave Trade, African Studies Series 49", (Cambridge University Press, Cambridge : 1986).

৩. James Lyon, "Maldives", (Lonely Planet Publications Pty Ltd.,2003-10), p. 9. ISBN 9781740591768. Retrieved 2011-02-01.

And "Maldives travel guide" (online)

৪. Lyon James, "Maldives", (Lonely Planet Publications Pty Ltd- October 2003). p. 9. ISBN 978-1-74059-176-8.

৫. Urmila Phadnis and Ela Dutt luithui, "Maldives enter world politics", Asian Affair, January, February, 1981, PP. 167-72.

৬. New Encyclopedia Britannica, Volume-7, Macropedia, 15th edition, 1968, Peter B. Norton President and Chief Executive Officer, Joseph. j.Esposito, President, Publishing Group. Chicago / Auckland / London / Madrid / Manila / Paris / Rome / Seoul / Sydney / Tokyo. (online)

৭. "Maldives travel guide" (Website)

And http://en. kunming.cn/subject/content/2013-05/21/content_3299803.htm (online)

৮. CNN, "Sinking island nation seeks new home", dated - 11 November 2008, Retrieved 2008-11-12.BAT.

৯. UNDP : "Discussion Paper-Achieving Debt Sustainability and the MDGS in Small Island Developing States : The Case of the Maldives" (Website)

১০. Maldives tsunami damage 62 percent of GDP : "WB" (online)

১১. Report : “Fathuruverikamuge Tharaggeege Dhuveli,35 Aharu” translated to English “Pace of Tourism 35 Years Ministry of Tourism and Civil Aviation”, vol-23.
htt://tourism.gov.mv/pubs/35 years of tourism final. pdf. Retrieved 3 April 2009. (online)

১২. Report : Maldives Independence Day, The Island-Colombo, July 26, 1991,P-10.

১৩. Maldives Ministry of Tourism, Retrieved 3April 2009 (Online)

১৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Maldives#cite_note-6

১৫. Urmila Phadnis and Ela Dutt luithui, “Maldives enter world politics”, Asian Affair, January, February, 1981, P.P-167-72.

১৬. The Macmillan Family, Encyclopedia First Published in U.S.A. under the little Academic American Encyclopedia. This edition Published in Great Britain in 1983 by Macmillan London Ltd. P-87

১৭. https://en.wikipedia.org/wiki/Maldives#Fishing_industry

১৮. James Lyon, “Maldives”, (Lonely Planet Publications Pty Ltd.,October 2003). p. 9. ISBN 978-1-74059-176-8.

১৯. Urmila phadnis, “Maldives : World Focus”, Asian affairs, November-December 1983, P-102.

ভূটানের অর্থনীতি

ভূটানের অর্থনীতি বিশেষ করে উপআঞ্চলিক পর্যায়ে আবর্তিত। ভূটানের বৈদেশিক বাণিজ্য মূলত ভারত নির্ভর। ভূটানে ভারত নির্ভর অর্থনীতি চালিত হলেও বাংলাদেশ, নেপাল এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের সাথে ভূটানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৫০ সালে থেকেই ভূটানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকক্ষেত্র ভারত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আসছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ১৯৫৮ সালে ভূটান সফল করেন এবং ভূটানের সাথে বিশেষ বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করেন। ১৯৭১ সালে ভূটান জাতিসংঘের সদস্য হয় এরপর থেকে ভূটান দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করার প্রয়াস চালিয়ে যায়। যার মাধ্যমে ভূটানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। ভূটানের সাথে ২২টি দেশের দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান।[১] ভূটান তার অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য মোট ব্যয়ের ১০ % নিজেস্ব খাতের উপর এবং বাকি ৯০ % ভারত, বিশ্ব ব্যাংক, জাতিসংঘ, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের উপর নির্ভরশীল। ১৯৭০ সাল থেকে ভূটানে ৩টি খাতে আধুনিক উৎপাদন শুরু হয়। যথা- খাদ্য প্রস্তুতকরণ, সিমেন্ট তৈরি এবং কাঠজাত দ্রব্য উৎপাদন। ভূটানের ৭০% বনভূমি হওয়ায় কাঠ শিল্পের উন্নয়ন সহজ হয়েছে। দেশটি ভারতবেষ্টিত হওয়ায় মোট আমদানির ৯০ % এবং রপ্তানীর ৯৫ % ভারতের সাথে সংঘটিত হয়। [২] ভূটানের মুদ্রার নাম গুলট্রাম (Ngultrum) I দু,দেশের বাণিজ্যের সুবিধার্থে ভারতীয় রূপির মূল্য গুলট্রামে প্রতিফলিত হয়। ভারতীয় রূপি ভূটানের বৈধ দরপত্রে ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।[৩]

Bhutan's currency in the ngultrum

১৯৯০ সালের পর ভূটানের অর্থনীতি ঊর্ধ্বগামী হয়। এ সময় ভূটানের জাতীয় আয় ২২% থেকে ৩০% এ বৃদ্ধি পায় ।[৪] ১৯৯৯ সালের পর থেকে ভূটান সার্ক (SAARC) এর মাধ্যমে ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালের সাথে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।[৫] ১৯৯৬-১৯৯৮ সালে এসে ভূটান পূর্বের

বছরগুলোর তুলনায় রপ্তানিতে এগিয়ে যায়। ভূটানের অর্থনীতি সাধারণভাবে পৃথিবীর অন্যতম একটি ক্ষুদ্র অর্থনীতি।[৬] কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে, ২০০৫ সালে ৮ শতাংশ এবং ২০০৬ সালে ১৪ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। ভূটান হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় দ্রুত বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির একটি দেশ। ২০০৭ সালে এর বার্ষিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ২২.৪% বৃদ্ধি পায়।[৭]
ভূটানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পেছনে যে সব প্রকল্প কাজ করেছে যেগুলো বর্ণনা করা হলো-

ভূটানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পেছনে অন্যতম একটি কারণ হল সুবৃহৎ তালা পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন। ২০০৬ সালে মার্চ মাস পর্যন্ত ভূটানের মাথাপিছু আয় ছিল US$ 1.321। ভারতের নিকট জলবিদ্যুৎ বিক্রয় করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, যা সে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমৃদ্ধ করেছে।

ভূটানের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি, বনায়ন, পর্যটন এর উপর নির্ভরশীল। ভূটানের মোট জনসংখ্য প্রায় ৫৫.৪ শতাংশ কৃষিকাজের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। ভূটানের অধিবাসীরা জীবিকা নির্বাহভিত্তিক কৃষিকাজ ও পশুপালন করে। কৃষিপণ্যের মধ্যে রয়েছে ধান, গম, যব, ভূট্টা, আলু।[৮]

ভূটানের হস্তশিল্প বিশেষত বুনন খুবই কারুকার্যময়। তারা গৃহবেদীর বিভিন্ন কারুকার্য তৈরি করে যা বিশ্বদরবারে বিশেষ কদর রয়েছে। এছাড়া ভূটানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।[৯]

ভূটান ও ভারত ২০০৮ সালে একটি 'অবাধ বাণিজ্য' চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যার ফলে ভূটানিজরা কোন প্রকার শুল্ক প্রদান ছাড়াই ভারতের মধ্য দিয়ে তৃতীয় কোন দেশের সাথে পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি করতে পারবে। বাংলাদেশে ও ভূটানের নির্দিষ্ট কিছু শিল্পপণ্য শুল্ক ছাড়া প্রবেশ করতে পারে।[১০] ভূটানের শিল্পখাত দ্রুত বর্ধনশীল পর্যায়ে রয়েছে। যদিও এর অধিকাংশ কুটির শিল্পের উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে ভূটানে বৃহৎ শিল্প কারখানা স্থাপনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কিছু শিল্প কারখানা যেমন-সিমেন্ট, স্টিল ইত্যাদি স্থাপিত হয়েছে। ভূটান সবই মূলতঃ ভারত থেকে আমদানী করে, এইসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে উড়োজাহাজ, তেল, খাদ্যশষ্য, কাঁচামাল, মটরযান ইত্যাদি। রপ্তানী করে সিমেন্ট, ফলমূল, কাঠ, আলু, কমলা ইত্যাদি। বেশির ভাগ রপ্তানিও হয় ভারতে, তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য, সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ এবং পশ্চিম ইউরোপেও অল্প পরিমাণে রপ্তানী হয়।[১১]

ভূটানের ৭৯% লোক গ্রামে বাস করে। মোট জনসংখ্যার ৩৯.১% লোকের বয়স ১৫ বছরের নিচে, যারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না।[১২] ভূটানের যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও অনুন্নত। ভূটানের বেশির ভাগ রাস্তা মাটির, ফলে পায়ে হেটে চলতে হয়। ভারতের সহায়তায় ভূটানে কিছু লিংক রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।[১৩] বিশ্বের সাথে ভূটানের (Telecommunications) বার্তা মাধ্যম যোগাযোগ ও ভারতের মাধ্যমে রক্ষা করা হয়।[১৪] ভূটানের স্থলভাগের দৃশ্য মূলত পাহাড় ও অসমান পর্বতময় বা রাস্তাঘাট নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত নির্মাণকে কঠিন ও ব্যয়বহুল করে তুলেছে। তাছাড়া ও সমুদ্রের তলদেশে বিভিন্ন জিনিস আহরণের ক্ষেত্রে তারা সক্ষম না হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিকখাত থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। ভূটানের নিজস্ব কোন রেলপথের ব্যবস্থা নেই। পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হয়, তবে ভারত ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে ভূটানের সাথে চুক্তি করেছে যার ফলে দক্ষিণ ভূটানকে ভারতের রেলপথের সাথে সংযুক্ত করা হবে।[১৫] ২০০৩ সালে ভূটানের মুদ্রাস্ফীতির পরিমান ধার্য করা হয়েছিল প্রায় তিন শতাংশ। তবে দিন দিন ভূটানের অর্থনীতি উর্দ্ধগামী হচ্ছে ভূটানের শিল্পখাত ও দ্রুত বর্ধনশীল পর্যায়ে রয়েছে। ভূটানে বিভিন্ন ধরনের খনিজ সম্পদও রয়েছে। খনিজ সম্পদের মধ্যে ডিনামাইট, চুনাপাথর, সৈন্ধব লবণ উল্লেখযোগ্য।[১৬] ভূটানের রাজস্ব আসে মূলত ভারত থেকে। (Hydroelectric Power)-ইলেকট্রিক শক্তি ভারতের উত্তর প্রদেশে রপ্তানি করে। ভূটানে পর্যটন শিল্প থেকে রাজস্ব আসে। খনিজ সম্পদ এর মধ্যে রয়েছে কয়লা, জিপসাম, সিমেন্ট, রাসায়নিক পদার্থ যা ভূটান রপ্তানি করে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ভূটানের কুটির শিল্পের বিশেষ কদর রয়েছে বিশ্ববাসীর কাছে, যা পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১৭]

কৃষিশিল্প ও পশু উৎপাদনকারী এই দুইখাতের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার ৮৫% এখনও ভূটানের অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ। বৃহৎশিল্প ও খনির উন্নয়ন এখনও প্রথম পর্যায়ে রয়েছে যা দ্রুত উন্নয়ন করা প্রয়োজন। জলবিদ্যুৎ রপ্তানি থেকে সরকারের রাজস্ব ২৫% প্রদান করে। জলবিদ্যুৎ ভূটানের জন্য বৃহত্তম সম্পদ ও টেকসই নবায়নযোগ্য এবং পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ।[১৮] ভূটান এছাড়াও ক্যালসিয়াম কার্বাইড, কাঠপণ্য ও সিমেন্ট রপ্তানি করে। অন্যান্য প্রধান রপ্তানী পণ্যগুলো হল আপেল, কমলালেবু, এলাচ, আলু, শতমূলী, মাশরুমসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য। এয়ারলাইনস ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের জন্য, এ খাতগুলো শুধুমাত্র স্থূল ও জাতীয় উন্নয়নের একটি ছোট অংশ গঠন করে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়।[১৯]

পরিশেষে বলা যায়, পৃথিবীর কোন দেশই তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন ও পরিসরের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের বৈচিত্রতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ, ভূটান ও মালদ্বীপ এর ব্যতিক্রম নয়। ফলে উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি অঞ্চলের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা World Trade Organization (WTO) এর সদস্য পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশ হিসেবে এই সংস্থার অনুসৃত নীতিমালা ও বিধি বিধানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের তীব্র প্রতিযোগিতায় স্বীয় মর্যাদায় টিকে থাকাই হল মূল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। ১৯৯৩ সালের ঢাকায় সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিন ১১ এপ্রিল সার্কভূক্ত দেশ সাপটা বা দক্ষিণ এশিয়া অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষর করে। ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি এই চুক্তি নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে ও পরে নীতিগতভাবে এ চুক্তি গৃহিত হয় এবং জানুয়ারি ১৯৯৬ সাল থেকে কার্যকর হয়। সার্কভুক্ত দেশে বাংলাদেশের রপ্তানী কিছুটা কমেছে। তবে আশা করা যায়, অতি শিগগিরই রপ্তানী আবার বাড়বে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, ভারতসহ সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ আফগানিস্তান, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল ও পাকিস্তানে বাংলাদেশের পোশাক, চামড়া, পাট, আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি হয়। তিনি বলেন সার্কভুক্ত দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দায়ী।[২০]

তৃতীয় অধ্যায় পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ, ভূটান ও মালদ্বীপের অর্থনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি এবং মূল অর্থনৈতিক পণ্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। উক্ত অধ্যায়ে আলাদাভাবে তিনটি দেশের অর্থনৈতিক নির্ভরতা সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে যা থেকে তিনটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বোঝা যায়। সুতরাং উক্ত অধ্যায়টি এই তিনটি দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে একটি দেশের বাজার সম্পর্কিত ধারণা পাওয়া যায়। এ অধ্যায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মালদ্বীপের অর্থনীতি শ্রীলংঙ্কা এবং ভূটানের অর্থনীতি মূলত ভারতের উপর নির্ভরশীল। এ অবস্থার উন্নয়ন না ঘটালে, এ দুটি দেশের অর্থনীতি ও বাজার ব্যবস্থা অসম অর্থনীতিতে পরিনত হবে। এ দুটি দেশের সাথে বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে এ অবস্থার উত্তরণ সম্ভব। যেমন বাংলাদেশ, ভূটান এবং মালদ্বীপে দক্ষ জনশক্তি এবং খাদ্য রপ্তানী করতে পারে, যা ঐ দু'টি দেশের দক্ষ জনশক্তি ও খাদ্য ঘাটতি পূরণ করবে। অপরদিকে বাংলাদেশ ভূটান এবং মালদ্বীপ এ দু'টি

দেশের সাথে পর্যটন শিল্পের বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে সমঝোতায় কোন প্যাকেজট্যুর প্রোগ্রাম চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে যা পর্যটকদের জন্য আকর্ষনীয় হবে এবং তিনটি দেশেই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। তাছাড়া বাংলাদেশ, ভূটান ট্রানজিট ও বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা দু'দেশের জন্যই সুফল বয়ে আনবে।

তথ্যনির্দেশ

১. Economic and Political Relations, Between Bhutan and Neighbouring countries. A joint Reserach Project of the Centre for Bhutan Studies (CBS) and Institute of Developing Economics Japan External Trade organization (IDE/JETRO), Page-3. (PDF online book)

২. New Encyclopedia Britannica,Volume-14,Macropedia, Knoledge in depth 15th edition, 1768, Jaeob E.Safra Chairman of the board Jouge Anguilar-cauz, President, Chicago/London/New Delhi/Paris/Seoul/Sydney/Taipei/Tokyo. Page-900. (online)

৩. "World development indicators",The World Bank Group, Retrieved 28 December 2013.

৪. Reserch and Information System for the "Non Aligned and other Developing Countries",(RIS 2002, P.L History of Section.)

৫. SAARC Summit 1999. (Online)

৬. "World development indicators",The World Bank Group, Retrieved 28 December 2013

৭. "World development indicators : size of economy", The World Bank Group, Retrieved 28 December 2013.

৮. "GNH Survey 2010", The centre for Bhutan Studies, Retrieved 17 October 2013.

৯. " Bhutan" - The World Factbook, Central Intelligence Agency.(Website).

১০. "Member Information : India and the WTO", World Trade Organization (WTO), Archived from the original on 22 April 2009. Retrieved 23 April 2009.

১১. CIA World Fact Book , All values, unless otherwise stated, are in US dollars.
And Asia and Pacific 1983, P- 97, Also Asia year Book, 1983, P-118.
And Wikipedia, Economy of Bhutan

১২. World Development Bank Report-2004.

১৩. Asia year book, 1986, opcit, P-115, P. 100. Also Asia and Pacific, 1984.

১৪. Asia and pacific 1983, P-97, Also Asia year Book 1983, P-118.

১৫. Page Jeremy, "Isolated Buddhist kingdom of Bhutan to get its first railway link", The Times (Times Newspapers Ltd, 30 December 2009), Retrieved 10 June 2011. ^ Sharma, Rajeev (25 January 2011),"MoUs with Bhutan on Rail Links, Power Projects", Tribuneindia.com. Retrieved 23 April 2009.

১৬. Chin S. Kuo, "The Mineral Industries of Bhutan and Nepal", *2006 Minerals* Yearbook. U.S. Geological Survey, (October 2007).

১৭. "Bhutan", The World Factbook, Central Intelligence Agency, (Official Website).

১৮. Bhutan Revenue and Custom Dept. (Official Website)

১৯. "Bhutan" – The World Factbook, Central Intelligence Agency
And Wikipedia, Economy of Bhutan

২০. SAARC Official Website(Summit Review).

চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাস জুড়ে যেমন সমাজ ও সংস্কৃতির নানাবিধ ব্যাখ্যা দিয়েছেন সমাজ বিজ্ঞানীরা, তেমন দিয়েছেন তারা সমাজ ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের বর্ণনাও । তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়ে সহজভাবে বলা যায়, সমাজ হচ্ছে এমন কিছু মানুষের সমষ্টি যারা কিনা বিভিন্ন বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ যেমন ধর্ম, জাতি, বর্ণ, নাগরিকত্ব ইত্যাদি। এই বন্ধনসূত্র আবার ভিন্ন ভিন্ন আদল যেমন-প্রথাগত গণতান্ত্রিক ক্ষমতার কাঠামো তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে সংস্কৃতিকে সহজভাবে বর্ণনা করা যায় সেই সকল প্রথা, প্রক্রিয়া, কর্মধারা ও ভাবধারা দ্বারা যা কিনা একটি বিশেষ সমাজকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। সমাজ ও সংস্কৃতি তাই ওতপ্রোতোভাবে জড়িত, কেননা দুটির ভিত্তি স্থলেই রয়েছে মানবচিন্তা, চেতনা ও ভাবধারা। কথিত আছে মানুষ একা থাকতে পারে না তাই সে সমাজ গঠন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনে সমাজ ও সংস্কৃতি কেবলমাত্র তার বেঁচে থাকার জন্য অবলম্বন নয়, তার আশা আকাঙ্খা অভিলাষকে রূপ দেয়ার ক্ষেত্র, তার সীমাবদ্ধ অস্তিত্বকে অসীমে রূপান্তর করার মাধ্যম। এখানেই মানব সমাজ প্রাণীজগত থেকে ভিন্ন। সামাজিক ও সংস্কৃতির চালিকা শক্তি হিসেবে কয়েকটি সূচক ধরা যেতে পারে, যেমন-সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা, অর্থনীতি ও প্রযুক্তি। এই অধ্যায়ে এসব সূচক ধরেই এ তিনটি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে।

Map of calture south asian country

https://www.google.com/search?q=https://www.google.com/search?q=calture+of+map+south +asian+country

বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশ সৃষ্টির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই ইতিহাসের কারণে পুরনো ও নতুন উপাদানের সমন্বয়ে এই দেশের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। বাংলা ভাষার গর্ব করার মত সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে, যা বাংলাদেশ ও (ভারতের রাষ্ট্র) পশ্চিম বাংলা ভাগাভাগি করে। অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্য গ্রন্থ ছিল চর্যাপদ, মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যে ধর্মের প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। বিশেষত; চন্ডীদাস ও আলাওল। নবম শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য চরম উৎকর্ষতা লাভ করে, অভাবনীয় প্রতিভাবান দুজন ব্যক্তির হাত ধরে তারা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম। লোকজ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস বিদ্যমান। যেমন; মংমনসিংহ গীতিকা, ঠাকুরমার ঝুলি এবং গোপাল ভাড়ের গল্পকাহিনী। বাংলাদেশের সংগীত ঐতিহ্যগতভাবে বাণী প্রধান বা লিরিক প্রধান, যার সাথে সাধারণ মাত্রার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বাংলার লোকসংগীতের অনুপম ঐতিহ্য হল বাউল সংগীত।[১] এছাড়াও বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগীতের ঐতিহ্য রয়েছে। গম্ভীরা, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া এর মধ্যে অন্যতম। বাংলার লোকসংগীত প্রায়শই একতারার মাধ্যমে হয়ে থাকে, একতারায় অসাধারণ এক তার সংযুক্ত থাকে। অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে ঢোল, বাঁশি এবং তবলা। উত্তর ভারতের যে ক্ল্যাসিকাল নাচ তাতেও বাংলাদেশের নাচের সংস্কৃতির মিশ্রণ রয়েছে। বিশেষত আদিবাসীদের নৃত্য এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।[২] হা-ডু-ডু বাংলাদেশের জাতীয় খেলা তবে বর্তমানে ক্রিকেট খেলা বাংলাদেশে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে।[৩] যেকোন মানব সমাজ ও সংস্কৃতিতে ভাষা একটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে। আর বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব যে কতদুর তা আজকের মহান ভাষা দিবস-ই তার সাক্ষী। মহান ভাষা দিবস ও ভাষা আন্দোলন আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি এমনকি রাজনৈতিক অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত । ভাষা আন্দোলন কিভাবে একটি সমাজের চিন্তা -চেতনা ও অগ্রসরতাকে শাণিত করতে পারে ও এক নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনে ভূমিকা রাখে বাংলাদেশ তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইউনেসকো ঘোষণার মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারি বিশ্বের দোরগোড়ায় পরিচিত হয়েছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। এই রূপান্তরের শিক্ষা বোধহয় নিজেদেরই নিতে হবে আগে এবং সেটা বাংলাদেশেরই আঙ্গিকে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে স্বীকৃতি দিতে হবে যে বাংলাদেশে কেবলমাত্র বাংলাভাষাভাষি লোক নেই , আছে অনেক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী সমাজ ও দলিত সম্প্রদায়

যাদেরকে উপনিবেশিক ও প্রাক -উপনিবেশিক আমলে নিয়ে আসা হয়েছে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে। যেমন; চা বাগানের শ্রমিক, বননির্ভর আদিবাসী, ও স্থানচ্যুত অভিবাসী। যারা ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, সাঁওতাল পরগণা, ও পশ্চিম বাংলা থেকে এসে ছে। তাদের মাতৃভাষা ভিন্ন। যেমন; তেলেগু, ভোজপুরি, উর্দু ও সাঁওতাল ভাষা। এছাড়াও এদেশে রয়েছে অনেক আদিবাসী যাদের নিজ নিজ ভাষা রয়েছে, যেগুলির অনেকটাই লিখিত আকারে রয়েছে আবার অনেকগুলো নেই। বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেই এই সকল মাতৃভাষার মাধ্যমে শি ক্ষা দেওয়া হয়না এখনও। তাই মাতৃভাষার শিক্ষাদানকে কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করার জোর দাবী জানিয়েছে এসব প্রান্তিক গোষ্ঠীরা। যে দেশ জন্মেছে মাতৃভাষাকে আলিঙ্গন করে, রাষ্ট্রীয়ভাষাকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করে, এটি সেদেশের মৌলিক কর্তব্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে অপর একটি দিক লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে বাংলার আঞ্চলিক ভাষাগুলো। বাংলাভাষায় নিজ জেলা বা উপজেলাকে 'দেশ' বলে। অঞ্চলপ্রীতি তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে লোকজধারাকে সমৃদ্ধ করেছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় পুঁথিপাঠে ও লোকজ গানে। বাংলা একাডেমী স্বাধীনতা উত্ত র কালে বাংলার আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকাশ করে তাই বিশ্বনন্দিত হয়েছে। আবার এটাও সত্য যে আঞ্চলিকতার কিছু নেতিবাচক দিক আছে যাকে ইংরেজিতে বলে (parochialism) আঞ্চলিকতা অর্থাৎ নিজ অঞ্চলকে সব বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া, সেটা প্রাসঙ্গিক হোক বা না হোক। কিন্তু এটাও ঠিক যে অনেক সময় আঞ্চলিক ভাষা একটি যোগাযোগের সেতু বন্ধন তৈরি করে যা ব্যতীত সেই অঞ্চলের উন্নতি করা দুঃসাধ্য। বাংলাদেশেই রয়েছে এমন উদাহরণ, আঞ্চলিক ভাষাকে নিয়ে এরকম একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে চট্টগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে ১৪টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী যাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। তারা একে অপরের সাথে কথোপকথন করে তাদের সান্নিধ্যে যে বৃহত্তম গোষ্ঠীর ভাষা আছে তার মাধ্যমে, যেমন খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে চাকমা ও বান্দরবানে মারমা ভাষা। কিন্তু এ বাদেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় স্থানীয় চট্টগ্রামের ভাষা বিশেষ করে আন্তঃজেলা যোগাযোগে। অন্যদিকে মায়ানমার থেকে যে আরাকানী মুসলমানেরা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অত্যাচারে বিতাড়িত হয়ে এসেছে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে তারাও ব্যবহার করছে স্থানীয় চট্টগ্রামের ভাষার একটি রূপ। এতে তাদের দুঃখ -দুর্দশা প্রকাশ করতে সুবিধা হয় এবং বাংলাদেশের পক্ষেও তা সুবিধাজনক। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য ও চর্চা তাই বাংলার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারী ভাষা বাংলা।[৪] ৯৮% লোকের প্রথম ভাষা বাংলা।[৫] এছাড়া উপজাতির ২% বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে।[৬] বাংলাদেশের অনেক মানুষ ইংরেজি ও উর্দু বলতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বাংলা ভাষায়

আরবী, ফারসী, সংস্কৃতি ইত্যাদি ভাষা প্রবেশ করেছে।[৭] বাংলাদেশী মহিলাদের কাছে শাড়ী একটি অন্যতম জনপ্রিয় পোশাক। অত্যন্ত রুচিশীল জামদানি-মসলিন তৈরিতে ঢাকা বিখ্যাত ছিল। এছাড়া সেলোয়ার-কামিজ ও মহিলাদের অন্যতম প্রিয় পোশাক। পুরুষরা সাধারণত কুর্তা-পাজামা, লুঙ্গি ও প্যান্ট-শার্ট পরিধান করে থাকে।[৮] মুসলমান-৮৩%, হিন্দু-১৬%, অন্যান্য ১%। মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব হল ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা। এছাড়া রয়েছে শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত, ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী। হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হল দুর্গাপুঁজা, কালীপুঁজা ও স্বরস্বতী পুঁজা। বাঙালী সংস্কৃতির ধর্মনিরপেক্ষ সবচেয়ে বড় উৎসব হল পহেলা বৈশাখ। এদেশের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ।[৯] বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। তাই বাংলাদেশের প্রাচীনতম যাতায়াতের পথ হিসেবে নৌপথ বা জলপথকে গণ্য করা হয়, নদীপথ এবং সমুদ্রপথ উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। নদীমাতৃক দেশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থায় নদীপথ গুরুত্বপূর্ণ, তবে বহির্বিশ্বের সাথে যাতায়াত ব্যবস্থায় সমুদ্রপথ ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৮৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ রয়েছে। এর মধ্যে ৫৪০০ কিলোমিটার সারা বছর নৌচলাচলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর নৌচলাচলের জন্য বেশি উপযোগী। এ অঞ্চলেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দরগুলো হলোঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, খুলনা প্রভৃতি। নদীপথে চলাচলকারী যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই নৌকা ও লঞ্চে এবং বাকিরা স্টিমারে যাতায়াত করেন। বাংলাদেশের প্রধান দুইটি সমুদ্র বন্দর হলোঃ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এবং মংলা সমুদ্র বন্দর, মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের স্থল যোগাযোগের মধ্যে সড়কপথ উল্লেখযোগ্য। সড়কপথের অবকাঠামো নির্মাণ এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভৌগোলিক অবকাঠামোর মধ্যে বেশ ব্যয়বহুল। ১৯৪৭ সালে দেশে পাকা রাস্তার পরিমাণ ছিল ১৯৩১.১৭ কিলোমিটার, ১৯৯৬-১৯৯৭ সালের দিকে তা দাঁড়ায় ১৭৮৮৫৯ কিলোমিটারে। ২০১০ সালে দেশের জাতীয় মহাসড়ক ৩৪৭৮ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪২২২ কিলোমিটার এবং জেলা সড়ক ১৩২৪৮ কিলোমিটার পাকা হয়। দেশের সড়কপথের উন্নয়নের জন্য ‘বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন

কর্পোরেশন' (BRTC) নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। সড়কপথে প্রায় সব জেলার সাথে যোগাযোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (ব্রিজ, কালভার্ট) নির্মিত না হওয়ায় ফেরি পারাপারের প্রয়োজন পড়ে। সড়কপথে জেলাভিত্তিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় বড় যানবাহন যেমনঃ ট্রাক, বাস ব্যবহৃত হয়। আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ে ট্যাক্সি, সিএনজি, মিনিবাস, ট্রাক ইত্যাদি যান্ত্রিকবাহন ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও বহু পুরাতনবাহন যেমনঃ রিকশা, গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি ইত্যাদি। এছাড়া স্থলভাগে রেলপথ সবচেয়ে নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা হিসেবে ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[১০] ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশে রেলপথ ছিল ১৮৫৭ কিলোমিটার। ২০০৮-২০০৯ সালের হিসাব মতে, বাংলাদেশে রেলপথ রয়েছে ২৮৩৫ কিলোমিটার। এদেশে মিটারগেজ এবং ব্রডগেজ-দু'ধরনের রেলপথ রয়েছে। রেলপথ, রেলস্টেশনের দ্বারা পরিচালিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন স্টেশনকে জংশন হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। রেলপথ কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে নামে একটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।[১১] এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে বাংলাদেশে আকাশপথে বা বিমানপথে যাতায়াতের ব্যবস্থাও রয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিমান যাতায়াত ব্যবস্থায় দেশের ভেতরকার বিভিন্ন বিমানবন্দরে যাতায়াত করা যায়, আর আন্তর্জাতিক বিমান যাতায়াত ব্যবস্থায় শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বর্হিদেশে গমন করা যায়। ঢাকার কুর্মিটোলায় অবস্থিত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এছাড়াও চট্টগ্রাম এবং সিলেটেও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা হলো 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস'।[১২] বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা মূলত ছিল ডাক আদান-প্রদানভিত্তিক। কিন্তু কালের আবর্তনে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং পরবর্তীতে মোবাইল ফোনের প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়।[১৩]

তথ্যনির্দেশ

১. Meghna Guhathakurta, Representing the Khumi of the Chittagong Hill Tracks : The making of a flim, Research Initiatives Bangladesh report 2010 Dhaka.
And Maladhar Basu, Banglapedia. Bangali literature Archive, An English Magazine on Bangali Literature edited by Sayeed Abubakar (summary).www.sust.edu. (online)

২. Hasan Laila, "Dance", Din Islam Sirajul, Banglapedia : National encyclopedia of Bangladesh (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh 2003), ISBN 9843205766, OCLC 52727562, (online).

৩. "Constitution of Bangladesh" - Chapter I, Pmo.gov.bd. Retrieved on 2013-08-25.৪. "Condition of English in Bangladesh", ESL Teachers Board, Retrieved 21 October 2012, Constitution of Bangladesh, Part I, Article 5 (online).

৪. Meghna Guhathakurta, Representing "The Khumi of the Chittagong Hill Tracks:The making of a flim", Research Initiatives Bangladesh report-2010 Dhaka.

৫. "Constitution of Bangladesh" - Chapter I, Pmo.gov.bd. Retrieved on 2013-08-25.৪. "Condition of English in Bangladesh", ESL Teachers Board, Retrieved 21 October 2012, Constitution of Bangladesh, Part I, Article 5 (online).

৬. "Bangladesh",Central Intelligence Agency (2012), The World Factbook, Langley, Virginia : Central Intelligence Agency. (online)

৭. Ethnologue, "Bangladesh", Ethnologue, Retrieved 2013-07-06, (Online)

৮. তথ্য সংগ্রহ : বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা ।

৯. তথ্য সংগ্রহ : ধর্ম মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

১০. Transport Website of Bangladesh, Bangladesh Road Transport Authority, www.biwto.gov.bd.

১১. তথ্য সংগ্রহ : বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা, বাংলাদেশ ।

১২. তথ্য সংগ্রহ : শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঢাকা, বাংলাদেশ ।

১৩. ibid,

মালদ্বীপের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি

মালদ্বীপের সংস্কৃতি বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কার সাথে মালদ্বীপের নৈকট্য।[১] মালদ্বীপের সাধারণ ও অফিসিয়াল ভাষা হল (Dhivehe) দ্বিবেহী, যা মূলত ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা। মালদ্বীপের প্রথম যে হস্তলিপিতে Dhivehe ভাষা লেখা হয়।[২] তার নাম Eveyla akwru হস্তলিপি। এই হস্তলিপিটি রাজা Raadhavalhi এর ঐতিহাসিক নথিপত্র থেকে পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই লিখিত হস্তলিপিটিকে Thaana নামে অভিহিত করা হয় এবং যা ডানদিক থেকে বামদিকে লেখা হয়।[৩] মালদ্বীপে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সরকারী স্কুলগুলোতে নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার করা হয়।[৪] মালদ্বীপের ইতিহাসে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচলন বহু শতাব্দী ধরে বিদ্যমান ছিল।[৫] মালদ্বীপে মুসলিম ব্যবসায়ীরা সুন্নী ধর্মের প্রচলন ঘটায়। তবে পরবর্তীতে ১২ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাদ্বিভিয়ানেরা এর পরিবর্তন ঘটায়। মালদ্বীপে সমাধিসৌধ নির্মাণের ক্ষেত্রে সুফিজন বা সুফিবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৮০ সাল থেকে এই সমাধিসৌধে মৃত সুফীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হত। এই সমাধি সৌধগুলো বর্তমানেও দেখা যায় এবং এগুলো সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত। সুফিবাদের আর একটি অন্যতম বিষয় হল 'Dhikr' উৎসব যেখানে সাধারণ জনগণ একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করে আর এর নাম হল 'Mauludu'। এই 'Mauludu' উৎসব অলংকৃত তাবুতে অনুষ্ঠিত হয়।[৬] বর্তমানে সুন্নী ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি মালদ্বীপের সমগ্র জনগোষ্ঠীর অফিসিয়াল বিধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মালদ্বীপে ১২ শতাব্দীর দিকে আরবি ভাষার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। মালদ্বীপের সংস্কৃতির পরিবর্তন ও ঘটেছে ১২ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মে ধমান্তরিত হওয়ার কারণে।[৭] মালদ্বীপের দ্বীপ সংস্কৃতিতে (island culture) আফ্রিকান সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মালদ্বীপের উত্তর Ari Atoll এর Feridhu ও Maalhos এবং দক্ষিণ Maalhosmadulhu Atoll এর Goidhu দ্বীপের অধিবাসীরা আফ্রিকান দাসদের পূর্বপুরুষ হিসেবে মনে করে।[৮]

মালদ্বীপের জনগণের প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ। বিশেষ অনুষ্ঠানে শুকোরের মাংস ছাড়া অন্য মাংস খাওয়া হয়। এরা সবজি তুলনামূলক কম খায়। খাওয়ার পর এদের পান, সুপারি চিবানোর অভ্যাস

রয়েছে। বৃদ্ধরা আবার জল টানা নল দিয়ে ধূমপান করে। মালদ্বীপের দরিদ্র মানুষ টিনের ছাদ দিয়ে এবং খড়ের করতল দিয়ে ঘর নির্মাণ করে। অর্থনীতির প্রধান উৎস পর্যটন, মৎস সম্পদ এবং হস্তশিল্প। সামাজিকভাবে পারিবারিক বন্ধনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সরকার মজলিসের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের বিচার কার্য সম্পাদন করেন। ইসলামিক আইন অনুযায়ী বিবাহ কার্যসম্পাদন করা হয়। নারীদের ক্ষেত্রে মালদ্বীপে আইন করে বিয়ের বয়স ১৮ ধার্য করা হয়েছে। ইসলামিক আইন অনুযায়ী পুরুষ এবং নারী উভয়ই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। মালদ্বীপের গুরুজন এবং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত অনুসারীরা সম্মানের পাত্র। মালদ্বীপের জাতীয় ধর্ম ইসলাম। মালদ্বীপের সকল মুসলিম সুন্নি সম্প্রদায় অন্তর্গত। রাষ্ট্রপতি প্রধান ধর্মীয় নেতা হিসেবে গণ্য হয়। মালদ্বীপের সমাজব্যবস্থা মূলত প্রাচীন ঐতিহ্য এবং ইসলাম ধর্মের মিশ্রণে চালিত হয়। মালদ্বীপের বেশিরভাগ ছুটি ইসলামি চন্দ্রের উপর ভিত্তি করে হয়। যেমন; রমজান শেষে অমবস্যা, নবী মোহাম্মদ (সা:) এর জন্মদিন ইত্যাদি। মালদ্বীপে তিনটি শিক্ষা প্রবাহ বিদ্যমান যথা: প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক স্কুল এবং উচ্চতর পর্যায়। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।[৯] মালদ্বীপের সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গ বৈষম্য বিদ্যমান। ২০০৭ সালে একটি জাতীয় জরিপে দেখা যায় ১৫-৩৯ বছর বয়সী মহিলাদের প্রতি তিন জনের মধ্যে একজন নারী সহিংসতার শিকার হয়। শ্রমশক্তির অংশগ্রহণে নারীদের হার কম। মালদ্বীপে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ইউএনডিপি এইসব সমস্যা মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নাশিদ বলেন যে, দেশের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার মানুষ, যে কোন দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী তাই দেশের উন্নয়নের গতি বাড়াতে হলে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।[১০] মালদ্বীপে একটি সাধারণ সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, আর তা হল যেসব বিদেশি লোক মালদ্বীপে কর্মে নিযুক্ত রয়েছে তারা বিভিন্ন অশালীন আচরণ ও অবিচারের স্বীকার হয়। তাই ক্ষতিগ্রস্থ কর্মজীবিদের পক্ষ থেকে তাদের সরকার প্রধান মালদ্বীপের সরকার প্রধানকে বলে দিয়েছেন এ রকম হলে তারা তাদের দেশে এই কর্মজীবিদের ফিরিয়ে আনবেন।[১১]

তথ্যনির্দেশ

১. New Encyclopedia Britannica,Volume-7, PP -731-732. And http://travelbazars.com/TravelCustomer/city-guide.aspx?c=Maldives 033 – 4005 6666 / 2421 0035. (online)

২. Frommer's India – Google Books. Books.google.mv. 2010-02-18. Retrieved 2013-08-21. And Journal of the Bombay Natural– Google Books. Books.google.mv. Retrieved 2013-08-21. And Concise encyclopedia of languages of Google Books. Books.google.mv. Retrieved 2013-08-21 (online).

৩. Xavier Romero-Frias, "The Maldive Islanders, A Study of the Popular Culture of an Ancient Ocean Kingdom", (Barcelona press ltd,1999). ISBN 84-7254-801-5 (online).

৪. 2014 Narnia Maldives, Inc Terms of Service, (website). http:// narniamaldives. com Culture(online).

৫. Conversion of the Maldives to Islam (Website). http://en.wikipedia.org/wiki/Thaana).

৬. http://narniamaldives.com/Culture. (online)

৭. 2014 Narnia Maldives, Inc Terms of Service, (+960)9193131.

৮. Xavier Romero-Frias,"The Maldive Islanders, A Study of the Popular Culture of an Ancient Ocean Kingdom", (Barcelona press ltd. 1999), ISBN 84-7254-801-5

৯. http://www.every culture .com/ja-ma/Maldives.html (online)

১০. Minivan Net log.27 Nov. 2011. (Online)

১১. Ministry of Labour and Human Resources, Minister Layonpo Dorji Wangdi. (Online)

ভূটানের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি

ভূটানের রয়েছে একটি সমৃদ্ধ ও অনুপম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, যার অধিকাংশই অক্ষত অবস্থায় রয়েছে কারণ ভূটান ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত ছিল। ভূটানের পর্যটন শিল্পের অন্যতম মূল আকর্ষণ হল সে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য।[১] দক্ষিণ এশিয়া ও সার্কভুক্ত দেশগুলোর প্রাকৃতিক নৈসর্গের অন্যতম পুণ্যভূমি হলো বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দেশ ভূটান। সুবিশাল হিমালয়ের কল্যা ণে উঁচু পর্বতমালা, ঘন বনজঙ্গল, সবুজ ভ্যালি ভূটানের প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত। সেদেশের সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানকে দর্শনীয় স্থান হিসেবে উল্লেখযোগ্য করে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ভূটানের রাজধানী থিম্পু তেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বরং বলা যায় গোটা ভূটানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং নান্দনিক সৌন্দর্যের অবস্থানই হলো এই থিম্পুতে। থিম্পু নদীর তীরে সিলভান ভ্যালিতে অবস্থিত এথনিক ভূটানিজ কলা, স্থাপত্যশিল্প, সংস্কৃতির পীঠস্থান। থিম্পুতে আছে ইউনিক ফ্লেভার। সিমতোখা জং ১৬২৭ সালে তৈরি যা জং থিম্পু ভ্যালির গেটওয়ে। থিম্পুর সব চেয়ে পুরনো এই জংয়ে আছে রিগনে স্কুল ফর জংঘা অ্যান্ড মোনাস্টিক স্টাডিস। ফ্রেশকো এবং কার্ভিংস সিমতোখার বিশেষ আকর্ষণ। থিম্পু জং : ফোর্ট্রেস অব দ্য গ্লোরিয়াস রিলিজিয়ন থিম্পু জং হলো ভূটানের রাজধানী থিম্পু শহরের প্রাণকেন্দ্র। ১৬৬১ সালে এটি তৈরি। এখানে আছে সরকারি ডিপার্টমেন্ট, দ্যা ন্যাশনাল এসেম্বলি, রাজার থ্রোন রুম এবং সেন্ট্রান মনাস্টিক বডির গ্রীস্মকালীন হেডকোয়ার্টাস। মেমোরিয়াল কর্টেন : এটি মূলত স্মৃতিস্তম্ভ। ভূটানের তৃতীয় রাজা জিগমে দরজি ওয়াঙচুকের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১৯৭৪ সালে এই স্তূপ তৈরি হয়েছিল। এর ভেতরের বিভিন্ন পেইন্টিং এবং স্ট্যাচু বৌদ্ধ ফিলোসফির প্রতিবিম্ব। থিম্পু পুনাখা : দোচুলা পাস হয়ে থিম্পু শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত পুনাখায়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ৩০৫০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এই পাস থেকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ প্রাকৃতিক নির্দশন হিমালয়কেও দেখা যায়। পুনাখা ভূটানের সব থেকে উর্বর ভ্যালি। আরো রয়েছে ফো ছু এবং মো ছু নদী। সেই সঙ্গে পুনাখা জং। এছাড়াও রয়েছে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, হ্যান্ডিক্রাফট এম্পোরিয়াম, পেন্টিং স্কুল এবং ট্রাডিশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট। থিম্পুর বাইরে প্রাকৃতিক দর্শনীয় স্থাপনার সাম্রাজ্য ভূটানে আরো অজস্র দর্শনীয় স্থান রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ছোট্ট শহর পারোর কথা বলা আবশ্যক। পারো জুড়ে আছে নানারকম গল্পকথা। বিশেষ করে বসন্ত ঋতুতে পারোর রূপ হয়ে ওঠে

অতুলনীয় এবং দর্শন সুখকর। পারোতে রয়েছে পারো জং ও ন্যাশনাল মিউজিয়াম। তবে পারোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ টাইগার্স নেস্ট। এই মনাস্ট্রি পারো থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে একটি ক্লিফের উপর অবস্থিত। হেঁটে ওঠার পথটিও খুব সুন্দর। বুমথাং : বুমথাংকে বলা হয় ভূটানের আধ্যাত্মিক হৃদয়ভূমি। কারণ ভূটানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জং, মন্দির এবং মহল এই অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে রয়েছে ওয়াংগডিচোলিং প্যালেস, জাম্বে লাখাং মন্দির এবং সবচেয়ে বড় ভূটানিজ মন্দির জাকার। এর পাশাপাশিই অবস্থিত হট স্প্রিং এরিয়া। এই এলাকায় ব্লু শিপ , মাস্ক ডিয়ার, হিমালয়ান ভল্লুক চোখে পড়ে। থিম্পুতে অধিকাংশ হোটেলই তৈরি হয়েছে ভূটানিজ ঐতিহ্যের স্টাইলে ।[২] এইসব দর্শনীয় স্থানসমূহ পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

ভূটানের উত্তরাধিকার নারীসূত্রে বণ্টিত হয়। পিতামাতার বাড়ি সাধারণত কন্যারা সম্পত্তি হিসেবে পেয়ে থাকে। ভূটানের শহরাঞ্চলে প্রেমের বিয়ে সচরাচর দেখা যায়। গ্রাম্যঞ্চলে এখনও ঐতিহ্যগতভাবে পিতামাতা তাদের সন্তানদের নিজস্ব পছন্দে বিয়ে দিয়ে থাকে। ভূটানে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত। ভূটানের সাবেক রাজার চার স্ত্রী বিদ্যমান ছিল (জিগমে সিংগে ওয়াংচুক)। ভূটান ঐতিহ্যগতভাবে ফিউডাল সমাজ নির্মাণ করে থাকে। ভূটানিজরা বিভিন্ন রং এর স্কার্ফ ও চাদর পরিধান করে। এই পোশাক তাদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। নারীরা সাধারণত সোনার গহনা ব্যবহার করে। পাথরের অলংকার ও ব্যবহার করে। ভূটানের ছেলেদের পোশাকের নাম ‘ঘো’ যার উপরে ঢোলা এক ধরনের জ্যাকেট এবং নিচে লুঙ্গি বা স্কার্ট এর মতো অংশ পরিধান করে। এই দুই অংশ মিলে ‘ঘো’ হয়। মেয়েদের পোশাকের নাম ‘কিরাতেগ’, যে পোশাকের উপরের অংশকে বলে কিরা এবং নিচের অংশের নাম তেগ। ধান, গম, ভূট্টা ইত্যাদি ভূটানের প্রধান খাদ্য। স্থানীয় খাবারে মধ্যে রয়েছে মুরগি, খাসীর মাংস, গরুর মাংস, শুকরের মাংস ইত্যাদি। ইমা দুসি (Ema dutshi) ভূটানের একটি ঐতিহ্যগত সুস্বাদু খাবার। বেশিরভাগ খাবারেই পাওয়া যায় শুটকির গন্ধ।[৩] পাহাড়ের ওপরে হওয়ায় ওখানে ঠাণ্ডা বেশি পড়ে তাই ওরা খুব স্বাভাবিকভাবেই বিয়ার এবং অন্যান্য পানীয় পান করে। ভূটানে অ্যালকোহল খুবই সহজলভ্য কিন্তু কোথাও সিগারেট পাওয়া যায় না। পানীয়জাত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে, চা, মদ ইত্যাদি। ভূটানের প্রায় প্রতিটি দোকানই যেন বার, সেখানে বিয়ার থেকে শুরু করে কিছু লোকাল এবং কিছু বিদেশি ব্রাণ্ডের মদ পাওয়া যায়। ভূটান একমাত্র দেশ যেখানে তামাকের বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।[৪] থিম্পুর অদূরে পাহাড়ের এক চত্বরের মাঝখানে ছোট্ট

একটা গোল টিলার উপর রয়েছে স্মৃতিসৌধ। যা আসাম থেকে আশ্রয় নেয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী উলফাদের উৎখাতের জন্য ছোট ছোট কয়েকটি অভিযান হয়েছিল। সফল এই অভিযানে যে সমস্ত বীর ভূটানি যোদ্ধারা মারা গিয়েছিলেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্য রাজমাতা ২০০৩ সালে ১০৮টি স্তুপের এই স্মৃতিসৌধটি তৈরি করেছিলেন। পাহাড়ি আঁকাবাকা রাস্তার দুইপাশে পাইন, ফার, হেমলক গাছের ঘন অরণ্য আর পাহাড়ি বাহারি ফুলের মেলা বিদ্যমান।[৫]

চিত্র : স্মৃতিসৌধ

ভূটানের জাতীয় খেলা হচ্ছে আর্চারী (Archery) ধনুকবিদ্যা। এই খেলা প্রায় প্রতিদিন অধিকাংশ গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। ভূটানের এই খেলার নিয়মাবলি আন্তর্জাতিক নিয়ম থেকে আলাদা। ঐতিহ্যগতভাবে ভূটানের ধনুক খেলা একটি সামাজিক ঘটনা। এই প্রতিযোগিতা শহর, গ্রাম এবং অপেশাদার, পেশাদারদের মাঝে সংঘটিত হয়। ডার্টস কুরু (Darts khuru) হচ্ছে আর একটি অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। এছাড়াও ভূটানের আর একটি অন্যতম জনপ্রিয় খেলা হল ডিগর (digor)। বর্তমানে ভূটানে ক্রিকেট খেলাও জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ফুটবল খেলা ও ভূটানে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভূটানের ঐতিহ্য মূলত বৌদ্ধধর্ম থেকে আগত। হিন্দু ধর্ম ভূটানের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ধর্ম, যা দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে বেশি দেখা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ ভূটানে শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করে। ভূটানের উল্লেখযোগ্য একটি দূর্গ হল ডং (dtong)। প্রাচীনকাল থেকেই এই ডং (dtong) ধর্মীয় ও একই সাথে ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে আসছে, তাদের নিজ নিজ জেলাগুলোতে। ভূটানে রয়েছে অসংখ্য সরকারী ছুটি দিন। এর অধিকাংশই হল ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মীয় উৎসব এবং অতিরিক্ত মৌসূমী (Seasonal) ছুটিও বিদ্যমান। রাজার

জন্মদিন, তার রাজ্যাভিষেক, বর্ষপূর্তি ও ভূটানের জাতীয় দিবসে (ডিসে. ১৭) সরকারি ছুটি দেওয়া হয়। মুখোশ পরে নৃত্য ও নাটক করা তাদের ঐতিহ্যগত উৎসবের একটি অন্যতম বিষয় । ঐতিহ্যগত উৎসবের এই নৃত্যে মুখোশগুলোতে বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিচ্ছবি, ব্যঙ্গচিত্র, ভিন্ন মহাপুরুষদের প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান থাকে।[৬]

চিত্র: ঐতিহ্যগত উৎসবে মুখোশ পরিহিত নৃত্য

রিজার (Rigsar) হচ্ছে ভূটানের অন্যতম জনপ্রিয় সংগীত, যা ঐতিহ্যগত যন্ত্রপাতি ও ইলেক্ট্রনিক কিবোর্ড এর মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এটি ভারতীয় জনপ্রিয় সংগীতের সাথে ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্যের প্রভাব এর শংকরকে চিহ্নিত করে, ভূটানের ঐতিহ্যগতরীতি অন্তর্ভূক্ত করে।[৭]

চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তিনটি দেশের সামাজিক অবস্থা ও সংস্কৃতি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থা এবং সংস্কৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কিত ধারনা দুটি পৃথক দেশের সম্পর্ক সংক্রান্ত অধ্যয়নের ভিত্তি। কোন দেশের সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত ধারণা উক্ত দেশের সাথে বাণিজ্যিক অথবা কুটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক অবস্থার পরিমাপক। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যয়নে সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা বাধ্যতামূলক। এছাড়া এ অধ্যায় থেকে তিনটি দেশের ধর্ম, আচার-আচারন, খাদ্যাভাস, পানীয়, কৃষ্টি-কালচার, পোশাক ও

সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে যা তিনটি দেশের সম্পর্ক নির্ধারনের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আলোচ্য চারটি অধ্যায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ তিনটি দেশের ভৌগলিক অবস্থান ভারত মহাসাগরের সামুদ্রিক রুটের পাশে, পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সম্পদ কম বা সঠিক ব্যবহারে অদক্ষ, ফলে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ও অদক্ষ জনশক্তি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এই সমসাময়িক বিষয়বলী তিনটি দেশকে একই আবর্তে আবর্তিত করেছে যা বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. Kharat Rajesh, “Bhutan's Security Scenario”,Contemporary South Asia 13 (2): 171–185. doi:10.1080/0958493042000242954. (2000) (Website)

Martin Regg Cohn,“Lost horizon” Toronto Star (Canada) n.d.: Newspaper Source Plus. (Web). Dated : 8 December 2011.

২. সোমবার ঢাকা ১৩ এপ্রিল ২০১৫, ৩০ চৈত্র ১৪২১, ২৩ জমাদিউস সানি ১৪৩৬, মানবকণ্ঠ।

৩. Interview of the reporter , Prokash, (+97517644695) of Bhutan.

৪. Brown Lindsay Armington Stan, “Bhutan”,Country Guides (3 ed.). (Lonely Planet press : 2007). pp. 26-36. ISBN 1-74059-529-7.

৫. New Encyclopedia Britannica,Volume-14, Macropedia, Knoledge in depth 15th edition, 1768, Jaeob E.Safra Chairman of the board Jouge Anguilar-cauz, President, Chicago/London/New Delhi/Paris/Seoul/Sydney/Taipei/Tokyo.-p.p-901-902. (online)

৬. Clements William M., “The Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife : Southeast Asia and India, Central and East Asia, Middle East 2” (Greenwood Press, 2006), p.p-105–110. ISBN 0-313-32849-8.) (online)

Penjor Ugyen, “From Ngesem Ngesem to Khu Khu Khu ... Rigsar music woos local music fans”, 19 January 2003, Kuensel (online), Retrieved 16 October 2011.

৭. Clements William M., “The Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife: Southeast Asia and India, Central and East Asia, Middle East 2”, (Greenwood Press, 2006). p.p-105–110. ISBN 0-313-32849-8.) (online)

Penjor Ugyen,“From Ngesem Ngesem to Khu Khu Khu ... Rigsar music woos local music fans”, 19 January 2003, Kuensel (online), Retrieved 16 October 2011.

And “Rigsar Dranyen”, RA Online- 17 June 2011, Retrieved 16 October 2011, (Bhutan Turist Information) (online).

পঞ্চম অধ্যায়

ক্ষুদ্ররাষ্ট্র সংজ্ঞায়ন ও তার পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি সমূহ

ক্ষুদ্ররাষ্ট্র ও তার ক্ষুদ্ররাষ্ট্র সংজ্ঞায়ন : তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা সর্বাধিক করা জন্য তাদের সামনে যে সমস্ত পথ আছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনায় যাবার আগে সর্বপ্রথমে 'ক্ষুদ্ররাষ্ট্র' ও 'নিরাপত্তা' বিষয় দুটিকে সঙ্গায়িত করা দরকার। কেননা এ ধারণাগুলোর অর্থ বিভিন্ন পন্ডিত ও রাষ্ট্রনায়কের কাছে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। The Inequality of States : A study of the Smaller Power in International Relations (Vital 1967) গ্রন্থটি পড়ার পর Hedley Bull এর রিভিউ উপসংহারে বলেন, একজন যে প্রশ্ন নিয়ে শেষ করবে তা হল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলো যতই কার্যকর হোক না কেন, প্রকৃত পক্ষে এটা একটা কার্যকর অধ্যায় বিষয়ে পরিণত হয়েছে।[১] ক্ষুদ্ররাষ্টগুলোর বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত সাহিত্যের সাধারণ পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসেবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ধারণার অনুপযুক্ততার যুক্তি দেখিয়েছেন এবং গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আকৃতিগত ক্ষুদ্রতাকে পরিত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন।[২] অন্যদিকে ফ্যাক্স (Fox) এর যুক্তি হল, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একটি বিশ্লেষণের শ্রেণী হিসেবে ততটুকুই অর্থহীন, আন্তর্জাতিক পদ্ধতি বিশ্লেষণের শ্রেণী হিসেবে যতটুকু অর্থহীন।[৩] বিশ্লেষণের একটি শ্রেণী হিসেবে ক্ষুদ্ররাষ্ট্র ধারণার প্রয়োগিকতা বিষয়ক বিতর্ক সাম্প্রতিকালে ক্ষুদ্ররাষ্ট্র সমূহের উপর গবেষণাকারী পণ্ডিতদের একটি স্পষ্টতর সংজ্ঞা এবং ক্ষুদ্রশক্তি মর্যাদার পরিমাপক বের করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।[৪] প্রথমে বস্তুগত এবং মানগত মাত্রাগুলো যেমন সমষ্টিগত উপাদান সমূহ (আয়তন, জনসংখ্যা, জিএনপি, সামরিক বাজেট ইত্যাদি) নির্দিষ্ট কুশিলবদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পারস্পরিক ক্রিয়ার পরিমান। নেতাদের এবং সাধারণ জনগণের আত্মোপলদ্ধি রাষ্ট্রের বাইরের কুশিলবদের উপলদ্ধ জ্ঞান এসবের দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্রাগত তারতম্য বা র‍্যাংক নির্ধারণের ক্রমবর্ধমান পরিমার্জন হচ্ছে।[৫] আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর বিশেষ বিশেষ আচরণগত বৈশিষ্ট্যাবলির ভিত্তিতে রাষ্ট্রগুলোর শ্রেণীনির্ধারণ করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যেমন (East) যুক্তি দেখিয়েছেন ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোর বৈদেশিক নীতিমালার আচরণ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো থেকে পৃথক হয়। ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের আচরণ খুব দ্বন্দ্বমূলক হয়। অবাচনিক কার্যক্রম, ঝুঁকি নেবার মাত্রাতিরিক্ত

প্রবণতা এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চমাত্রার অঙ্গীকার পালনের অনিয়মিততা-ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আচরণের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়। এই আচারণ আবার বহুপাক্ষিক কুটনীতি এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজধানীতে অবস্থানরত কুটনীতিকদের সংখ্যা এবং তাদের শ্রেণীনিরূপিত আন্তর্জাতিক মর্যাদার শ্রেণীবিন্যাসকে বৃহৎ (International Stutus orderninng) ও ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্য সিঙ্গার পরামর্শ দিয়েছেন।[৬]

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সংজ্ঞা : ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর সংজ্ঞা তার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ গবেষণার জন্য গৃহীত বিষয়ের বিভিন্ন উদ্দেশ্যের সাথে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিন্যাসকরণে জন্য মানদণ্ড ও ভিন্নতর হয়ে থাকে। কিছু পণ্ডিত (গালতুংগ ১৯৯৬; কব এবং এলডার ১৯৭০) সরকার কাঠামো, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অথবা জনগণের কার্যকরী ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি অপেক্ষা সমষ্টিগত উপাদানগুলো দ্বারা তৈরি র‍্যাংক অর্ডারকে আন্তঃরাষ্ট্র মিথস্ক্রিয়ার পরিমাণ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যায় বেশি উপযোগী মনে করেন। অন্যদিকে যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন গবেষণায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর আচরণের পরস্পর-বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়, তাই রাষ্ট্র সমূহের আচরণগত বর্ণনা আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।[৭] অর্থনৈতিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক সক্ষমতাকে বাদ দিয়ে সিঙ্গার এবং স্পল আন্তর্জাতিক মর্যাদার শ্রেণীবিন্যাস (International Stutus orderninng) কেবল একটি মাত্র নির্ণায়ক নির্ধারণ করেছেন। বিশ্লেষণ ক্ষমতা লাভের জন্য এটি খুবই সরলীকৃত পন্থা মনে হয়। যেহেতু আমাদের আলোচনার মূল বিষয় নিরাপত্তা, কাজেই সাধারণ জ্ঞান থেকেই বুঝা যায় যে, প্রতিরক্ষা ও সমর সক্ষমতাকেই রাষ্ট্রগুলোর র‍্যাংকিং এর ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কারণ সনাতনভাবে কূটনৈতিক জগতে ‘ক্ষুদ্রশক্তি’ ও ‘বৃহৎ শক্তিকে’ যেভাবে চিহ্নিত করা হয় সমর সক্ষমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শ্রেণীকরণ তার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ক্ষুদ্রশক্তি ও বৃহৎশক্তির মধ্যে পৃথকীকরণের সূত্রপাত হয়েছিল সর্বপ্রথম সামরিক প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে। এই পার্থক্য প্রথম করা হয় ‘নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে’র পর ভিয়েনা কংগ্রেসে। ১৮১৪ সালে সম্পাদিত chaumont চুক্তি অনুযায়ী পুনরায় ফরাসি আক্রমণের আশঙ্কায় বিভিন্ন জাতির প্রত্যেকের উপর পরবর্তী ২০ বছর, ৬০ হাজার সৈন্য রাখার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছিল। যে সমস্ত রাষ্ট্র এ বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছিল সেগুলো ‘বৃহৎ শক্তি’ এবং বাকিরা ‘ক্ষুদ্রশক্তি’ হিসেবে চিহ্নিত হয়।[৮] কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রগুলোর সমর-সক্ষমতা নিরূপণ

করতে, একটা রাষ্ট্রের যুদ্ধ করার সক্ষমতা, সে রাষ্ট্রের অন্তঃস্থিত সমর সক্ষমতা এবং সে রাষ্ট্রের তাৎক্ষনিক যুদ্ধপ্রস্তুতি কেমন তাও দেখতে হবে। অন্তঃস্থিত সময় সক্ষমতা ও তাৎক্ষণিক যুদ্ধপ্রস্তুতি উভয়ই সাধারণত পরিমানগত পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়। এটা বলা হয় যে কোন রাষ্ট্রের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) তার অন্তঃস্থিত সমর সক্ষমতাকে নির্দেশ করে। মাস প্রোডাকশন ছাড়া কোন জাতির মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) উচ্চমাত্রায় হতে পারে না। আবার শিল্প ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব ছাড়া মাস প্রোডাক্টশন সম্ভব নয়। অন্যদিকে শিল্প ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব কোন দেশের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের ক্ষমতাকে বজায় রাখে। এর দ্বারা আবার উঁচু মাত্রার দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তির উপস্থিতিকেও বুঝায়, উঁচু মাত্রার জি.এন.পি (GNP) আবার একটা বৃহৎ দেশীয় বাজার, অর্থাৎ একটা সস্পষ্ট বৃহৎ জনগোষ্ঠী এবং আয়তন নির্দেশ করে। এভাবে জি.এন.পি (GNP) সে সমস্ত উপাদানকে অন্তঃর্ভুক্ত করে সেগুলো একটা রাষ্ট্রের অন্ত:স্থিত সামরিক শক্তিগঠন করে। কোন রাষ্ট্রের সময় ক্ষমতা বুঝার জন্য বাৎসরিক সামরিক বাজেটই সম্ভবত সবচেয়ে সেরা নির্দেশক। এভাবে জি.এন.পি (GNP) এবং সামরিক বাজেট এ দু'টি সংখ্যাগত নির্ণয়কের ভিত্তিতে প্রতিটি জাতির সমর-সক্ষমতার সামগ্রিক শক্তিসূচক (স্পোর) গঠন করা যেতে পারে। যেহেতু জিএনপি (GNP) একটা জাতির মৌলিক, দীর্ঘস্থায়ী সামরিক ক্ষমতা নির্দেশ করে, সে কারণে এখানে 'জি.এন.পি'র সর্বোচ্চ মান ধরা হয়েছে ১০০ পয়েন্ট। আর যেহেতু সামরিক ব্যয় একটা জাতির স্বল্পমেয়াদী চলতি প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির প্রতিফলন ঘটায়, সেজন্য সামরিক ব্যয়ের সর্বোচ্চ মান ৫০ পয়েন্ট স্থির করা হয়েছে। ১নং সারণিতে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে স্কোর ব্যবহারের মাধ্যমে সামরিক ক্ষমতার ভিত্তিতে তাদের র‍্যাংক অর্ডার দেখানো হয়েছে। ১নং সারণি থেকে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমর সক্ষমতার দিক থেকে ব্যাপক বৈসাদৃশ্যমূলক চিত্রই ফুটে উঠে। সেক্ষেত্রে মহাশক্তিধর দুটো রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট স্কোর হল যথাক্রমে ১৫০.০০ ও ৯২.৭১ পয়েন্ট, সেক্ষেত্রে ৯১টি দেশের প্রতি মোট স্কোর ১ পয়েন্টের ও কম (এর মধ্যে ৮৮টি আবার তৃতীয় বিশ্বভুক্ত দেশ)। এই ৯১টি দেশের যৌথ স্কোর হল মাত্র ১৯.২৫ পয়েন্ট। ১ এর বেশি কিন্তু ২ এর কম স্কোর সম্পন্ন দেশের সংখ্যা ১৩টি। ২-এর বেশি কিন্তু ৫ এর কম স্কোর সম্পন্ন দেশের সংখ্যা ১৯টি। ১৩টি দেশের প্রত্যেকের স্কোর ৫ পয়েন্টের উপর কিন্তু ১৪ পয়েন্টের নিচে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া আরও দেশ আছে যাদের প্রত্যেকের স্কোর ৯১টি

দেশের যৌথ স্কোরের অর্থাৎ ১৯.২৫ পয়েন্টের চেয়ে বেশি। অবশ্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে কতটা ক্ষুদ্র, সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেয়া মুশকিল। তথাপি যে-দেশগুলোর প্রত্যেকের স্কোর ১ পয়েন্টেরও কম সে দেশগুলোকে ক্ষুদ্ররাষ্ট্র বলা অযৌক্তিক হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের স্কোর এবং বাকি রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যেকের স্কোরের ব্যবধান এতই ব্যাপক যে, প্রথম দুটোকে অনায়াসেই পরাশক্তির ক্যাটাগরিভুক্ত করা যায়। অনুরূপভাবে, যে পাঁচটি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটির স্কোর ৯১টি ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের যৌথস্কোরে চেয়ে বেশি সেগুলোকে মহাশক্তি বলা যেতে পারে। যেসব রাষ্ট্রের প্রত্যেকের স্কোর ১ থকে ১৪ পয়েন্টের মধ্যে সেগুলোকে অবশ্যই বিভিন্ন শ্রেণির বৃহৎশক্তি বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। এইসব পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর শতকরা ৬৪ ভাগ দেশেরই প্রত্যেকের স্কোর ১ পয়েন্টের চেয়ে কম।

১নং সারণি

পরিমাণগত সময় সক্ষমতা অনুযায়ী ৫ টি রাষ্ট্রের র‍্যাংক অর্ডার মর্যাদাক্রম :

দেশের নাম	১৯৭৭ সালের মুদ্রামান হিসেবে GNP মিলিয়ন ডলার	GNPএর জন্য স্কোর	১৯৭৮ সালের মুদ্রামানের হিসেবে সামরিক বাজেট	সামরিক বাজেটের জন্য স্কোর	মোট স্কোর	র‍্যাংক বা মর্যাদা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১,৮৯৬,৫৫০	১০০.০০	১০৮,৫৩৭	৫০.০০	১৫০.০০	১
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৮,৬১,২১০	৪৫.৪০	১০২,৭০০	৪৭.৩০০	৯২.৭১	২
জাপান	৭৩৭,১৮০	৩৮.৮৭	৮,২৩২	৩,৭৯	৪২.৬৬	৩
জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র	৫২৯,৩৮০	২৭.৯০	২০,৫৬১	৯.৪৭	৩৭.৩৭	৪
গণপ্রজাতন্ত্রী চীন	৩৭২,৮০০	১৯.৭০	৩৭,১০০	১৭.০০	৩৬.৭০	৫

সূত্রঃ 1979 Wrold Bank Atlas: Population, Percaptia, Production and Growth Rates, pp-12-21।

২নং সারণি

প্রথাগত সমর-সক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহের অঞ্চলভিত্তিক র‍্যাংক অর্ডার বা মর্যাদাক্রমঃ

অঞ্চল	দেশ	মোট স্কোর	র‍্যাংক মর্যাদা
দক্ষিণ এশিয়া	ভারত	৬.	১
	পাকিস্তান	১.২২	২
	বাংলাদেশ	০.৪০	৩
মধ্যপ্রাচ্য	ইরান	৭.৩৩	১
	সৌদি আরব	৭.১২	২
	মিশর	৩.০৯	৩
	ইসরায়েল	২.১৪	৪
দূরপ্রাচ্য	ইন্দোনেশিয়া	৩৬.৭০	৩
আফ্রিকা	নাইজেরিয়া	৩.২৪	১
	দক্ষিণ আফ্রিকা	২.৯০	২
	লিবিয়া	১.৬৪	৩
দক্ষিণ আমেরিকা	ব্রাজিল	৯.৫৫	১

তদুপরি, ক্ষুদ্র শব্দটি আপেক্ষিক শব্দ। উদাহরণ হিসেবে, যে সমস্ত রাষ্ট্রের স্কোর ৩ থেকে ৫ পয়েন্টের মধ্যে, বিশ্ব অঙ্গনে সেগুলোর স্থান ২১ থেকে ২৯ এর মধ্যে। তবে এমন রাষ্ট্র ক্ষুদ্ররাষ্ট্রে পরিণত হবে যদি তা কোন বৃহত্তর রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। অতএব, ১ এবং ২ নং সারণিদ্বয় রাষ্ট্রগুলোর ক্ষুদ্রতার তুলনার ক্ষেত্রে অঞ্চলগত দিকের উপর আলোকপাত করছে। ১ নং সারণিতে দেখা যায় যে, নেদারল্যান্ড, পোল্যান্ড, স্পেন, জার্মানি, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক বেলজিয়াম, সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডকে বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্টভাবে বৃহৎশক্তি বলে মনে করা হয়। তবে দ্বিতীয় সারণি অনুসারে, ইউরোপীয় আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফেডারল রিপাবলিক অব জার্মানি, ব্রিটেন এবং ইতালির তুলনায় এ রাষ্ট্রগুলো ক্ষুদ্র বলেই দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে ভারত একটি যথেষ্ট শক্তিশালী রাষ্ট্র। ভারত পাকিস্তানের চেয়ে প্রায় পাঁচগুণ শক্তিশালী এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় ভারতের সমর সক্ষমতা অনেক বেশি। একইভাবে বিশ্ব অঙ্গনে ও আঞ্চলিকভাবে পৃথিবীর আরো কিছু দেশের আপেক্ষিক অবস্থার তুলনা থেকে দেখা যায় যে, ইরান, সৌদি আরব, মিশর, ইসরায়েল, নাইজেরিয়া,

দক্ষিণ আফ্রিকা, লিবিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইন্দোনেশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যদিও পরাশক্তিদ্বয় ও বৃহৎশক্তিগুলোর তুলনায় ক্ষুদ্রশক্তি, কিন্তু স্ব-স্ব অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় এগুলো বৃহৎ শক্তি। ক্ষুদ্র শব্দটি আপেক্ষিক শব্দ। মূলত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হলো সেই রাষ্ট্র যার প্রথাগত সমর ক্ষমতা কেবল চূড়ান্ত বিশ্ব অঙ্গনের তুলনাই নয় বরং তার স্ব অঞ্চলের বৃহৎ শক্তির তুলনায়ও কম। যেমন-ইউরোপ প্রেক্ষাপটে নেদারল্যান্ড, পোল্যান্ড এবং স্পেনের তুলনায় ভারতের সমর ক্ষমতা অনেক কম। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে ভারত একটি যথেষ্ট বৃহৎ শক্তি।[৯] সিঙ্গার ও স্মল (David J. Singer and M. Small) গড় জাতীয় উৎপাদন (GNP) এবং সামরিক সামর্থ্যকে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করেন। ১৯৭৭ সালের জি এন পি ও ১৯৭৮ সালের সামরিক বাজেটের ভিত্তিতে এই সংজ্ঞার আলোকে তালুকদার মনিরুজ্জামান ১৪১টি দেশের অবস্থান নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে ১০৮টি দেশ তৃতীয় বিশ্বের অর্ন্তভূক্ত এবং তৃতীয় এই দেশগুলোর মধ্যে ৯৫টি দেশ ক্ষুদ্ররাষ্টভুক্ত। সারণী-১ এবং সারণি ২ এর মাধ্যমে অল্প কয়েকটির আলোচনা করা হয়েছে।[১০]

পরিশেষে বলা যায় যে, বিভিন্ন কারণ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নির্ণায়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এগুলোর মধ্যে সামরিক সক্ষমতা, জিএনপি, আঞ্চলিক প্রভাব, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সুশাসন অন্যতম। অন্যদিকে স্নায়ু যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সামরিকশক্তির প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং অর্থনীতি ও সুশাসন বৃহঃশক্তির নির্ণয়কের মাপকাঠি হিসেবে দেখা দেয়। সুতরাং, বৃহঃশক্তি ও ক্ষুদ্রশক্তি নির্ণায়কের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি ভূমিকা পালন করলেও তা একমাত্র সহায়ক শক্তি নয়। বিশ্লেষকদের মতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলতে বুঝায়, যে সমস্ত দেশগুলো আয়তনে কম, দক্ষ জনশক্তির অভাব, অর্থনীতিতে অনুন্নত, সম্পদের অপর্যাপ্ততা, সামরিক ক্ষেত্রে দুর্বল এবং কারিগরী ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারা শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে না।[১১] Rothstein এর মতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হচ্ছে সেইসব রাষ্ট্র যারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ও পুরোপুরি নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে না এবং অন্য রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।[১২] যদিও অনেক সময় তৃতীয় বিশ্বের সকল দেশকেই যুক্তরাষ্ট্রভূক্ত মনে করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে ক্ষুদ্ররাষ্ট্র বিবেচনা করলে, পৃথিবীর ৭০% রাষ্ট্রই ক্ষুদ্ররাষ্টের অন্তর্ভূক্ত।[১৩] ক্ষুদ্ররাষ্ট্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনেক বিশ্লেষক ভিন্ন মত

পোষণ করেছেন, একটি রাষ্ট্রের আয়তন, জনসংখ্যা, জি.এন.পি (গড় জাতীয় উৎপাদন) এবং সামরিক শক্তি বিচারে দুর্বল দেশকে ক্ষুদ্র দেশ বলা হয়। আবার বিশ্ব রাজনীতিতে অল্প প্রভাব বিস্তারকারী দেশও ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যায় এ দু'ধরনের দেশই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত।[১৪] বেশির ভাগ গবেষক ও বিশ্লেষক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এই দু'ভাগে রাষ্ট্রগুলোকে ভাগ করেন। এসব সংজ্ঞার ভিত্তিতে পৃথিবীর ১৫০টি রাষ্ট্র ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। আর বড় রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৫ থেকে ১০টি।[১৫] অবশ্য কেউ কেউ তাই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী মধ্যম প্রকৃতির রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেন। প্রকৃত পক্ষে কোন সংজ্ঞা দিয়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে সঙ্গায়িত করা সম্ভব নয়। কেউ কেউ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন। কার্ল ডব্লিউ ভয়েচ এর মতে, ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ও গড় জাতীয় উৎপাদনের ক্ষমতা কম এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারও নিম্ন পর্যায়ের।[১৬] এ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন শাহিন আখতার। তার মতে, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বেশিরভাগ রাষ্ট্রই উন্নয়নশীল, দারিদ্র্য, সম্পদের অভাব, অভ্যন্তরীণ সম্পদের ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা, রপ্তানি বাণিজ্যে হাতে গোনা পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা এবং ঋণেরভারে ভারক্রান্ত থাকে।[১৭] ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হলো-যেহেতু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেহেতু পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। অটো ভন বিসমার্ক এর মতে, "অভ্যন্তরীণনীতির সম্প্রসারণই পররাষ্ট্রনীতি","Extension of Domestic Policy is foreign policy"।[১৮] তবে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মাইকেল হ্যান্ডেল এর সংজ্ঞা স্পষ্ট এবং গ্রহনযোগ্য; তিনি বলেছেন, "Which are smaller in area and poputation and have a long low ranking international power hiererchy (lower level of economic development limited resources, weak military capability and inadequate technological know how), resulting in little or no influence on its balance of power in international system".[১৯]

ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা : উন্নত রাষ্ট্রগুলোর ন্যায় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বৈদেশিকনীতি এবং কূটনীতি এ দুটো অস্ত্র রয়েছে। ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলোর বৈদেশিকনীতির মূল বিষয় আক্রমণ নয় বরং প্রতিরক্ষা, ক্ষমতার প্রকাশ নয় বরং যে ক্ষুদ্র ক্ষমতা আছে সেটা সংরক্ষণই একটা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের লক্ষ্য। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর প্রথম সমস্যা হচ্ছে এইসব দেশগুলো সবসময় ভাবে কিভাবে দ্বন্দ্ব বিরোধ এড়ানো যায়, মীমাংসা করা যায় বা স্থগিত রাখা যায়। আর দ্বিতীয় সমস্যা হলো একবার দ্বন্দ্বরোধে জড়িয়ে পড়লে তখন কিভাবে তা প্রতিহত করা যায়। এ সমস্যা দুটো বৈদেশিকনীতির দুটো অস্ত্র যথা কূটনীতি ও সামরিক কৌশলের সঙ্গে সম্পর্কিত। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সাথে নিরাপত্তা প্রত্যয়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তা দ্বারা আমরা যেকোন জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগলিক অখণ্ডভাবে ন্যূনতম মৌলিক মূল্যবোধগুলোর প্রতিরক্ষা ও সংরক্ষণ করাকে বুঝে থাকি।[২০] তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো কারিগরী, অর্থনীতি, আর্থ-সামাজিক, সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা দুর্বল হওয়ায় অন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে, যা পরবর্তীতে তাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন হয়ে দাড়ায়।[২১] তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন দিক থেকে জাতীয় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। দারিদ্রতা, বেকারত্ব এবং সামরিক দিক থেকে এসব দেশ দুর্বল হওয়ায় বৃহৎ শক্তিবর্গের (aggressions) গ্রাসে পরিণত হয়। অনেক সময় বৃহৎ শক্তিবর্গের ইন্ধন নিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিবেশি বড় দেশগুলো জাতীয় স্বার্থে ক্ষুদ্র দেশের সাথে (Cash) মত-বিরোধ তৈরি করে। যেমনটি আমরা ভারতকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই বৃহৎ আয়তন, বিশাল জনসংখ্যা, পর্যাপ্ত সেনাবাহিনী, স্বনির্ভর অর্থনীতি এবং কারিগরী দক্ষতায় আঞ্চলিক আধিপত্য অর্জন করেছে।[২২]

ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য : ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কিছু অভিন্ন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হলো- যেহেতু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেহেতু পরাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। তাই এখানেও অটো ভন বিসমার্ক এর সঙ্গার উদাহরণ টানতে হয়। অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই পররাষ্ট্রনীতি।[২৩]

০১। **ভৌগোলিক অবস্থান :** পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী প্রতিবেশী পরিবেষ্টিত থাকে যার ফলে পরাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে সর্তক থাকতে হয়।

০২। **প্রাকৃতিক সম্পদ :** এসব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ কম থাকে অথবা সম্পদের সঠিক ব্যবহারে অদক্ষ থাকে। ফলে বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

০৩। **জনবল :** জনবল কম অথবা বেশি উভয়ক্ষেত্রে অদক্ষ জনসংখ্যার হার বেশি থাকে।

০৪। **প্রশাসনিক দক্ষতা :** এসব দেশে প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে না, ফলে প্রায়ই এসব দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে বৃহৎ শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে।[২৪]

বাংলাদেশ, ভূটান এবং মালদ্বীপে এই সবগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নিজেদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে এবং অর্থনৈতিক সাম্যবস্থার জন্য আরো কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলো আলোচনা করা হলো-

জোট নিরপেক্ষনীতি অনুসরণ : ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষতারনীতি অনুসরণ করে। বৃহৎ শক্তির প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য ক্ষুদ্র রাষ্টগুলো এই নীতি অনুসরণ করে। তবে এই নিরপেক্ষতার অর্থ আন্তর্জাতিক বিষয় থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখা নয়, বৃহৎশক্তি জোটের বাইরে থেকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা।[২৫]

বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর : বেশির ভাগ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেই অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত এবং জিএনপির হার কম, যার ফলে এসব দেশ বৈদেশিক সাহায্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। এই সুযোগে দাতা দেশগুলো সাহায্যের বিনিময়ে গ্রহীতা দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। যা দেশটির সার্বিক উন্নয়নের পথে বহু সংকট তৈরি করে।[২৬]

বৃহৎ দেশের সঙ্গে মৈত্রী : ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বৃহৎ শক্তিবর্গেও সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে সু-সম্পর্কের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে।[২৭]

আঞ্চলিক সহায়তা সংস্থা গঠন : ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তার স্বার্থে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে পারস্পারিক মৈত্রী জোট গঠন করে। দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে সার্ক বা ১৯৭১ সালের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি।[২৮]

আলোচিত বৈশিষ্ট্য সমূহ এ তিনটি দেশের ক্ষেত্রে পুরোপুরি কার্যকর। সুতরাং, এ তিনটি দেশের এইসব দিক বিবেচনায় রেখে কৌশলী পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করা উচিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কৌশল সম্পর্কে কার্লভন (clauscwitz) ক্লাসিউইচ বলেন, "Strategy usually means the art of employing the whole gamut of national power for the purpose, of attaining the objectives of a country's foreign poliey."[২৯]

ক্ষুদ্র রাষ্ট হিসেবে বাংলাদেশ-ভূটান-মালদ্বীপ দেশসমূহের সম্পর্ক নির্ধারকসমূহ : আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয় সমূহের মধ্যে সঠিক নির্ধারক নির্ণয় করে সম্পর্ক তৈরি হলে তা অনেক জোরদার হয়। সম্পর্ক তৈরির নির্ধারক নির্ণয় নিয়ে বিভিন্ন মতাদর্শ বিদ্যমান, তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্ধারকসমূহ বেশ গুরুত্ব বহন করে। পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষক Rosenau মনে করেন, পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হচ্ছে ভূগোল, ঐতিহ্য ও ইতিহাস, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামরিক কাঠামো, জনগণের মানসিকতা, রাজনৈতিক গ্রহণ যোগ্যতা, সরকার কাঠামো, নেতৃবৃন্দের অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্ব।[৩০] তবে ক্রিস্টোফার ক্ল্যাফাম এর মতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে বিভিন্ন বিষয় কাজ করে। সেগুলি হলো- ক্ষুদ্র আয়তন, শক্তির সীমাবদ্ধতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা।[৩১] পি. কে মিশ্র পররাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন বিষয়কে আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্ধারক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে উপনিবেশিক অভিজ্ঞতা, ধর্ম, ভাষা, অধিবাসী সমস্যা, জাতীয় স্বার্থ, ইত্যাদি নির্ধারক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৩২] এসব মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-ভূটান-মালদ্বীপ সম্পর্কের যে সকল নির্ধারক নির্ণয় করা যায় সেগুলি মোটামুটি ত্রি-মাত্রিক (বাংলাদেশ-ভূটান, বাংলাদেশ-মালদ্বীপ ও ভূটান-মালদ্বীপ)। তিনটি দেশের নির্ধারকসমূহ হলো ভূ-রাজনৈতিক, ভারত কেন্দ্রীক সমস্যা, পররাষ্ট্রনীতির অভিন্নতা ও পরিপূরক অর্থনীতি।

ভূ-রাজনৈতিক : যে কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বের উপর আর্ন্তজাতিক তাৎপর্য নির্ভর করে। ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে এ তিনটি দেশের সুসম্পর্ক প্রয়োজন। বাংলাদেশের দক্ষিণ দিক ব্যতীত তিনদিকে ভারতের অবস্থান। ভূটানের ক্ষেত্রেও তাই, মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ রাষ্ট্র যার ফলে এ তিনটি দেশই ভূ-রাজনৈতিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ রাষ্ট্র ভারতমুখী। এর ফলে নিজস্ব মতামত কার্যকর করার পূর্বে এ বিষয়টি মাথায় রেখে পদক্ষেপ নিতে হয়।[৩৩]

অর্থনৈতিক : আলোচিত তিনটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যমূলক শাসনের কারণে বাংলাদেশ, ভূটানের উপর ভারতের কর্তৃত্ব, মালদ্বীপের উপর শ্রীলঙ্কার কর্তৃত্ব, এসব দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল অর্থনীতিতে পরিণত করেছে। তাই এ তিনটি দেশ ট্রানজিট, পর্যটন, বিদ্যুৎ ও বাণিজ্যির মাধ্যমে নিজেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে।[৩৪]

ভারত এবং ভারত মহাসাগর কেন্দ্রিক নিরাপত্তা সমস্যা : বাংলাদেশ এবং ভূটানের ক্ষেত্রে ভারত সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা হয় এবং ভারত মহাসাগরের সামুদ্রিক রুট শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে বিবিধ সমস্যা তৈরি করে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে বিদ্যমান। ভারত এমন একটি দেশ যার সাথে বাংলাদেশ, পাকিস্তান , ভূটান, শ্রীলঙ্কার সাথে নৌপথে যোগাযোগ রয়েছে। ভূটানের সাথে ভারত ছাড়া কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় ভূটান ভারত দ্বারা কার্যত অবরুদ্ধ, যার ফলে ভূটানের অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতিতে ভারতের ওপর নির্ভরশীল। ক্ষুদ্র রাষ্ট্র মালদ্বীপের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এবং শ্রীলঙ্কার সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে ভারত। দক্ষিণ-পূর্ব বার্মার মাত্র কয়েক মাইল সীমান্ত ছাড়া পশ্চিমে, উত্তর এবং পূর্বদিক থেকে বাংলাদেশ ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। পাকিস্তানের সঙ্গেও ভারতের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের সাথে ভারতের প্রায়ই সীমান্ত সমস্যা দেখা দেয়। তাছাড়া গঙ্গা নদীর জল প্রবাহের ভাগাভাগি, সমুদ্রের জলসীমা নির্ধারণ, সার্ক এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক অসমতা এবং এসব ক্ষেত্রে ভারতের

অভিভাবক সুলভ মনোভাব বিদ্যমান।[৩৫] ১৯৭৪ সালে পারমানবিক শক্তি অর্জন এবং পরের বছর সিকিমে আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ভূটান ও মালদ্বীপের ওপর ভারতের একচ্ছত্র প্রভাবের ফলে এ দুটি দেশ ভারত কর্তৃক মুক্ত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে। ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা বলে ঘোষণা করলেও এ বিষয়কে কেন্দ্র করে ভূটানের সাথে ভারতের সংঘাত হয়। এছাড়া তিব্বতীয় ভূটানিজ ও নেপালি ভূটানিজ দ্বন্দ্বে ভারত সরাসরি হস্তক্ষেপ করে।[৩৬]

পররাষ্ট্রনীতির অভিন্নতা : আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উভয়ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, ভূটান ও মালদ্বীপ অধিকাংশ বিষয়ে অভিন্ন মনোভাব পোষণ করে। তিনটি দেশই জাতিসংঘ ও সার্ক (SAARC) এর সনদের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৩৭] প্রত্যেকেই জাতিসংঘ ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এর সদস্য।[৩৮] বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপ উভয় দেশই সাবেক বৃটিশ উপনিবেশ ছিল এবং মুসলিম দেশ। ফলে মুসলিম বিশ্বের সাথে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।[৩৯] তিনটি দেশই দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক অধিবেশন এ দেশগুলি কাছাকাছি মতামত ব্যক্ত করে।[৪০]

পরিপূরক অর্থনীতি : এ তিনটি দেশের অর্থনৈতিক খাতগুলি একে অপরের পরিপূরক। যেমন- মালদ্বীপ ক্ষুদ্র জনসংখ্যার দেশ, ফলে তার দক্ষ জনবল প্রয়োজন যা বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের যৌথ প্রয়োজনায় দু'দেশের পর্যটন শিল্পকে সমৃদ্ধ করবে।[৪১] ভূটানে বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিদ্যৎ সমস্যা দূরীকরণ সম্ভব।[৪২] আমদানি নির্ভর মালদ্বীপে খাদ্য শষ্য রপ্তানি করে মালদ্বীপের খাদ্য ঘাটতি পূরণে সহায়তা প্রদান সম্ভব। এ তিনটি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ঘাটতি এবং ভারতের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে অনেকাংশে স্বনির্ভশীলতা অর্জন করা সম্ভব।[৪৩]

ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ

উন্নতরাষ্ট্রগুলোর ন্যায় ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বৈদেশিকনীতি ও কূটনীতি এ দুটোনীতি রয়েছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর বৈদেশিক নীতির মূলনীতিগুলো হলোঃ

(১) আক্রমণ নয় বরং নিজেকে প্রতিরক্ষা করা।

(২) ক্ষমতার প্রকাশ নয়, বরং নিজেকে রক্ষা করা।

(৩) দ্বন্দ্ব-বিরোধ এড়িয়ে চলা।

(৪) সকলের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

(৫) বন্ধুত্বপূর্ণ সহ-অবস্থান করা।

(৬) কারো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। যা জাতিপুঞ্জের সনদের ২(৭) ধারায় [Article 2(7)] বর্ণিত রয়েছে।

(৭) অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, ভৌগলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, যা জাতিপুঞ্জের সনদের ২(৪) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(৮) ছোট ছোট আঞ্চলিক জোট গঠন করা।

(৯) জাতিসংঘের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা।[৪৪]

এগুলো সত্ত্বেও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো কিছু সমস্যায় সম্মুখীন হয়। প্রথম সমস্যা হচ্ছে দ্বন্দ্ব বিরোধ এড়িয়ে চলা। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে একবার দ্বন্দ্ব বিরোধে জড়িয়ে পড়লে কিভাবে সেই বিরোধকে (বৃহৎ শক্তি কে) সমাধান করবে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা । এ সমস্যা দুটো বৈদেশিকনীতির দুটো অস্ত্র যথা কূটনীতি ও সামরিক কৌশলের সঙ্গে সম্পর্কিত।[৪৫] ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো যেহেতু পর্যাপ্ত সমর সক্ষমতার অভাব আছে, তাই তাদেরকে এ ঘাটতি পূরণ করতে হয় কূটনৈতিক উৎকর্ষের দ্বারা। কূটনৈতিক দক্ষতার উৎকর্ষের সাথে সাথে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মান উঠা-নামা বা মূল্যায়িত হয়। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উচ্চমান সম্পন্ন কূটনীতি একটা স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হওয়া অপরিহার্য। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো তাদের সীমিত সংখ্যক কূটনীতিককে এমনভাবে নিয়োজিত করতে পারে যেন তার অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ রাজধানীগুলোতে সর্বাধিক কূটনৈতিক তৎপরতা রাখা যায়।[৪৬]

পররাষ্ট্রনীতি বলতে কি বুঝায় তা জানার জন্য আমাদেরকে 'পররাষ্ট্র' ও 'নীতি' এই দুটি শব্দের অর্থ জানতে হবে। নীতি বলতে সাধারণত আমরা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রণীত কার্যাবলীকে বোঝায়। কোন রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নীতিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) অভ্যন্তরীণ নীতি ও

(২) পররাষ্ট্রনীতি।[৪৭]

অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড লিঙ্কন ও অলভি বলেছেন, "যদি জাতীয়নীতির আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার আবহাওয়া অর্জনের ইচ্ছা থাকে তবে পররাষ্ট্রনীতি ও অভ্যন্তরীণ নীতিকে অবশ্যই একে অপরের সহায়ক হতে হবে" "Foreign and Domestic Policy must be mutually supporting it national policy aspirations are to be achieved in a atmosphere of political stability"।[৪৮] পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাদেরকে নীতি নির্ধারণের সময় অবশ্যই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা, জনগণের চাহিদা ইত্যাদি বুঝার চেষ্টা করতে হবে।[৪৯] জনগণের সেই মনোভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যা জাতীয় রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক নর্থ এজ (F.S., Northedge) বলেছেন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন অভ্যন্তরীণ দিককে চিত্রিত করে, সরকারের বিভিন্ন উপাদান ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত অনেকগুলি আপোষ ও সমন্বয় সাধন করে"। "The formation of foreign policy represents on its domestic side, a continuous series of compromises and adjustments between the different elements of governments and social structure"।[৫০] পররাষ্ট্রনীতি হল কোন রাষ্ট্রের জাতীয় নীতির সেই অংশ যা বহিঃবিশ্বের সাথে সংযুক্ত। এক্ষেত্রে বারবার এসে যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কূটনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ বিসমার্ক এর পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক সংজ্ঞা "অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারতাই হল পররাষ্ট্রনীতি"। পররাষ্ট্রনীতি হল কোন রাষ্ট্রের সেসব কার্যাবলির ধারা যা সেদেশ তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তার সীমারেখার বাইরে অবস্থিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সম্পাদন করে থাকে। মূলত জাতীয় স্বার্থ রক্ষাই পররাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য। জাতীয় স্বার্থ হল এমন একটি ধারণা যা সমস্ত জাতি, পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিজের সুবিধায় কাজে লাগানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। জাতীয় স্বার্থ দু'ধরনের হতে পারে (১) মুখ্য স্বার্থ (২) গৌণ স্বার্থ। কোন রাষ্ট্রের মুখ্য স্বার্থগুলো চিরস্থায়ী এবং

সেগুলো যে কোন মূল্যে সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।[৫১] প্রত্যেকটি দেশের সরকারের একটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্য গঠিত হয় । বহির্বিশ্বে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রসত্তার প্রকাশ ও ভাবমূর্তি, তার মূল ভিত্তিপ্রস্তর হলো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি। একটি পরিকল্পিত কাঠামোর মধ্য দিয়ে দেশের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করা হয়। এ নীতির আলোকে পরিচালিত সকল কূটনৈতিক কার্যক্রম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বহির্বিশ্বে অবস্থিত কূটনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (দূতাবাস/মিশন) ওপর ন্যস্ত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবিধ কূটনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ এবং এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল নিয়ামত শক্তিকে প্রভাবিত করে থাকে। এই সব কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে বৈদেশিক পরিমণ্ডলে। প্রত্যেকটি দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নয়ন, আঞ্চলিক সহযোগিতা নিবিড়করণ এবং সর্বোপরি, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বসভায় একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে নিজ দেশের ভাবমূর্তি সংহত ও সুদৃঢ় করে থাকে।[৫২] ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির পর্যালোচনা থেকে এটি বের হয়ে আসে যে বাংলাদেশ, ভূটান ও মালদ্বীপ এ তিনটি দেশই ক্ষুদ্ররাষ্টনীতির পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ তিনটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাংলাদেশের অভ্যুদয়। এর ফলে উপমহাদেশের শক্তিসাম্য ও পরিবর্তিত হয়ে যায়। দক্ষিণ পূর্ব কোণে মায়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত ব্যতীত বাংলাদেশ সামগ্রিক অর্থে ভারত পরিবেষ্টিত (India-locked) একটি রাষ্ট্র। এমনি ভৌগোলিক অবস্থানের বাধ্যবাধকতার জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে India Factor বা ভারত উপাদান গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।[৫৩] জাতীয় স্বার্থেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশের জনৈক কূটনীতিক। তিনি লিখেছেন, “Bangladesh has avital stake the nighbouring countries remain Peacefull, stable and friendly or at least not unfriendly to wards Bangladesh. Bangladesh has a more direct interest in making sure that nostilites between countries and within countries in south Asia do not occur”[৫৪].

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিটি বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, “আমাদের একটি ক্ষুদ্র দেশ বাংলাদেশ। আমরা চাই সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়।” এ উক্তির মধ্যেই আমাদের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য নিহিত।[৫৫] ১৯৭৬ সালের মে দিবসের ভাষণে জিয়াউর রাহমান বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বলেছিলেন, “We are small country an have a lot of economic difficulties. We want to stay in peace and friend ship with all the countries.”।[৫৬] সেই ভাষণে তিনি জাতির উদ্দেশে্য আরও বলেন, “I can assure you that today we are not alone or friendless.I want to tell everyone that we do not want friendship at the expense our independence, sovereignity and integrity.”[৫৭]

উপরের আলোচনা থেকে **বাংলাদেশের** পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি সমূহ বেরিয়ে আসে, সেগুলো হলো-

১। সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়; রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পর বাংলাদেশ চায় না যে, বাংলাদেশ কোন বৃহৎ শক্তির গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হোক।

২। অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ভৌগলিক অখণ্ডতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা এই মূলনীতিটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের ২ (৪) ধারার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩। অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এ মূলনীতিটি ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ২ (৭) ধারার (Article 2 (9)) উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪। বিশ্বশান্তি- ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, "আমি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে দেখতে চাই।" "I would like it (Bangladesh) to become the Switzerland of the East."। বাংলাদেশ কর্তৃক অন্বেষিত শান্তির এই মূলনীতির কয়েকটি তাৎপর্য আছে।

(১) বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণসহ অবস্থানে বিশ্বাস করে।

(২)বাংলাদেশ যে কোন বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসার পক্ষপাতি।

(৩) বাংলাদেশ চায় যে, যে কোন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ উপায়ে হোক। এ ব্যাপারে অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, "Bangladesh desires peace not only for the sake of peace but also for the strategic consideration of national development and security. "।[৫৮]

বাংলাদেশ মূলত একটি মধ্যম (moderate) পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছে, যেখানে বহুজাতিক কূটনীতি এর উপর নির্ভরশীলতা রয়েছে। বিশেষ করে জাতিপুঞ্জের উপর। বাংলাদেশের জন্মলগ্নে ১৯৭১ সালে ২০ এপ্রিল প্রণীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে জাতিসংঘ সনদের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং বিশ্বসম্প্রদায়ভুক্ত একটি জাতি হিসেবে সকল দায়-দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

(১) জাতীয় সমতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা।

(২) শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং নিরস্ত্রীকরণ প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।

(৩) নিজস্ব আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জাতি গঠনে প্রত্যেক জাতির অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান।[৫৯]

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ কমনওয়েল্থ এবং জাতিসংঘ এর সদস্যপদ লাভ করেছে। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগীতা সংস্থা সার্ক এর গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ বাংলাদেশ চেয়েছিল দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য।[৬০] বর্তমানে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর সংখ্যা ২০,০০০, বিমান বাহিনী ৭,০০০ ও নৌবাহিনী ১৪,৯৫০ জন। প্রত্যেক বাহিনী সাধারণ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখা ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও রাজনৈতিক অস্থিরতামূলক অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। থাকে। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ মিলিটারি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ইরাক, ইরান যুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ গ্রহণ করে। এছাড়াও ১৯৯১ সালে পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। এছাড়াও বাংলাদেশ ২০০৭ সালে মে মাসে কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, লাইবেরিয়া, সুদান প্রভৃতি দেশে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। পৃথিবীর ৪৬টি দেশে অবস্থিত ৫৮টি দূতাবাসের মাধ্যমে পররাষ্ট্র বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশি নাগরিক ইসরাইল ব্যতীত পৃথিবীর যে কোন দেশে ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশি পাসপোর্ট ব্যবহার করতে পারে।[৬১]

মালদ্বীপের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ

মালদ্বীপ ইতিহাস থেকেই প্রায় স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধুমাত্র ষোল শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কিছু সময়ের জন্য পর্তুগিজ শাসনের অধীনে ছিল। ১৮৮৭ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত মালদ্বীপ ব্রিটিশ উপনিবেশ এর অধীনে থাকা অবস্থায়ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন ছিল। ১৯৬৫ সালে স্বাধীনতা লাভের পরেই মালদ্বীপ জাতিসংঘে যোগদান করে।[৬২] ১৯৭৮ সাল থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অংশগ্রহণ করে, বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ততা গড়ে তোলে ও ১৯৮২ সালে কমনওয়েল্থ এ যোগদান করে। মালদ্বীপ সার্কের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়াও মালদ্বীপ WTO ও MIGA এর সদস্য মালদ্বীপ পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ (Nuclear Non Prolifenation) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।[৬৩] মালদ্বীপ একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পথে যাত্রা করার ক্ষেত্রে মালদ্বীপ সফলতার সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা যেমন Amnesty International, ICRCO এর সহযোগীতামূলক আচরণ ও মতামত বিনিময় করেছে। এছাড়াও অসংখ্য মানবাধিকার সংস্থা (Human right Instruments) যেমন ICCPR ও ICESCR এর সাথে সম্মত হয়েছে। এই সময়েই মালদ্বীপ কমনওয়েল্থ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশন এর সাথে সম্পর্ক তীব্রতর করেছে।[৬৪] মালদ্বীপের (resident diplomatic) আবাসিক কূটনৈতিক মিশন রয়েছে কলম্বো, দিল্লি, ইসলামাবাদ, ঢাকা, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, নিউইয়র্ক, টোকিও, বেইজিং, রিয়াদ, জেনেভা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এছাড়াও (non resident) অনাবাসিক কুটনৈতিক মিশন রয়েছে অনেক দেশে, যা অন্তর্ভুক্ত করে নেপাল ও ভূটানকে। এ কারণেই মালদ্বীপের পররাষ্ট্র সেবা (foreign service) অনেকটাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমাহার।[৬৫] মালদ্বীপ দেশটি দ্বীপের সমষ্টি হওয়ায় মালদ্বীপের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান দুটি দিক হচ্ছে ভারত মহাসাগরের পরাশক্তির আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মাউমুন আব্দুল গাইয়ুম (Moumoon Abdul Gayoom) আরো কিছু দিক যোগ করেন। তিনি মালদ্বীপের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা ও অন্যান্য দেশের সাথে শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, "The politcy is strictly consistent with the observance of the principles of non alignment and the sovereignty, integrity and unity of other nations, we support all just and legitimate causes through out the would

foremost among which are the cause of the palestimians and the people of southern Africa.” তিনি আরো বলেন যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিবেশী প্রত্যেকটি দেশের সাথে তার দেশ শক্তিশালী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করবে। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কথা ও উল্লেখ করেন।[৬৬] প্রেসিডেন্ট মাউমুন আব্দুল গাইয়ুম (Moumoon Abdul Gayoom) আরো বলেন, “The soviet base would have militated against our non aligned stateus annoyed our brothers in the muslim world like Pakistan and Saudia Arabia and created suspicions in the minds of our neighbours like India and Srilanka” ।[৬৭] ১৯৬৫ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ (প্রটেকটেরিয়ট) থেকে মুক্ত মালদ্বীপ জাতিসংঘে যোগদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যোগ দেয়। মালদ্বীপ আধুনিক বিশ্বের যত বেশি সম্ভব দেশের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করার নীতিতে বিশ্বাসী। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট (Maumoon Abdul Gayoom) মামুন আব্দুল গাইয়ুম পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাথে এবং তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।[৬৮] তাছাড়াও মালদ্বীপ পার্শ্ববর্তীদেশ শ্রীলঙ্কার সাথে বিশেষ সুসম্পর্ক তৈরি করেছে। ইউরোপ থেকে সরাসরি মালদ্বীপের বিমান যোগাযোগ সুবিধা না থাকায়, মালদ্বীপ এক্ষেত্রে ইউরোপীয় টুরিস্টদের জন্য শ্রীলঙ্কা থেকে বাইপাস রাস্তা তৈরি করেছে। এ দুই দেশের সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ.সি.এস. হামিদ বলেন, “Maldives is Srilanka’s nearest, dearest and smallest neighbour”, এর পরিপ্রেক্ষিতে মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফাতুল্লা জামিল বলেন, “Relations between our two countries cannot be any better and Closer and these go back to he time where srilanka had not tasted Maldives fish and the Maldivians had not tasted Srilankan tea”, ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী মালদ্বীপ সফর করেন এবং মুগ্ধ হয়ে বলেন, “I myself has tened my visit in order to maintain the momentum of your visit”, ইন্দিরা গান্ধী এবং মালদ্বীপের প্রধানমন্ত্রী জাকি দু’দেশের মধ্যে তাদের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে আলোচনা করেন। এ সময় দু’দেশের শিক্ষা, মৎস সম্পদ, বিমান এবং সামুদ্রিক যোগাযোগ, বাণিজ্য, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য ট্যারিফ মুক্ত পণ্য বিনিময়ের আলোচনা করা হয়।[৬৯]

উপরের আলোচনা থেকে মালদ্বীপের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি সমূহ বেরিয়ে আসে। সেগুলো হলো-

১. মালদ্বীপ মূলত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর সাথে তাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখার মৌলিক নীতিতে বিশ্বাসী। যেখানে বন্ধুত্ব বোঝাপড়া ও সহযোগীতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. এই বিষয়গুলিই মালদ্বীপের সাধারণ জনগণের প্রত্যাশার সাথে সম্পৃক্ত।

৩. মালদ্বীপের স্বার্থ (Interest) সংক্রান্ত প্রধান বিষয় হল জাতীয় উন্নয়ন।

৪. আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সমর্থন করা, যার মধ্যে প্রকৃতি ও পরিবেশের সংরক্ষণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাতা ও জাতিসংঘর সনদের বিভিন্ন বিষয় স্বীয় মর্যাদায় সমুন্নত রাখা।[৭০]

৫. শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বজায় রাখা।

ভূটানের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিসমূহ

চীন, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে ঘিরে আবর্তিত হয় দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি। আরেকটু বাড়িয়ে বললে বলা যায় বিশ্ব রাজনীতিও। কারণ এ চারটি রাষ্ট্রে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের বসবাস। তাছাড়া অর্থনৈতিকভাবে ভারত ও চীন এগিয়ে যাচ্ছে "সুপারসনিক" গতিতে। বর্তমান অর্থনৈতিক ও রা জনৈতিক ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী এক দশকেই বিশ্বের নেতৃত্ব চলে আসবে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায়- এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়। তবে এর জন্য দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় শান্তি বজায় রাখতে হবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। আর এটা অনেকটাই নির্ভর করে কার্যত চীন ও ভারতের ওপর।

চীন এক বিস্ময়কর দেশ। বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর একটি। চীনে দীর্ঘকাল ধরে একদলীয় কমিউনিস্ট শাসন বিদ্যমান। ১৯২১ সালের জুলাইয়ে সাংহাইয়ে জন্ম নেয় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিসি)। চেয়ারম্যান মাও জে দংয়ের নেতৃত্বে বিরাট চ্যালেঞ্জ , পর্বতসমান প্রতিবন্ধকতা ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিরোধ মোকাবেলা করে চীন সামনে এগিয়েছে। কার্যত সিপিসির নেতৃত্বেই চীন আজ অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী একটি দেশ। চীন আজ বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এটি একটি অলৌকিক জাদুকরি গল্পের মতো মনে হয়। সিপিসির সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্বের কারণেই চীন আজ এ পর্যায়ে এসেছে। আগামী দশকে চীন পৃথিবীতে এক অন্যরকম বিস্ময় নিয়ে আবির্ভূত হবে। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে চীন বদলে দেবে পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়মনীতি। একটা ত্রিশতলা ভবন তারা নির্মাণ করবে মাত্র ১৫ দিনে, যেখানে প্রায় ১ হাজার মানুষের থাকার জায়গা হবে। একটা এক হাজার কিলোমিটারের রাস্তা তারা নির্মাণ করবে মাত্র কয়েক মাসে, সেটা যত দুর্গম অঞ্চলেই হোক। বলা বাহুল্য দুর্গম ও দুর্ভেদ্য অঞ্চল দিয়ে চীন প্রায় ২৫ হাজার কিলোমিটারের একটা রাস্তা নির্মাণ করেছে মাত্র কয়েক বছরে , যেটি মহাচীনকে এক সুতায় গেঁথেছে। চীন এভাবে আরও এগিয়ে যাক, বদলে দিক পৃথিবীকে, সৃষ্টি করুক নতুন নতুন বিস্ময়। এজন্য চীনকে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতি অব্যাহত রাখতে পালন করতে হবে নিয়ামকের ভূমিকা।

অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দেশ ভারত। স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন বিদ্যমান। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটেই সেখানে সরকার গঠিত হয়। স্বাধীনতার ৬৮ বছরের ইতিহাসে কংগ্রেসই ভারতবর্ষ শাসন করেছে প্রায় ৫০ বছর। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী। ভারত রাষ্ট্রের পরতে পরতে ইন্দিরা

গান্ধীর সুযোগ্য নেতৃত্বের ছাপ রয়েছে। তিনি ভারতের আনাচে -কানাচে ঘুরেছেন। ভারত রাষ্ট্রের মজবুত ভিত্তি তৈরি হয় মূলত ইন্দিরা গান্ধীর অবিস্মরণীয় নেতৃত্বেই। এর আগে অবশ্য টানা ১৭ বছর নেহেরু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। গণতান্ত্রিক শাসনের হাত ধরেই ভারত রাষ্ট্র সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের উত্থানও চীনের চে য়ে কম নয়। তারা ধীরে ধীরে একটি শিল্পোন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। তারা তাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অকল্পনীয়ভাবে ধরে রেখেছে দীর্ঘ এক দশক ধরে। এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতি অব্যাহত থাকলে ভারতও চীনের সমানতালে এগিয়ে যাবে।
এক কথায়, আগামীতে এ দুটি রাষ্ট্রই বিশ্ব শাসন ক রার যোগ্যতা অর্জন করবে। এর জন্য ভারতকেও দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি বজায় রাখতে পালন করতে হবে বিশেষ ভূমিকা । কৃষি এবং পর্যটন শিল্প হচ্ছে ভূটানের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস। দেশের জনসংখ্যার ৯৪ ভাগই কৃষিকাজে নিয়োজিত। স্থলবেষ্টিত হওয়ায় এর কোনো সমুদ্র বা নদীবন্দর নেই। দেশটির আকার-আকৃতি ও পার্বত্য ভূপ্রকৃতির সাথে সুইজারল্যান্ডের বেশ মিল আছে। তাই অনেকে একে এশিয়ার সুইজারল্যান্ড বলে থা কে। বর্হিবিশ্ব থেকে দীর্ঘ দিন দেশটি ছিল বিচ্ছিন্ন। ভূটানে মূল্যবান কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ আছে বলে এখন পর্যন্ত শোনা যায়নি। এমন একটি গুরুত্বহীন দেশ নিয়ে চীন ও ভারতের মতো গুরুত্ব পূর্ণ দুই দেশের রশি টানাটানির কারণ কী? ডোমেনিকান রিপাবলিকের চেয়েও ছোট আর ফিজির চেয়েও কম জনসংখ্যার দেশ ভূটান কেন দিল্লি ও বেইজিংয়ের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল?
প্রথম দৃষ্টিতে ভূটানকে নিয়ে চীন ও ভারতের মতো পরাশক্তির কোনো হিসাব -নিকাশ থাকার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেননা ভূটানে এমন কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নেই, যার জন্য দেশটিতে প্রভাব বিস্তার করতে হবে। এ ছাড়া ভূ টান বিপুল জনসংখ্যারও দেশ নয় , যেখানে পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা যাবে।
আসলে প্রাকৃতিক স ম্পদ বা পণ্যের বাজারের জন্য নয় , ভৌগোলিক অবস্থা নের কারণেই চীন ও ভারতের কাছে ভূটানের এত গুরুত্ব। দুই পরাশক্তির কাছেই ভূ টানের কৌশলগত গুরু ত্ব অপরিসীম। তাই দু,পক্ষই চায় ভূটানকে নিজের কব্জায় রাখতে।
দীর্ঘ দিন পর ভূটান বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগ শুরু করলে চীন ও ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক লড়াই শুরু হয়ে যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই লড়াইয়ের একমাত্র কারণ ভূ টানের গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান। অর্থাৎ আঞ্চলিক অবস্থান হচ্ছে মূল ইস্যু।
চীন ও ভূটানের মধ্যে তিনটি বিরোধ পূর্ণ এলাকা রয়েছে। এগুলো হচ্ছে চীন-ভূটান সীমান্তের উত্তর-মধ্যাঞ্চলে জাকারলং ও পাসামলুং উপত্যকা এবং ভূ টানের পূর্বাঞ্চলে ডকলাম মা লভূমি। তিব্বতের

ওপর প্রভাব বজায় রাখার জন্য এই অঞ্চলগুলোতে চীনের আধিপত্য বিস্তার করা জরুরি। অন্য দিকে ভারতও সিকিম আর শিলিগুঁড়িতে যাতায়াতের জন্য এই অঞ্চলগুলো নিজেদের দখলে রাখতে চায়। আর এ জন্য দরকার ভূটানের সাথে কূটনৈতিক সুসম্পর্ক

শিলিগুঁড়ি করিডোরকে অনেকে বলে থাকেন "চিকেনস নেক" অর্থাৎ মুরগীর গলা। খুবই সরু হওয়ার কারণে এমনটি বলা হয়। তবে যতই চিকন বা সরু হোক না কেন , এটি ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। কেননা ভারতের উত্তর - পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সাথে বাকি ভারতের যোগাযোগের এটাই একমাত্র স্থলপথ। কোনো কারণে যদি ভারত শিলিগুড়ি করিডোরের কর্তৃত্ব হারায় তাহলে উত্তর- পূর্বাঞ্চলের ৪০ মিলিয়ন জনগণের সাথে মূল ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সাংবিধানিকভাবে ডকলাম মালভূমি ও শিলিগুড়ি করিডোর উভয় অঞ্চলই ভূ টানের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই দুই পরাশক্তিই চাইছে ভূটানকে নিজেদের কব্জায় রাখতে।

এ ক্ষেত্রে ভারত কিছু টা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। ভূ টানের তিন দিকে রয়েছে ভারত। এ ছাড়া ১৯৪৯ সালে ভারত ও ভূ টানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে "বন্ধুত্ব চুক্তি"। ওই চুক্তি অনুযায়ী ভূ টান সরকার পরিচালিত হবে ভারত সরকারের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী। ২০০৭ সালে চুক্তি নবায়নের আগ পর্যন্ত ভূটানের পররাষ্ট্রনীতিসহ গুরুত্বপূর্ণ সব কিছুই ভারতের পরামর্শও নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালিত হতো। ২০০৭ সালে ভূটান একনায়কতন্ত্র বাদ দিয়ে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার চালু করে। সে সময় ভারতের সাথে চুক্তি নবায়ন করা হয়। এতে বৈদেশিক নীতিতে ভারতের প্রভাব কমানো হয়।

(ব্রায়ান বেনেডিকটাস একজন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষক, তিনি পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। তার লেখা কোন পথে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি)।[৭১] স্ব-আরোপিত বিচ্ছিন্নতা ত্যাগের পর ভূটান ১৯৬১ সালে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন এর একজন সদস্য হিসেবে যোগদান করে বাইরের দুনিয়ায় নিজেকে উন্মুক্ত করে। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে যোগদান করে ভূটান সম্পূর্ণরূপে জাতিসংঘের চার্টার নিয়মকানুন মেনে চলতে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। ভূটানের পররাষ্ট্রনীতি কিছুটা ভারত কেন্দ্রিক হলেও বর্তমানে ভূটানের সাথে ২২টি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। যেমন- বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, নেপাল, ভারত, জাপান, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি। ভূটান সার্ক এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ। ভূটান প্রতিবেশী সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। সার্ক এর সদস্য দেশ হিসেবে ভূটানের পররাষ্ট্রনীতির একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ দিক

হচ্ছে সার্কভুক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং শান্তি স্থাপন।[৭২] ভূটানের পররাষ্ট্রনীতি মূলত শান্তি-সমৃদ্ধি ও বন্ধুত্ব এই তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মহারাজা (Cligme Singye Wangehuck) জিগমে সিংয়ে-ওয়াংচুক-ভূটানের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে উদ্দেশ্য করে বলেন–

1. Firstly, we are committed politically to a strong and loyal sense on nationhood to ensurmy the peace and security of our citizens and suvereign territorial integrit of our land.
2. Secondary, to achieve economic self reliance and the capacity to begin and complete any project we undertake, and
3. Thirdly, to preserve the Ancient religious and cultural heritage that has for so many centruries strengthered and enriched ruralives. [৭৩]

এছাড়া ভূটান জাতিসংঘ এবং NAM এর সনদ মেনে চলে। ভূটানের পররাষ্ট্রনীতি শান্তি, বন্ধুত্ব, এবং নিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত।[৭৪] তিনি আরো বলেন, "We have based our policy of non alignment on our dtermination not align ourselves with one bloc and to hate of other or to play power polilies with both. Indeed as Dhamma pada says. Never in this world does hatred case by hated, it cases only with love. This is the low Eternal Rct."[৭৫]

ভূটানের পররাষ্ট্রনীতিতে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করা যায়, যা দুটি ক্ষেত্রে বিভক্ত। যথা -

১) প্রতিবেশী দেশের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা ।

২) আঞ্চলিক (সার্ক) এবং আন্তর্জাতিক (জাতিসংঘ) সংগঠনের প্রতি শ্রদ্ধা।[৭৬]

ভূটান ১৯৪৯ সালে একটি সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে ভারতের অধীন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।[৭৭] তাছাড়া ভূটান তিনদিক থেকে ভারত দ্বারা সীমানাস্থ হওয়ায় এর বাইরে অন্য কোন নতুন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী।[৭৮]

যে কোন দেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। এ তিনটি দেশের ও ক্ষেত্রে ও তাই পরিলক্ষিত হয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে এ তিনটি দেশ স্বয়ংসম্পন্ন না হওয়ায় নিজের নিরাপত্তা ও বন্ধুসুলভ পরাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। এ তিনটি দেশ আন্তর্জাতিক ও পরিস্থিতির মান সমন্বয় করে কূটনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকে। এ তিনটি দেশ জাতিসংঘ, ন্যাম ও সার্ক প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংঠনের সদস্য হওয়ায় এদের পররাষ্ট্রনীতি প্রায়ই একই রকম।

সংক্ষেপে বলতে গেলে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের সময় যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা দরকার সেগুলো হলো–

১। কোন রাষ্ট্রের অক্ষমতা ও উদ্দেশ্যাবলি ও সেই সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রের সক্ষমতা ও উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ ও এগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন।

২। কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও দুর্বলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে অনেকগুলো সম্ভাব্য বিকল্পের মধ্য থেকে সর্বোত্তমটিকে নীতি হিসেবে বাছাই করা।

৩। নীতি প্রণয়নের পর সেটিকে বাস্তবে রূপদান করার ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সুতরাং উভয় দেশ জাতিসংঘ, সার্কের আদর্শ ও আকাঙ্খার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতি সমূহের সমর্থক। ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় ন্যাম (NAM) তখন থেকেই আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সৌহার্দ্য ও শান্তি বিস্তারে উভয় দেশ একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।[৭৯]

তথ্যনির্দেশ

১. Bull Hedley, Force in Contemporary International Relation Survival, 10(9), (1968), p-302 (Research Efforts)

২. Beahr Peter R., “Small States : A Tool for Analysis ? World Polities” 27(3), (1975). p.p-456-466 (Research Efforts)

৩. Annette Baker Fox,“The Small States in International System,1919-1969”, International Journal, (1968-1969), PP-751-764,Vol.24,no-4(Autum 1968-1969)

৪. Amstrup Niels,“The Perennial Problem of Small States: Cooperation and Confliet” ,(A Survey of Research Efforts), XI, p.p-164-182.

৫. Vayrynen Raimo,“On the Definition and Measurement of Small Power Status, Cooperation and Conflict-1971”,(A Survey of Research Efforts), pp.6-93

৬. Ibid, P-13

৭. Vayrynen Raimo, “On the Definition and Measurement of Small Power Status, Cooperation and Confliet,” First Published-March 1, 1971, Research Article, p.p-6, 95-97

৮. Rothstein Robert L,“Alliances and Small Power”, (Columbia University Press, New York, 1968), p.p- 12-13.

৯. Ibid, p.p-12-23.

১০. Talukder Moniruzzaman,“The security of small states in the Third World”,Canberra Papers on strategy and defense No.5, (Canberra: The Australian National University,1982), P-5.

১১. Michael Handel,“Weak states in the international system”, (London : frark cass, 1981), p.p- 52-53.

১২. Shaheen Akther, Determinants of foeign policy Behaviour of small states; in south Asia Regional studies, vol-XIII, No-02, spring 1995, P-47.

১৩. Shamim Abdul Mannaf,“Security of small states in the contemporary world”, “BIISS journal”, Vol.3, No. 1, 1982,

১৪. Hongkan wibery, “The security of small nations: challenges and Defenses”,Journal of Peace Research, Vol, 24, No. 4, 1987, P-339.

১৫. Hakan Wibery, “The Security of small Nations: Challenges and defenses,” Journal of Peaces Research, Vol, 24, No. 4, 1987, P-339,

১৬. Karl. W. Deutsch,“The Analysis of International relations”, (Englewood Chaffs, N. N. Prentice- Hall Inc. 1968), P-31.

১৭. Shaheen Akhtar,“Determinants of foreign policy behaviour of small states”, in south Asia, Regional studies Islamabad, Vol. xiii, No. 2, Spring 1995, P-48.

১৮. A. K. M Adbus Sabur,“Foreign Policy of Bangladesh, Challenges in the 1990”,“BIISS Journal”, Vol. 14, No. 2, 1991, P-448.

১৯. shaheen Akhter, p-90.

২০. তালুকদার মনিরুজ্জামান, “তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা”, (ঢাকা : প্যাপিরাস প্রকাশনা, নভেম্বর, ১৯৯৩),পৃ-২৪।

২১. Bhabani sen Gupta, “Regional organization and security of small states”, (Paper presented at the international seminar on the security of small states, held at Dhaka, 6-8 January 1987), p.p-10-12.

Ataur Rahman,“Small states in the international securities system”, (Paper presented at the internatonal seminar on the securities of small states in Dhaka 6-8 January 1987), p-3.

২২. Bhabani sen Gupta, P.3.

২৩. A. K. M Adbus Sabur,“Foreign Policy of Bangladesh, Challenges in the 1990”,“BIISS Journal”, Vol. 14, No. 2, 1991, P-448.

২৪. Michael Handal, “Weak States in the International System ”, (London : Frark cass,1981),p-194.

২৫. Kwame Nk.Rumah,“I speak of freedom”, (New York : Prager, 1961), P-199.

২৬. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন,“ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ”, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ-১৪।

And Guy Arnold, “Aid and the Third World” (London: Robert Royeee Ltd. 1985) P-101.

Kamal uddin Ahmed,“US Economic Aid to Bangladesh : A study of Political Implications”,(Ph.D. Thesis, Rajasthan : University of Rajastan, 1984), P-10.

২৭. S.D. Muni,“Power is the contral concern of any political activity, India and Nepal : A changing relationship”, (Delhi: konark publication, 1992),P.P: 13-27.

And Golam Mostafa,“National Interest And Foreign policy”, (Delhi: south Asian publishers, 1995) p-46

২৮. Ibid, International Affairs, p-103

২৯. Ibid

৩০. James N. Rosenau,“The study of Foreign Policy”, in Rosenau and Thompon Boyl (ed), “World politics”, (New York : The free press, 1976), P-17.

৩১. Christopher clapham,“Foreign Policy making in developing states”, (London: Saxon house, 1979), P-3.

৩২. Dr.Promod Kumar Mishra,“South Asia in International Polities”, (Delhi:UDH Publishers,1984) P.P 2-8.

৩৩. Economic and Political Relations, Between Bhutan and Neighbouring countries, A joint Reserach Project of the Centre for Bhutan Studies (CBS) and Institute of Developing Economics Japan External Trade organization (IDE/JETRO), P-3. (PDF online reserach)

Shark finks to tortoise shell, Asia and the pacific, 1983, pp. 209-11.

৩৪. Ibid

৩৫. আতিউর রহমান,“সার্ক : রাজনৈতিক অর্থনীতি”, (ঢাকা : ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৫) পৃ-২২।

৩৬. A.I. Ikram,“security of small states in south Asia context”, Regional studies, Volume.V, no-1. Winter 1986-87.P-10

৩৭. Ibid

৩৮. Ibid

৩৯. Ibid

৪০. Ibid

৪১. Ibid

৪২. Ibid

৪৩. Ibid

৪৪. Emajuddin Ahamed, “Foreign Policy of Bangladesh, A Small State’s Imperative”, (Dhaka : Komol Kuri Prokashon,1984), (Review).

৪৫. Ibid

৪৬. Ibid

৪৭. Norman J. Padelford, George A. Lincoin and Lee D. Olvey, “The Dynamic of International Politices ”,(New york : Macmillan Publishing Co., Third Edition 1976), pp.201,234.

৪৮. Ibid, Norman J. p-213

৪৯. Ibid, p.p.233-243.

৫০. F.S. Northedge, “The nature of foreign policy” in F.S. Northedge , “The Foreign Policies of the Powers” ,(London: Faber and Faber, 1968), P-27.

৫১. ঐ, “তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা”,তালুকদার মনিরুজ্জামান, পৃ-২৪।

৫২. Foreign Ministry of Bangladesh. (Official Website)

৫৩. Bangladesh Documents Vol. 2. Ministry of External Affairs, Govt. of India UPL edition 1999, p.607.

৫৪. Ibid

৫৫. The Times London, January 15,1972.

৫৬. Asia Year book,1977, p.20

৫৭. Asian survey, Feb.1980.p:228

৫৮. Emajuddin Ahmed, “Bangladesh and the Policy of Peace and Non alignment”, Asian Affairs, Vol. III, No. 2 (June, 1981) , p-126.

৫৯. The Bangladesh Observer Dhaka, January-14, 1972, p-26

৬০. Ibid, Ihtesham Kazi, P-101. And Ministry of Foreign Affairs, Govt. of Bangladesh. (Website)

৬১. Ministry of Foreign Affairs, Govt. of Bangladesh. (Official Website)

৬২. Ibid, New Encyclopedia Britannica, Volume-7, p.732.

৬৩. Foreign Ministry of Maldives. Fogeign.gov.mv(Website)

৬৪. Ibid

৬৫. Ibid

৬৬. Far Eastern Economic Review, Asia year Book, 1986, P. 194.

৬৭. Asia year Book 1983, , p. 202.

৬৮. Asia year Book-1979 pp-248-50 and 1987, pp. 240-43.

৬৯. Asia Year book 1983, and Umashanker phadnis, “Maldives,” World Focus, November-December, 1985, p.78.

৭০. Ibid

৭১. মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, কোন পথে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি, প্রকাশ : ১৬ জুন ২০১৪, যুগান্তর।

৭২. http://jp.yanatravel.com/about_bhutan/foreignpolicy.

৭৩. Siraj Chowdhury, “Bhutan Maintains spearate Indentities”, Holiday Dhaka, May 14, 1983.

৭৪. Rahimullah Yusufzai, “Indo-Bhutanese Relation : Bhutan’s Quest for an International Role”, Regional Studies, Vol. 3,No. 1, Winter 1984, P. 11.

৭৫. His Majesty Jigme singye wangehek’s address to the south conference of the Heads of state or Government of the Non Alignment countries, held at Havana (Cuba) September 3-9, 1979 and Published along with other addresses by the Editoral de cinaas sociales, la Havana 1980, P. 134.

১৬. Siraj Chowdhury,“Bhutan Maintains spearate Indentities”, Holiday Dhaka, May 14, 1983.

১৭. Nirmala Das, ‘Bhutan : World Focus’, November-December, 1983, P. 98.

১৮. Ibid, Rahimullah Yusufzai.

১৯. http://jp.yanatravel.com/about_bhutan/foreignpolicy.

ষষ্ঠ অধ্যায়
সার্ক

আঞ্চলিক জোট গঠন

(South Asian Association for Regional Co-operation)

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা : ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯৮১ সালে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে দক্ষিণ এশীয় সাতটি দেশের প্রতিনিধিগণ বৈঠকে মিলিত হন। ১৯৮৩ সালের ২ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে সার্ক গঠনের সিদ্ধান্ত হয় । ১৯৮৫ সালে সাতটি দেশের সরকার প্রধানদের ঢাকায় এক বৈঠক হয়, যেখানে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি (বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা) দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সার্ক গঠিত হয়।[১] এর সদর দপ্তর নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে। এই সব দেশের মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতার জন্য ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি কার্যকর হয় ১৯৯৫ সালের ৮ ডিসেম্বর। সাপটার পূর্ণরূপ হলো (South Asian Prefential Trade Arrangement)। বিশ্বের ১৪১ কোটি ১ লাখের অধিক জনসংখ্যা (বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট-২০০৩) অধ্যুষিত সার্কভুক্ত সাতটি দেশ দারিদ্র্য পীড়িত, অধিক জনসংখ্যায় ভারাক্রান্ত এবং স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন। এ সমস্ত সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশসমূহের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সার্ক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সার্কের উদ্দেশ্যাবলী নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. দক্ষিণ এশিয়ার জীবনযাপনের মান উন্নীত করা;

২. দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা;

৩. সামাজিক অগ্রসরতা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ নিশ্চিত করা;

৪. নাগরিকদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন এবং তাদের সামনে সম্ভাবনাময় দিগন্ত উন্মোচিত করা;

৫. দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে জোরদার করা;

৬. একে অপরের বিপদকালীন সময়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করা;

৭. সার্কের মতো আঞ্চলিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান থাকলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে যুদ্ধের টান টান উত্তেজনা কমে যাবে। ফলে যুদ্ধের পেছনে, সামরিকখাতে অর্থ বরাদ্দ ও কমে যাবে। এভাবে অর্থ দ্বারা সার্কভুক্ত দেশসমূহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয় করতে পারবে;

৮. সার্কভুক্ত দেশসমূহ সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ দেশের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের দৌরাত্ম বা মুনাফা লাভ করার সুযোগ কমে যাবে বা থাকবে না;

৯. সার্কভুক্ত দেশসমূহ একটি এক ও অভিন্ন পরিবেশ বলয়ের (Equo-System) মধ্যে অবস্থিত। সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করলে সব দেশই উপকৃত হবে। সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে এক ও অভিন্ন মণ্ডলের দু'টি বিশেষ একক বৈশিষ্ট্য আছে, যা হলো হিমালয় পর্বত এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চল। এ দু'মণ্ডলেই আছে অফুরন্ত সম্পদ। সার্ক সুচারুরূপে কাজ করলে সদস্যভূক্ত দেশসমূহ প্রযুক্তি যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে হিমালয়ের সম্পদ এবং ভারত মহাসাগরের সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারে সক্ষম হবে।[২]

সার্ক অধিবেশন : ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকার সার্কের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সার্কভুক্ত সদস্য প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি, নারীর উন্নয়ন, মাদক চোরাচালান নিষিদ্ধকরণ এবং সার্ক সচিবালয় গঠন সম্পর্কিত আলোচনা হয়। ১৯৮৬ সালের ১৬-১৭ নভেম্বর বেঙ্গালোরে সার্কের দ্বিতীয় অধিবেশন সংঘটিত হয়। যেখানে (Memorandum of

Understanding on the Establishment of the SAARC Secretariat) সার্ক সচিবালয় গঠন, সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, তথ্য-প্রযুক্তির বিনিময় সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে মত বিনিময় হয়। তৃতীয় সার্ক অধিবেশন সংঘটিত হয় ১৯৮৭ সালে ৪ নভেম্বর কাঠমুণ্ডুতে। এই অধিবেশনে সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন কাজে নিয়োজিতকরণ বিষয়াবলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চতুর্থ অধিবেশন সংঘটিত হয় ১৯৮৮ সালের ২৯-৩০ ডিসেম্বর ইসলামাবাদে। যেখানে ১৯৮৯ সালকে মাদক প্রতিরোধ বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি নিরূপন করা হয়। ১৯৯০ সালকে SAARC Year of the Girl Child হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এসব দেশের কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য SAARC Agriculture Information Centre তৈরি করা হয়। পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে। ১৯৯০ সালের ২৩ নভেম্বর যেখানে ১৯৯০ সালকে SAARC Year of Shelter, ১৯৯৩ সালকে SAARC Year of Disabled Persons, ১৯৯২ সালকে SAARC Year of the Environment ঘোষণা করা হয় এবং এসব দেশের ভিসা Exemption প্রক্রিয়া শুরু করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ষষ্ঠ সার্ক অধিবেশন হয় ১৯৯১ সালের ২১ ডিসেম্বর কলম্বোতে। যেখানে এইসব দেশের মধ্যে কারিগরী সহায়তা, তথ্য প্রযুক্তি বিনিময়, বাণিজ্যিক প্রসার, সন্ত্রাস ও মাদকদ্রব্য দমন, অর্থনৈতিক সহায়তা, দারিদ্র দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মতামত গ্রহণ করা হয়। সপ্তম সার্ক অধিবেশন হয় ১৯৯৩ সালে ১০-১১ এপ্রিল ঢাকায়। এই অধিবেশনে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, বাণিজ্যের ক্ষেত্র বৃদ্ধি, দারিদ্র দূরীকরণ, উৎপাদন ও বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। যার প্রেক্ষাপটে সাপটা চুক্তি (SAPTA) স্বাক্ষরিত হয়। বৃহৎ শক্তির মোকাবেলা, নারী, শিশু, ও পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সন্ত্রাস দমন এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয় ও এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় । তাছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক নির্ধারক এবং দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়ন তহবিল গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়। অষ্টম সার্ক অধিবেশন হয় ১৯৯৫ সালের ২৪মে দিল্লিতে। যার ফলে সাপটা (South Asian

preferential trading arrangement) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ পূর্বের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নবম সার্ক অধিবেশন হয় মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে ১৯৯৭ সালের ১৪মে, যেখানে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, দারিদ্র দূরীকরণ, সাপটা এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রসার এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়গুলো উঠে আসে। ১৯৯৮ সালের ২৯-৩১ শে জুলাই কলম্বোতে অনুষ্ঠিত হয় দশম অধিবেশন। এই অধিবেশনে প্রত্যেকটি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের মানিয়ে নেওয়া, কারিগরী ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এত আলোচনার পরও ২০০২ সালে The World Development Report 2002 on South Asia Portion এ দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক পরিসরে মূল বাণিজ্যের ৫.৩% রপ্তানি এবং ৪.৮% আমদানী হয় সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে যা সার্কের আলোচনার সাথে বেমানান। একাদশ অধিবেশন হয় ২০০২ সালের ৪-৬ জানুয়ারি নেপালের কাঠমুণ্ডুতে। সার্কের বাণিজ্য প্রসারের জন্য সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরসহ পূর্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। দ্বাদশ অধিবেশন হয় ২০০৪ সালে ৪-৬ জানুয়ারি ইসলামাবাদে। সাপটার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সংস্কৃতির আদান প্রদান, পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এ দেশগুলোর মধ্যে যোগযোগ বৃদ্ধি, রাজনৈতিক সহযোগিতা, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ত্রয়োদশ অধিবেশন হয় ২০০৫ সালের ১২-১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশে যেখানে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, HIV/AIDS প্রতিরোধ, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি ও পূর্বের বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। ২০০৭ সালের ৩-৪ এপ্রিল ভারতের নয়াদিল্লিতে চতুর্দশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় জলবিদ্যুৎ, তরল জ্বালানী, সম্ভবনাময় শক্তির বিষয় টি উঠে আসে। তাছাড়া সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে (South Asian free trade area) এর মাধ্যমে বাণিজ্য আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। ২০০৭ সালকে "**Year of Green South Asian**" আখ্যায়িত করা হয়। ২০০৮ সালের ২-৩ আগষ্ট মাসে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে সার্কের ১৫তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় যৌথ

উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ, বার্তা মাধ্যম যোগাযোগ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভাবে জনযোগাযোগ বৃদ্ধি, বিভিন্ন উৎস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, জনসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, বিজ্ঞান, পর্যটন, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরবর্তী আলোচনায় সার্ক অধিবেশনের বাস্তব কার্যকারিতা অনুধাবন করা যাবে এবং বাণিজ্যের প্রসারতার বর্ণনায় সার্কের মাধ্যমে তিনটি দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের প্রসারতা মূল্যায়িত হবে।

সাপটা চুক্তির উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য : বর্তমানে পৃথিবীতে উন্নয়ন দৃশ্যপটের দিক তাকালে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বস্তুত অত্যাবশ্যক। বিশ্ব জুড়ে বেশ কয়েকটি ট্রেডিং ব্লক এবং ইকনমিক গ্রুপিং এর জন্ম এটাই প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত থাকা (Economic Survival) তথা ক্রমশ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে একটি রাষ্ট্রকে উন্নতির জন্য একা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে কোন সমষ্টিগত অর্থনৈতিকধারার সহযোগিতার সংগে সম্পৃক্ত হওয়া বেশি প্রয়োজনীয় এবং অনেক বেশি লাভবান।[৩] এ সত্যকে অনুধাবন করে দক্ষিণ এশিয়ায় সাতটি রাষ্ট্র যথা : বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তানএবং শ্রীলঙ্কা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ যখন তাদের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন সার্ক চার্টার সার্ক কার্যক্রমের আওতা থেকে বাণিজ্য সহযোগিতার বিষয়টি বাদ দিয়েছিল। কারণ, এটাকে তখন একটা বিতর্কিত বিষয় (Contention issue) বলে বিবেচনা করা হয়।[৪] বাণিজ্য এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ (যথা-শিল্প, বিনিয়োগ ইত্যাদি) বাদ দিয়ে সার্ক স্থপতিগণ আঞ্চলিক সহযোগিতার দিকে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হবার কথা সহজেই বোধগম্য। কিন্তু তাই বলে এতে দক্ষিণ এশিয়ার এ অঞ্চলে বাণিজ্য সহযোগিতার গুরুত্ব কমে যায়নি। বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাবিদ, অর্থনৈতিক ও সমাজ গবেষকগণ দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপক্ষে অত্যন্ত জোড়ালো যুক্তি দেখিয়ে আসছেন। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহযোগিতার দৃষ্টান্ত হতে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বাণিজ্য সম্প্রসারণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আঞ্চলিক সহযোগিতার সুফল সত্যিকারভাবে অর্থবহ হয় না। দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার বাণিজ্য ব্যবস্থা "South Asian Preferential Trade Arrangement"

(SAPTA) সাপটা হচ্ছে সার্কভুক্ত সাতটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সংক্রান্ত এক প্রকার সমঝোতা চুক্তি। ১৯৯১ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সার্কভুক্ত দেশসমূহের রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ সার্ক দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং এ অঞ্চলের জনগণের জীবন যাপন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাপটা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।[৫] ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় সার্কের ৭ম শীর্ষ সম্মেলনের শেষদিন অর্থাৎ ১১ এপ্রিল সার্কভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্র মন্ত্রীগণ এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯৯৫ সালের ২০-২১ এপ্রিলের আইজিজি (Inter Government Group)-এর সভায় শুল্ক রেয়াত বিনিময় চূড়ান্ত করা হয় এবং ৮ ডিসেম্বর (১৯৯৫) থেকে সাপটা কার্যকর হয়েছে। সাপটা চুক্তির আওতাভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য প্রসার ও ক্রমাগত উদারীকরণের নিমিত্তে সার্ক অঞ্চলের পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে প্রভেদহীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রার্থিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি ভূমিকা (Preamable), ২৫টি ধারা (Article), এবং তিনটি পরিশিষ্ট (Annexes), সম্বলিত সাপটা চুক্তির নীতিসমূহ, প্রকৃতি (Modality) এবং প্রক্রিয়াসমূহ বিবৃত হয়েছে। সাপটা চুক্তি অনুযায়ী সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে নিচের বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়। যথা–

১. ট্যারিফ;

২. প্যারা-ট্যারিফ শুল্কাদি (para-tariff);

৩. অ-ট্যারিফ (non-tariff) এর কার্যক্রম ও

৪. প্রত্যক্ষ বাণিজ্য (direct trade) কার্যক্রমের মাধ্যমে (ধারা ১ ও ৪) পাস্পরিকভাবে অগ্রাধিকার সূচক বাণিজ্য সুবিধা দেবে। এসব সুবিধার মধ্যে রয়েছে-

ক) স্বল্পোন্নত দেশকে বিবেচনায় আনা।

খ) শুল্ক হ্রাস করা।

গ) আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বাণিজ্যের উন্নয়ন করা।

ঘ) প্রত্যক্ষ বাণিজ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে পারস্পরিক আলোচনার আলোকে স্থিরীকৃত করা (ধারা-৫)।

এসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও কার্যক্রমের ফলে পরস্পরের প্রতি প্রদত্ত ট্যারিফ বা ট্যারিফ সদৃশ্য রেয়াত সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় রেয়াত বিষয়ক তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে (ধারা-৭)। এক সদস্য দেশ কর্তৃক অন্য সদস্য দেশকে দেয়া এসব রেয়াতাদির নিঃশর্তে সার্কের সকল দেশের প্রতি প্রয়োগযোগ্য হবে। কেবল মাত্র সার্কের অন্তর্ভুক্ত অনুন্নত দেশ (জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ি) সমূহের ক্ষেত্রে তাদের তরফ থেকে প্রদেয় শুল্ক বা এই ধরনের রেয়াত দেয়া বাধ্যতামূলক হবে না। (ধারা-৮)। এই চুক্তি অনুন্নত দেশ সমূহের অনুকূলে অন্যান্য সদস্য দেশসমূহ যথা সম্ভব বিশেষ ও অনুকুলের রেয়াতাদি ও সুবিধাদি দেবেন। এসব রেয়াতাদি ও সুবিধাদির মধ্যেঃ

১. রপ্তানি পণ্যের জন্যে শুল্কবিহীন প্রবেশাধিকার বা ট্যারিফ ভিত্তিক অগ্রাধিকার বা গভীরতর ট্যারিফভিত্তিক অগ্রাধিকার প্রদান।

২. অ-ট্যারিফভিত্তিক বাঁধার অবসান।

৩. যথাযথ স্থানে ট্যারিফ- সদৃশ্য বাধার অবলোপন।

৪. যুক্তি সংগত মাত্রায় সংরক্ষণীয় রপ্তানি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দীর্ঘ মেয়াদী বাণিজ্য চুক্তিকরণ।

৫. অনুন্নত দেশসমূহের তরফ হতে আমদানীর উপর পরিমাণগত সীমা আরোপণে অধিকতর সহজ পদ্ধতি (flexibility) এবং প্রদত্ত রেয়াত প্রত্যাহারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত (ধারা-১০ ও ১৪)। এই চুক্তির আওতায় গ্রহণীয় কার্যক্রম বা প্রদেয় রেয়াতাদি সার্ক বহির্ভূত দেশসমূহের সাথে সদস্য দেশ বিদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক, চুক্তি বা ব্যবস্থাদির প্রতিকূলে (ধারা-১১) প্রয়োগ করার বাধ্যবাধ্যকতা থাকবে না।

এই চুক্তি অনুযায়ী সদস্য দেশ বিদেশের দেনা পাওনা স্থিতিতে (balance of payments) বিঘ্ন ঘটলে কিংবা তার সামনে ঘোরতর অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে চুক্তির আওতায় প্রদেয় রেয়াতাদি সাময়িকভাবে বন্ধ করা যাবে (ধারা-১৩)। যেসব পণ্য সামগ্রীতে পারস্পরিক রেয়াত দেয়া হবে সংশ্লিষ্ট দেশের সে সব পণ্য সামগ্রীর উৎপাদনের মূল্য যোজনার মাত্রা ন্যূনতম পক্ষে ৫০% হবে; অনুন্নত দেশসশূহের ক্ষেত্রে এসব মূল্য যোজনার মাত্রা শতকরা ১০% কম হতে পারবে (ধারা ৯-১৬)। সদস্য দেশসমূহ সার্ক অঞ্চলে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন অবকাঠামো ও আন্তঃদেশ বাণিজ্য সুবিধাদি প্রসারের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করবে (ধারা-১২)।

এই চুক্তি বাস্তবায়ন ও চুক্তির আওতায় বাণিজ্য সম্প্রসারনভিত্তিক উপযোগের সহমর্মী বিভাজন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সদস্য দেশসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি (Committee of Participants) গঠিত হবে। এই কমিটি অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রয়োজনীয় পদ্ধতিমূলক বিধি নির্ধারণ করবেন। কমিটি সদস্য দেশসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা, আলোচনা ও পর্যালোচনা করবেন এবং পারস্পরিক আলোচনার ফলে সম্ভব না হলে শেষ পর্যায়ে এই চুক্তির বিভিন্ন ধারার অর্থ ও প্রয়োগ বিবাদের নিষ্পত্তি করবেন (ধারা- ৯, ১৯, ২০)। সকল সদস্য দেশের সম্মতিক্রমে এই চুক্তি সংশোধন করা যাবে (ধারা-২৪)। সকল সদস্য দেশ কর্তৃক এই চুক্তি অনুমোদনের লৌকিকতা সম্পন্ন হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চুক্তিটি বলবৎ হবে (ধারা-২২)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও ভূটান চুক্তিটির অনুসমর্থন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে এবং ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে চুক্তিটি কার্যকরি হয়েছে। চুক্তি বলবৎ হওয়ার পর যে কোন সময়ে ৬ (ছয়) মাসের লিখিত নোটিশ দিয়ে এই চুক্তি থেকে যে কোন দেশ নিজেকে প্রত্যাহার করতে পারবে (ধারা-২১)।

২০-২১ এপ্রিল, ১৯৯৫ তারিখে সার্ক সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত আইজিজির ৬ষ্ঠ সভায় সার্কের সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর SAFTA চুক্তির আওতায় প্রদেয় শুল্ক রেয়াত প্রাপ্ত পণ্যের তালিকা চূড়ান্ত করা হয় যা পরে দিল্লীতে শীর্ষ সম্মেলন চলাকালে স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশক্রমে কাউন্সিল অব মিনিস্টার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এই তালিকায় ৬ ডিজিট এইচ এস কোডের বর্ণনায় মোট ২২৬টি পণ্য স্থান পায় যা দেশওয়ারী নিম্নরূপ:

বাংলাদেশ	১২ টি
ভূটান	১১ টি
ভারত	১০৬ টি
মালদ্বীপ	১৭ টি
নেপাল	১৪ টি
পাকিস্তান	৩৫ টি
শ্রীলঙ্কা	৩১ টি
মোট	২২৬ টি

সাপটার আওতায় বাংলাদেশ ১২টি আমদানীযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত শুল্ক হারের ১% রেয়াত প্রদান করবে। উল্লেখযোগ্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে তাজা আঙ্গুর, চুনাপাথর এবং কৃষি কাজে ব্যবহৃত কীটনাশক। এই রেয়াত প্রদানের ফলে বাংলাদেশের রাজস্ব আয় বাৎসরিক ১৮.৮৭ লাখ টাকা হ্রাস পেতে পারে। বাংলাদেশের প্রদত্ত শুল্ক রেয়াতের ফলে দেশের আমদানী বৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্ষীণ।

সাপটা চুক্তির ফলে বাংলাদেশের যেসব পণ্য সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে রেয়াত পাবে তা নিম্নরূপ:

ভূটান : প্রসাধন সামগ্রী (১০%), কাপড় কাচা ও গায়ের সাবান (১০%), বিস্কুট ও নুডুলস (১০%), চকলেট (২০%) ইত্যাদি।

ভারত : জৈব ও রাসায়নিক সার (১০০%), বিভিন্ন প্রকার চামড়াজাত পণ্য (৫০%), পার্টিক্যাল বোর্ড (৫০%), কাগজ ও বোর্ড (৫০%), চীনামাটি ও অন্যান্য সামগ্রীর তৈরি টেবিলওয়্যার, কিচেনওয়্যার এবং অন্যান্য গৃহসামগ্রী (৫০%), টুথপেষ্ট (৫০%), বিস্কুট (৫০%) ইত্যাদি।

মালদ্বীপ : কাঁচাপাট (৭.৫%), চামড়া (৭.৫%), কার্পেট (৭.৫%) ইত্যাদি।

নেপাল : ঔষধপত্র (১০%), চামড়াজাত পণ্য (১০%) ইত্যাদি।

পাকিস্তান : পান (১৫%), বাঁশ (১৫%), চামড়া (১৫%), কাগজ ও বোর্ড (১৫%), বই (১৫%), কাঁচা পাট (১৫%) ইত্যাদি।

শ্রীলঙ্কা : জুট কার্পেট (১০%), জুট ইয়ার্ন (১০%) ইত্যাদি।

নিম্নের সারণিতে কার্যকরী রেয়াতি হারের পরিমাণ দেওয়া হল :

দেশের নাম	কার্যকরি রেয়াতি হারের আওতা (%)	কার্যকরি রেয়াতি হারের গড় (%)
বাংলাদেশ	৬.৭৫-৫৮.০০	২৩.০৬
ভারত	০-৪৫.০	২০.৮৩
পাকিস্তান	১৩.৫-৬৩.০	৩৫.২৭
নেপাল	৪.৫-২৭.০	১৬.১৬
মালদ্বীপ	১৩.৮৬-২৩.১৩	২০.১৩
ভূটান	৮.৭-৪২.৫	২১.৮৩
শ্রীলঙ্কা	৮.০-৩১.৫	২০.১৬

সমষ্টিক হারে শুল্ক হ্রাস পদ্ধতি বাণিজ্য বৃদ্ধির আর একটি কার্যকরি পদক্ষেপ। এর আওতায় প্রস্তাবিত সকল পণ্যের ক্ষেত্রে একই হারে শুল্ক রেয়াতের সুবিধা পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের পক্ষে এ ধরনের শুল্ক হ্রাস বিরাট বাণিজ্য ঘাটতির বিষয় হলেও যে সমস্ত ক্ষেত্রে Non-reciprocal treatment গ্রহণের সুযোগ রয়েছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এ সুবিধা নিতে পারে। সার্কভূক্ত দেশগুলো প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সুবিধার আওতায় দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কতিপয় বিশেষ পণ্যের আমদানি রপ্তানি নিশ্চিত করা যায়। তাছাড়া সার্ক নেতৃবৃন্দ মনে করেন, ‘সাপটা’ এই অঞ্চলের বাণিজ্য ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য যে ষষ্ঠ সার্ক সম্মেলনের চেয়ারম্যান এবং শ্রীলঙ্কার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট রানাসিংহে প্রেমাদাসা ‘সাপটার’ প্রবক্তা ছিলেন।[৫]

সাপটা (SAPTA) এর গুরুত্ব :

১. সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সার্কের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক জোড়দার করার ক্ষেত্রে সাপটা চুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক সংরক্ষণবাদী নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাপটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৩. প্রাথমিকভাবে সার্কভুক্ত দেশগুলোর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে শুল্ক হ্রাস করতে সম্মত হয়েছে। এর ফলে আন্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করা হয়।

৪. সাপটা চুক্তির ফলে সার্কভুক্ত দেশগুলোর যৌথ উদ্যোগে শিপিং, সার, বিদ্যুৎ শক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

৫. সাপটা চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে একটি মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে উঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।[৬]

সাপটার অন্তরায় : সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে (বাংলাদেশ, ভূটান, মালদ্বীপ) বাণিজ্য ঘাটতির কারণ গত কয়েক বছর ধরেই সদস্য রাষ্ট্রগুলি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জের তুলে সার্কের মতন বহু দেশীয় একটি মঞ্চকে বিতর্কের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কয়েকটি সদস্য দেশ আবার সার্কের সনদের সংশোধনের দাবিও তুলেছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী যখন বলছেন, অর্থনীতি ও প্রযুক্তিগত বিষয়ের

সঙ্গে রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেললে চলবেনা, তখন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বলছেন রাজনৈতিক সমস্যা কমে গেলে সাতটি দেশের মধ্যেই অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়বে। সার্কই রাজনৈতিক সমস্যা মেটানোর উৎকৃষ্ট মঞ্চ। মূল যে প্রশ্ন নিয়ে সার্কের পরিবেশ দূষিত হয়ে উঠেছে, তা হল সার্কের মঞ্চ দ্বিপাক্ষিক প্রশ্নের জন্য ব্যবহার করা যায় কিনা। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা পাক বিদেশ মন্ত্রীর মতনই দ্বিপাক্ষিক প্রশ্ন তোলার পক্ষেই রায় দিয়েছেন। আসল কথা হল রাজনৈতিক মতবিরোধ ও অবিশ্বাসই সার্কের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সাপটার ভবিষ্যৎও সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কোন সন্দেহ নেই কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ উভয় দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিদ্যমান বাংলাদেশ-পাকিস্তানসমস্যা এ দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্যে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একসময় নেপাল প্রতিবেশী দেশগুলিকে বাদ দিয়ে পাকিস্তান থেকে পণ্যদ্রব্য আমদানি করতো কিন্তু এসব বির্তকের কারণে নেপাল ও পাকিস্তানের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের স্থবিরতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন সার্কের চেয়ারম্যান হয়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে বলেন, তখন সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছোবল মারছে, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। ছোট দেশ মালদ্বীপও ভারতের মতন বৃহৎশক্তির কাছে ভয়ে থাকে। ভূটানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আর শ্রীলঙ্কা ভারতকে অবিশ্বাস না করলেও বিশ্বাসের ভিত পাকাপোক্ত নয়। এদিকে 'সাপটা' কার্যকর হওয়ার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছোট ছোট দেশগুলি সন্দেহ করছে বাণিজ্য ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার চুক্তির ফলে ভারতের মতন বৃহৎশক্তি তাদের অর্থনীতিতেও ছোবল মারবে। যেমন গ্যাট এবং পরে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা গঠনের মধ্যদিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর নিজের অবস্থা মজবুত করছে। দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশই ভারতকে 'যুক্তরাষ্ট্র' ভেবে বাঁকা চোখে দেখে। এই মানসিক দূরত্বই 'সাপটা'র প্রধান অন্তরায়।[৭] সার্কভূক্ত দেশসমূহের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাংলাদেশ, ভূটান, মালদ্বীপ এ তিনটি দেশের মধ্যে কোন বিশেষ বিষয়ে অন্তঃকোন্দল অনুপস্থিত। যে কারণে এ তিনটি দেশ ইচ্ছে করলেই সার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে।

আঞ্চলিককরণ বাণিজ্য ঘাটতিপূরণ : সাপটা চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। আজকের দুনিয়ায় বেশির ভাগ মানুষ বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য শক্তিশালী আঞ্চলিক ইউনিয়ন গঠনের পক্ষপাতি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ব্যবস্থাকে আঞ্চলিকীকরণের

এই নতুন প্রয়াস বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার ঝুঁকি কমানোয় সফল হয়েছে বলে মনে করা হয়। এরই মধ্যে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটা বিরাট অংশ আঞ্চলিকীকরণ করা হয়েছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (European Union-EU)-এর শতকরা ৭০ ভাগ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরিচালিত হয়। দি নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (NAFTA) এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর মধ্যে দ্রুত বাড়ছে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (European Union-EU) এবং দি নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট NAFTA এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ২১ সদস্যের এশিয়া প্যাসিফিক ইকনমিক কো-অপারেশন (APEC) এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মুক্তখ্যাত ওসাকা নগরীতে বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণে মিলিত হয়। কিভাবে মুক্তবাজার এর লক্ষ্য অর্জন করা যায় তারা সেই নকশা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। এসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান নেশন্স (ASEAN) এর সদস্যরা সাম্প্রতিক এক সভায় এই অঞ্চলে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইকনমিক কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (ECO) এর সাত সদস্য রাষ্ট্রসমূহ পশ্চিম এবং মধ্য এশিয়ায় বাণিজ্য আঞ্চলিকীকরণের জন্য একযোগে কাজ করছে। বর্তমানে পৃথিবীতে উন্নয়ন দৃশ্যপটের দিকে তাকালে বুঝা যায় যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, বস্তুত অত্যাবশ্যক। বিশ্ব জুড়ে বেশ কটি ট্রেডিং ব্লক এবং ইকনমিক গ্রুপিং এর জন্ম এটাই প্রমাণ করে যে, অর্থনৈতিক উদ্বৃতি থাকা (Economic Survival) তথা ক্রমশ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে একটি রাষ্ট্রকে উন্নতির জন্য একা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে কোন সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ধারার সহযোগিতার সংগে সম্পৃক্ত হওয়া বেশি প্রয়োজনীয় এবং অনেক বেশি লাভবান। তাছাড়া বিশ্বায়ন ও অর্থনৈতিক উদারীকরণ এর কারণে বর্তমান বিশ্ব আঞ্চলিক অর্থনীতির সংহতিকরণ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় কৌশলগত অবস্থানের ওপর জোর দিচ্ছে।[৮] ১৯৯৫ সালের ৮ ডিসেম্বর SAPTA কার্যকর হলেও সাপটা চুক্তি অনুযায়ী সার্কভুক্ত দেশসমূহে কোন বাণিজ্য পরিচালিত হচ্ছে না। সাপটার চতুর্থ রাউন্ড বৈঠক ইতোমধ্যে শেষ হলেও এ ব্যাপারে কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভারতের সাথে অন্যান্য সকল সদস্য রাষ্ট্রের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি থাকার কারণে সাপটা বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সার্ক অঞ্চলে কোন বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপনের প্রধান অন্তরায় ভারত ও পাকিস্তানদ্বন্দ্ব। সার্কভুক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পাকিস্তানও ভারতের মধ্যকার বৈরীতা কমিয়ে আনা একান্ত অপরিহার্য। যদি পাকিস্তানও ভারতের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন করা না যায় তবে সাপটা বাস্তবায়ন সম্ভব

নয়। এ অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্যের একটা বাজারও গড়ে উঠবে। একই সাথে সার্কভূক্ত দেশগুলোর যৌথ উদ্যোগে এ অঞ্চলে গড়ে উঠবে শিল্প প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এখানে সমস্যা ভারতকে নিয়ে। ভারত বড় অর্থনীতির দেশ। বড় অর্থনীতি ছোট অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং ছোট দেশগুলোর উপর ভারত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পাকিস্তান এ ব্যাপারে ভারতের কর্তৃত্ব মেনে নিতে চায়না। কারণ সেই পুরনো দ্বন্দ্ব কাশ্মীর ইস্যু। দক্ষিণ এশিয়ার যে সাতটি দেশ নিয়ে সাপটা চুক্তি হয়েছে সেখানে সকল দেশের সমভাবে লাভবান হবার সুযোগ নেই বললেই চলে। কেননা সাতটি দেশের বাণিজ্য কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ভৌগোলিক সীমায় রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। মাথাপিছু জাতীয় আয়, প্রযুক্তিবিদ্যা, পণ্যের গুণগতমান, দাম ও স্থায়িত্বে দেশগুলোর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। সাতটি দেশের পারস্পরিক আন্তবাণিজ্যের চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও তারা একে অপরের উপর নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট। সার্কভূক্ত ৭টি দেশের প্রধান দুটি দেশ ভারত ও পাকিস্তান । ১৯৪৭ সালে উভয়ই বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করলেও কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে উভয় দেশ চির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। বিশাল দারিদ্র জনগোষ্ঠীর দুটি দেশ দারিদ্র বিমোচনের চাইতে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করার চেষ্টায় রত রয়েছে দীর্ঘকাল। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য সার্ক গঠন করা হয় এবং ১৯৯৫ সালে সার্কভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের এবং অবাধ মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল তৈরির লক্ষ্যে সাপটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ২০০৮ সালেও সার্ক তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এর প্রধান কারণ ভারত-পাকিস্তানের কাশ্মীর দ্বন্দ্ব। কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রু ভাবাপন্ন প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর এর প্রভাব পড়েছে সার্ক এর কার্যক্রমের উপর। ফলে ভারত ও পাকিস্তান উভয় তাদের ব্যক্তিগত বা দ্বিপাক্ষীয় সমস্যার বলি হয়েছে সার্ক। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সার্ক ও সাপটা সৃষ্টি হয়েছিল তার সফল বাস্তবায়ন হয়নি। আর তাই সার্ক অর্ন্তভূক্ত তিনটি দেশ বাংলাদেশ, ভূটান ও মালদ্বীপের ভারত ও পাকিস্তান দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে নিজেদের মাঝে পর্যটন, জলবিদ্যুৎ, ট্রানজিট, দক্ষ জনশক্তির শ্রম বাজার উন্মুক্ত করে নিজেদের মধ্যে অগ্রসর হলে তা এক যুগান্তরকারী কার্যকরী পদক্ষেপে পরিণত হবে। 'সাফটা' অর্থনৈতিক জোট গঠন করে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তুলে সাফল্যের মুখ দেখেছে। আজ যদি দক্ষিণ এশিয়ায় অবাধ বাণিজ্য এলাকা বা South Asia Free Trade Area সংক্ষেপে 'সাফটা' গড়ে ওঠে। এটি কার্যকর হলে সাতটি দেশই অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে।[৯]

সাফটা (SAFTA) : সাফটা (SAFTA) হচ্ছে সাপটার সম্প্রসারিত প্রতিফলিত রূপ। দক্ষিণ এশিয়া অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সার্ক পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা সাফটা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ যথা– বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ভূটান, মালদ্বীপ, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা নিজেদের মধ্যকার আঞ্চলিক সহযোগিতাকে জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা করে সার্ক (SAARC)। বিশ্ব অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে সার্কের সদস্যভুক্ত দেশসমূহ এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে SAPTA এবং SAFTA গঠনে সম্মত হয়। প্রত্যাশা করা হচ্ছে পরিবর্তিত বিশ্ব অর্থনৈতিক বাস্তবতায় সাপটা ও সাফটা দক্ষিণ এশিয়ার সার্ক সদস্যভুক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। SAPTA (South Asian Prefential Trade Arrangement) চুক্তিটি ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। চুক্তিতে একদিকে উন্নয়নশীল ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা, অন্যদিকে স্বল্পোন্নত বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপের ক্ষেত্রে পণ্য প্রবেশের শুল্কহার শূন্যে পৌছানোর পর্যায়ক্রমিক ভিন্ন সময়সূচি নির্ধারণ এবং এন্টি ডাম্পিং ব্যবস্থায় রক্ষাকবচের মাধ্যমে চারটি স্বল্পোন্নত দেশের বিষয় সুবিবেচনা করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।[১০] মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে তাল মিলিয়ে চলতে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল উপমহাদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তাবিত সাফটা চুক্তি বাস্তবায়ন একান্ত আবশ্যক। সাফটা বাস্তবায়িত হলে এর সুফল এর সদস্য প্রতিটি রাষ্ট্রই পৌঁছে যাবে। এছাড়া মুক্ত বাজার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামোগত ভিত্তি মজবুত হবে। ১৯৯৭ সালে মালদ্বীপে অনুষ্ঠিত নবম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ২০০২ সালের মধ্যে সাপটাকে সাফটায় রূপান্তর অর্থাৎ সার্ক মুক্ত বাণিজ্য এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়। এ অঙ্গীকারের অর্থ হল পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে সার্কের সাতটি দেশ বিশ্বের অন্যান্য সমৃদ্ধশালী আঞ্চলিক জোট যেমন- আসিয়ান, ইউরোপীয় কমন মার্কেট বা নাফটার এর বাণিজ্যিক লেনদেন, পুঁজি বিনিয়োগ, কাঁচামাল আদান-প্রদান, মুদ্রা ঘাটতি মোকাবিলা করবে ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সংগঠনের মতো সহযোগিতা করবে একে অপরকে। বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সামাজিক শুল্কের ছাড় সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ভারত সাফটাকে বাস্তবায়ন করতে সর্বাধিক আগ্রহ প্রকাশ করে। তবে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো সাপটার আরও সফল বাস্তবায়ন ও সুফল অনুধাবন করতে আগ্রহী। এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গে বৃহৎ দেশগুলোর বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে। বৃহৎ দেশগুলো আমদানি চাহিদা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র দেশসমূহ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানি করেনি। তবে সার্ক আন্তঃসরকার বিশেষজ্ঞ

গ্রুপ (IGEG) একটি সর্বাঙ্গীন সাফটা চুক্তির খসড়া প্রণয়ন করে। খসড়াটিতে সাফটার উত্তরণের ঐক্যসমূহ হল এ অঞ্চলের মধ্যে ট্যারিফ, প্যারা ট্যারিফ, নন-ট্যারিফ ও বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ার মতো অন্যান্য বাধা দূর করা, সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন স্পর্শকাতর পণ্য ও লেনদেন বহির্ভূত রাখার তালিকা শনাক্ত করা এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও স্বার্থ চিহ্নিত করা ও সেগুলোর মোকাবিলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তাছাড়া রাজনৈতিক সমঝোতা বজায় থাকলে সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে ভবিষ্যৎ আঞ্চলিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠাও অসম্ভব নয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলো মূলত একে অপরকে সার্কের আওতায় Most Favoured Nations হিসেবে বিবেচনা করছে।[১১]

সাফটা চুক্তির বাস্তবায়ন এ অঞ্চলের স্বল্পোন্নত দেশের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা : বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণের লক্ষ্যে সার্ক সদস্যভুক্ত দেশগুলোর বিজ্ঞ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে যে গ্রুপ গঠন করা হয়েছে, তারাও অভিমত পোষণ করেছেন যে, ২০০১ সালের মধ্যে সাফটা পরিকল্পনা 'বাস্তবায়নযোগ্য' ছিল না। তারা সাফটা বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন ২০০৮ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে।[১২] তবে সার্ক চেম্বারের নেতৃবৃন্দ দ্রুত সাফটা বাস্তবায়নের পক্ষপাতি। সমস্যা হচ্ছে ভারতকে নিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার মোট জিডিপির ৭৮ দশমিক ২ ভাগ ভারতের বাকি অংশ অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর। তন্মধ্যে বাংলাদেশের অংশ মাত্র ৬ দশমিক ৭ ভাগ। শুল্ক কমিয়ে দেওয়ায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যে ছেয়ে গেছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোর মাঝে স্বল্প উন্নত দেশগুলোর উৎপাদিত পণ্যের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা থাকা উচিত। উপরন্তু দেখা গেছে সাপটা চুক্তিতে বেশ কয়েকটি পণ্যের শুল্ক হ্রাসের কথা বলা হলেও, ভারত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে না। ফলে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি পণ্য ভারতীয় বাজারে প্রবেশ করতে পারছে না। এখানে বলা ভালো, গত দশ বছরে বাংলাদেশে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ১০ গুণ বেড়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতের আমদানি প্রায় বন্ধ। বাংলাদেশ ভারতের ১১তম বৃহত্তম বাজারে পরিণত হয়েছে। তাই সার্কভুক্ত দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের মোট পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি বাংলাদেশের মত বাণিজ্য ঘাটতির দেশগুলোর ঘাটতি দূর করার একটা দৃঢ় আশ্বাস ব্যক্ত করছে। এই ঘাটতি কমানোর জন্য সার্কভূক্ত দেশগুলোকে শুধু ভারতের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর মধ্যে নির্ভরতা বাড়াতে হবে।

বিশ্ব বাজারে বাণিজ্য : বিশ্ব বাজারে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অবস্থান খুব আশাব্যঞ্জক নয়। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো নিজেদের মধ্যেও তেমন বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি।

বিশ্ব বাজারে মোট আমদানী রপ্তানীর অংশ হিসেবে সার্কভুক্ত দেশগুলো নিজেদের মধ্যে মোট রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রায় ০.৮৭% এবং মোট আমদানির ক্ষেত্রে ১.০৯% আমদানী রপ্তানী করে। অন্যদিকে আন্ত:সার্ক বাণিজ্য সাব রিজিওনের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় ৩%, যা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য জোটভুক্ত দেশগুলোর তুলনায় কম। উল্লেখ্য আন্তঃ ইউরোপীয় দেশগুলোতে এ পরিমাণ প্রায় ৬৩% এবং উত্তর আমেরিকা এর পরিমাণ প্রায় ৩৭%। [১৩]

সার্ক ও তিন দেশের বাস্তবতায় সার্কের সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা : পরিশেষে বলা যায় যে, বিগত বছরে সার্ক দেশগুলি সম্পর্ক উন্নয়নের অনেক আলোচনা করলেও হিসাবের অনেক গরমিল রয়ে গেছে। এই সাতটি দেশের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা অনেক ক্ষেত্রেই অলীক ও স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। সম্প্রীতির অভাব, জাতি বিদ্বেষ, হিংসা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সার্ককে অর্থহীন করে তুলছে। পারস্পরিক সহযোগিতার সার্বিক বিকাশই যদি সার্কের সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে থাকে, তবে সেই মানদণ্ডে সার্কের ব্যর্থতাই বেশি করে নজরে আসে। একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে পাক-ভারত সম্পর্ক আজ সংকটের মুখোমুখি। দিল্লীর অষ্টম সার্ক সম্মেলনে পাকিস্তান খোলাখুলি বলেছে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে, অন্যক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি। বিশ্বের মোট অস্ত্র আমদানির শতকরা ১৮ শতাংশই করে ভারত ও পাকিস্তান । ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাফল্য বা আসিয়ানের অনন্য প্রয়াস সার্কের সদস্য দেশগুলোকেও আশাবাদী করেছিল। ১৪১ কোটি ১ লাখের অধিক জনসংখ্যা (বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট-২০০৩) অধ্যুষিত এই দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ৭টি দেশের জন্য সুযোগ ছিল এখনও আছে, একটি সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার। সে আশাবাদ ও স্বপ্ন এখন কার্যত: ভেস্তে যাচ্ছে। সার্কের সবচেয়ে বড় সদস্য দেশ ভারত এমন আঞ্চলিক জোট চায় না যেখানে তার কর্তৃত্ব ক্ষুন্ন হবে। ভারত যে সার্কের নেতা, সেটা সদস্য দেশগুলো স্বাভাবিক ও যৌক্তিকভাবেই মেনে নেয় প্রথম থেকে। আর তাই এখানকার দেশগুলো এখন নিজেদের অর্থনীতির স্বার্থেই বিকল্প খুঁজছে। সার্কের আওতায় গৃহীত সাপটা'র (দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি) প্রতি ভারত গুরুত্ব কম দেওয়ায় এই সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক জোটটি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর তাই কাঠমন্ডুতে যখন গত ৩ ও ৪ জানুয়ারি, ২০০২ সালে ১১তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সাফটা (দক্ষিণ এশীয় অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল) কার্যকর করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তখন অভিজ্ঞজনরা নেহাত এজেন্ডা আলোচনা হিসেবেই একে দেখেছেন। এর কার্যকরী বাস্তবায়ন যে অসম্ভব তাও একরকম নির্ধারিত।

ফলে ভারতের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বাংলাদেশ, ভূটান ও মালদ্বীপ নিজেদের মাঝে বিভিন্ন সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন করে অনেকাংশে স্বনির্ভর হতে পারে।[১৪] ঔপনিবেশিকতার যুগে কর্তৃপক্ষের রেখে যাওয়া আন্তঃরাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক সীমারেখা সুনির্দিষ্ট চিহ্নিত করণের অনুপস্থিতি, দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বন্দ্ব কলহে ইন্ধন যুগিয়ে আসছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভাষা ও বর্ণ, ধর্মীয় ও জাতিগত বিষয় নিয়ে এক রোখা মতবাদ, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরস্পরবিরোধী নীতির কৌশল গ্রহণ এ অঞ্চলে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক বিষিয়ে তুলেছে। কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানসমস্যা, অবিভক্ত পাকিস্তানের সম্পদ ও দায়-দেনার ভাগ-বণ্টন ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে দু'দেশের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ বিদ্যমান।[১৫] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার জন্য ভারতের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হলেও পরবর্তীকালে উভয় দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অভিন্ন নদ-নদীর পানির হিস্যা, তিন বিঘা করিডোর ও দক্ষিণ তালপট্টি সম্পর্কিত বিরোধ, নৌ-সীমানা চিহ্নিতকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বৈষম্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে দু'টি প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে তামিল প্রসঙ্গ নিয়ে তিক্ততা বিদ্যমান।

ঐতিহাসিকভাবে ভারত-নির্ভরশীল ভূটানের সরকার অনেকটা নীরবে দেশের অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে নিজস্ব বুনিয়াদ গড়ে তুলতে সক্রিয়। একই সঙ্গে ভারত ঘেঁসা পররাষ্ট্রনীতির পরিধি অতিক্রম করে ভূটান ক্রমশ বহির্বিশ্বের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতেও আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও ভূটান এই তিনটি দেশকে স্ব-উদ্যোগে এগিয়ে আসতে হবে। স্থলবেষ্ঠিত নেপাল ও ভারতের মধ্যে ট্রানজিট ও বাণিজ্য নিয়ে রেষারেষি ও তিক্ততার রেশ নেপালের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে।

মালদ্বীপে সরকার-বিরোধী বিদ্রোহী দমন ও স্থিতিশীলতার নামে সেই দেশে ভারতের ঝটিকা, সামরিক অভিযান ও হস্তক্ষেপ সু-কৌশলে সাজানো হয়েছিল কিনা সেই বিষয়ে নিয়ে বিতর্ক ও সংশয়ের শেষ নেই। কেননা মালদ্বীপে বিদ্রোহী তৎপরতায় অংশগ্রহণকারী তামিল নাশকতাকারীরা এক সময় ভারতে সামরিক

প্রশিক্ষণ লাভ করে। এরা নাশকতামূলক কাজে ভারতের আশ্রয় ও ইন্ধন লাভ করে।[১৬] প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর ভারতভীতি। এ অবস্থা কাটিয়ে বাংলাদেশ, ভূটান এবং মালদ্বীপকে বের হয়ে আসতে হবে।

বিশ্ব পর্যায়ে ভারত হচ্ছে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের জোর প্রবক্তা, তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মুখ্য উদ্যোগী। অথচ আঞ্চলিক পর্যায়ে ভারতীয় কূটনীতি ও রণনীতির সুর ভিন্ন। এক্ষেত্রে ভারতের ধারণা হচ্ছে "আন্তনির্ভরশীলতা" (Inter-dependence) ভিত্তিক।[১৭] ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অন্য যে কোনো অঞ্চলের চেয়ে দক্ষিণ এশিয়াকে ভিন্নতর বলে মনে হয়। কেননা এ অঞ্চলে একমাত্র কেন্দ্র রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত। আঞ্চলিক নেতৃত্ব লাভে প্রয়াসী রাষ্ট্র হচ্ছে পাকিস্তান। বাংলাদেশ হচ্ছে মাঝারি শক্তি সম্পন্ন, শক্তির দিক থেকে নেপাল ও শ্রীলঙ্কা হচ্ছে ক্ষুদ্রতর দুটি দেশ। অতি ক্ষুদ্র দুটি রাষ্ট্র হচ্ছে ভূটান ও মালদ্বীপ।[১৮] বাংলাদেশ, ভূটান ও নেপাল ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতবন্দি। ভারত বিরোধিতা এইসব দেশের জন্য সহজ বিষয় নয়।[১৯] প্রকৃতি ও পরিবেশ বন্ধন এসব দেশে এতখানি প্রবল যে, জনগণের অনুভূতিকে জয় করার উদ্দেশ্যে এরূপ যুক্তির ও অবতারণা করা যেতে পারে, দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্রতর দেশগুলি প্রকৃতপক্ষে ভারত থেকে বিছিন্ন হয়ে উন্নতি লাভ করা সময় সাপেক্ষ।[২০] দক্ষিণ এশিয়ায় ভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও পরস্পরের বিরুদ্ধে হুমকি প্রকৃতি চেতনা পরিবর্তনকল্পে সচেতন প্রচেষ্টা না করা হলে এ অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে আঞ্চলিকতার অনুকূল ভাবধারা সহজতর হবে না। পরিহার করা যাবে না নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।[২১] তাই আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থায় আরো প্রাণ সঞ্চার করতে হবে, সার্ককে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করতে হবে যাতে এ সংগঠনের সনদে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। এতে আঞ্চলিক সংহতির সাথে হস্তান্তরিত হয় প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা এবং এই সংগঠন যথার্থ সাংবিধানিক কর্তৃত্ব লাভ করে সর্বপ্রকার আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের নিরসনকল্পে, অঞ্চলব্যাপী সহিংসতা নিরসনে কাজ করবে।[২২] এছাড়াও রয়েছে ভারত-পাকিস্তানদ্বন্দ্ব।[২৩] শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ

অবস্থান এবং নেপাল এবং ভূটানের অবস্থান, ইন্দো-পাকিস্তান উত্তেজনা বাংলাদেশ-পাকিস্তানসমস্যা, ভূটানে শরণার্থী সমস্যা, বাংলাদেশে শরনার্থী সমস্যা ইত্যাদি। তবে সার্কের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রসার ঘটিয়ে এসব আঞ্চলিক সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ১৩% দক্ষিণ এশিয়ায় বসবাস করে। বাণিজ্যের জন্য এটি বিশাল সুযোগ।[২৪] তাছাড়া এই অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে এগুলো কাজে লাগানো সম্ভব।[২৫]

দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক একত্রিকরণ এ দেশগুলোর শক্রুভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে সম্ভব হয়ে উঠেনি। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বিশ্বে দুটি পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থে সম্পর্ক স্থাপন নতুন কোন ঘটনা নয়। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো তাদের ঔপনিবেশিক অতীত ভুলে গিয়ে ঔপনিবেশিক শাসকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। চীনের জনগণ প্রয়োজনের তাগিদে জাপানের সাথে যুদ্ধ করেছে আবার প্রয়োজনের তাগিদে তাদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে। কোরিয়া ও চীন অতীতের তিক্ততা ভুলে গিয়ে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছে। আলজেরিয়ার স্বাধীনতার পর ফ্রান্সের সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় পাকিস্তানের সাথে ভারতের একাধিক বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ পাকিস্তানযুদ্ধ সংঘটিত হয়। যার ফলে এসব দেশের মধ্যে এখনও কিছুটা শত্রু ভাবাপন্ন দৃষ্টি বিদ্যমান। সার্ক (SAARC) এর সফলতার জন্য এ দৃষ্টিকোণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রাথমিক আবেগ ও ক্ষোভ কাটিয়ে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। তবেই সার্ক (SAARC) এর সফলতা সম্ভব।[২৬]

অর্থনৈতিক একত্রীকরণ আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতির একটি স্বাতন্ত্র্য ও তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তথ্যপ্রযুক্তি যোগাযোগের উচ্চ অগ্রগতির এ যুগে বাটনের এক ক্লিক -ই আর্থিক লেনদেন (ব্যক্তি উদ্যোগকে বাজার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের অনুমতি), বিদেশী বিনিয়োগের আন্তঃও বহিঃপ্রবাহকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। অর্থনৈতিক একত্রীকরণের অধীনে পুঁজিই নির্ধারণ করে কে, কোথায় ও কিভাবে পণ্য উৎপাদন করবে। একই সঙ্গে এর ওপরই বাজার নির্ভর করে। ব্যাংক, এয়ারলাইনস ও

কর্পোরেশনের হর্তা-কর্তারা আজকের দিনের মেগা -করপোরেশন পরিচালনা করছে ; যা বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে। কিভাবে মুক্তবাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) মাধ্যমে আঞ্চলিক দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে একত্র হয়েছে , তারই জ্বলন্ত উদাহরণ ৮৮টি দেশ নিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গঠন। সর্বপ্রথম এ রকম এফটিএ লক্ষ্য করা যায় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর মধ্যে; যা নাফটা নামে পরিচিত। ৪৫০ মিলিয়ন মানুষের সংযুক্তিসহ নাফটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল সৃষ্টি করেছে, যা ১৭ ট্রিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ পণ্য ও সেবা তৈরি করে। কেন দক্ষিণ এশিয়ায় অর্থনৈতিক একত্রীকরণ ঘটেনি ? এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। এখানে প্রাসঙ্গিক কারণগুলো হলো :

প্রথমত : প্রকৃতিগতভাবে অঞ্চলটি অসম। এর মধ্যে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার অন্য ছয় দেশের সার্বিক আয়তনের তুলনায় বড়।

দ্বিতীয়ত : ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যবর্তী জায়গায় হওয়ায় এবং এর সঙ্গে এই অঞ্চলের সব দেশের সঙ্গে সীমান্ত সংযুক্ততা থাকায় দেশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ভিন্ন হলে তাতে এ অঞ্চলের ইতিহাস অন্য রকম হতো ।

তৃতীয়ত : দক্ষিণ এশিয়া খুবই উত্তেজনাপ্রবণ অঞ্চলে পরিণত হ য়েছে। গত ৫০ বছরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে , এর মধ্যে দুটি কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এবং তৃতীয় যুদ্ধটি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে।

চতুর্থত : দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা অমীমাংসিত কাশ্মীর ইস্যুর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ভারতের সঙ্গে এ ইস্যুর সুষ্ঠু সমাধানে পাকিস্তানের যথেষ্ট ক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। ভারত যতক্ষণ এ ইস্যু সমাধানে তৎপর না হচ্ছে , ততক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তান কেবল অসহায় দর্শক মাত্র। এক্ষেত্রে চলমান বিরোধটি এ অঞ্চলের অর্থনীতি ও স্থিতিশীলতার পরিপন্থী।

পঞ্চমত : দক্ষিণ এশীয় নিরাপত্তা আন্তঃদক্ষিণ এশিয়ামুখী এবং এটি নির্ভর করছে দক্ষিণ এশিয়ায় সার্বিক চীন নীতির ওপর। চীন পাকিস্তানের অস্ত্র সরবরাহ করলে তাতে ভারত বেশ অসন্তুষ্ট হয়। অধিকন্তু ১৯৬২ সালে স্বল্পস্থায়ী চীন -ভারত যুদ্ধের পর থেকে দেশ দুটি ভূখণ্ডগত বিরোধে জড়িয়ে

আছে। এছাড়া ভারতে দালাই লামার উপস্থিতি এবং তার সরকারকে দেশটির পক্ষ থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদান চীনের জন্য সবচেয়ে বিরক্তির কারণ।

ষষ্ঠত : দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষত এর প্রতিরক্ষা খাতে ভারত-চীনের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের প্রভাব আছে। কেননা ভারত যখন চীনের সামরিক শক্তির আলোকে তার নিরাপত্তা সংজ্ঞায়ন করে ; তখন পাকিস্তান ও ভারতের অবস্থানের ওপর তার নিরাপত্তা মূল্যায়ন করে। এটা দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। ভূটান হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ছোট একটি দেশ, আয়তন ৪৬৫০০ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা প্রায় সাত লাখ। দেশটির ৭০ ভাগ এলাকা দুর্গম পাহাড় ও অরণ্যাবৃত। সীমান্তের তিন দিকে ভারত আর এক দিকে হিমালয় পর্বতমালা ও চীনের অবস্থান। দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট এ দেশটি নিয়ে বর্তমান বিশ্বের দুই বৃহৎ পরাশক্তি চীন ও ভারতের মধ্যে চলছে তীব্র লড়াই। এ লড়াই কোনো প্রকাশ্য যুদ্ধ বা অস্ত্র নিয়ে এক পক্ষ অন্য পক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া নয়, অদৃশ্য এ লড়াই, শুধুই কৌশলগত। (ব্রায়ান বেনেডিকটাস একজন মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষক। তিনি পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তা বিষয়ে একথা বলেছেন)। [২৭]

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। এমনিতেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার দীর্ঘমেয়াদি দ্বন্দ্বে প্রত্যাশা অনুযায়ী এগোতে পারেনি সার্ক। কাশ্মীর ইস্যুতে সংস্থাটির ১৯তম সম্মেলন স্থগিত হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার এই আঞ্চলিক জোটটি আরও দুর্বল হয়ে পড়বে বলে কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন। ১৯তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কাশ্মীর নিয়ে সাম্প্রতিক ঘটনায় ভারত কূটনৈতিকভাবে পাকিস্তানকে বর্হিবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পাকিস্থানের কোন রকম উপস্থিতির সুযোগ দিতে চাচ্ছে না ভারত। সার্ক ও পাকিস্তানকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে সঙ্গে নিয়ে বিমসটেকসহ অন্য উপ-আঞ্চলিক জোট গড়ে তোলার দিকেই এখন জোর দিচ্ছে ভারত, পাকিস্তানের সার্ক শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হওয়ার পর এ ধরনেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন ভারতীয় কূটনীতিকরা। একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে নিয়ে ত্রিদেশীয় অর্থনৈতিক কূটনীতি গড়ে তোলার চিন্তাও আছে ভারতের। কিন্তু বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে রয়েছে রোহিঙ্গা সমস্যা। এক্ষেত্রে সার্ককে অকার্যকর করার কথাও ভাবছে ভারত। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বারবার হস্তক্ষেপ করায় পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো ফোরামে আলোচনায় বসতে

চাচ্ছে না বাংলাদেশ। সার্ক দীর্ঘ ৩২ বছরেও একটি কার্যকর সংস্থায় পরিণত হতে পারেনি। ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সার্ক গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম প্রত্যাশা ছিল মানুষে মানুষে যোগাযোগ বৃদ্ধি, সম্প্রীতির প্রসার, দেশগুলোর মধ্যে সামরিক ব্যয় দশ শতাংশ কমিয়ে আনা, সামাজিক অর্থাৎ শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সংস্কৃতি খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, ভিসা-প্রক্রিয়া সহজ করে তোলা, শুধু পুঁজি নয় শ্রমের বাজার উন্মুক্তকরণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ভারসাম্য করা, নদীগুলোকে বহমান রাখা, সাম্প্রদায়িকতা আর ধর্মীয় উগ্রতার বিরুদ্ধে ঐকমত্যে পৌঁছে কার্যকর উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া তেমন কোনো সফলতা দেখাতে পারেনি সংস্থাটি। পাকিস্তানের আপত্তির কারণে সার্কের অনেক সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সময় আটকে গেছে। যেমন সার্ক দেশগুলোর মধ্যে যান চলাচল চুক্তি পাকিস্তানের আপত্তির কারণে হয়নি। পরে পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে সার্কের যান চলাচল চুক্তির ড্রাফটি সামান্য পরিবর্তন করে বাংলাদেশ-ভারত-নেপাল-ভূটান চার দেশীয় যান চলাচল চুক্তি (বিবিআইএন) স্বাক্ষরিত হয়। সার্কের এ ধরনের অনেক সিদ্ধান্তই ভারত- পাকিস্তান রেষারেষির কারণে আর এগোয়নি। সার্কের ১৮তম শীর্ষ সম্মেলন নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনের স্লোগান ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য অধিকতর প্রয়াস ,। ৩৬দফা কাঠমাণ্ডু ঘোষণায় সার্কভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্র পরিচালনার স্তরে স্তরে অর্থাৎ প্রত্যেকটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হলেও আদৌও সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার প্রধানরা কতটুকু বাস্তবায়ন করছেন তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে কাঠমাণ্ডু থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরের শহর ধূলিখেলের অবকাশ কেন্দ্রের "অনানুষ্ঠানিক" আলোচনায় সার্ক নেতারা বিদ্যুৎ চুক্তি স্বাক্ষর করেন । আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বিফল হওয়া সিদ্ধান্তশীর্ষ নেতাদের অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় চূড়ান্ত হওয়ার নজির এই প্রথম। অবকাশ অনুষ্ঠানের অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় শীর্ষ নেতারা তিন মাসের মধ্যে রেল ও মোটরযান চলাচল চুক্তি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে আলোচনায় বসার উদ্যোগের ঘোষণাও দেন, সেটিও আলোর মুখ দেখেনি। ভারতের সাবেক ও বর্তমান কূটনীতিকরা বলছেন সামনের দিনগুলোয় পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে উপ-আঞ্চলিক জোটগুলো শক্তিশালী করতে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ ও ভারত। কাজেই সার্ককে কার্যকর রাখলে পাকিস্তানকেও একঘরে রাখা যাবে। পাশাপাশি বিমসটেকসহ অন্যান্য আঞ্চলিক জোট নিয়ে অগ্রসর হলে পাকিস্তান ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এ ছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের এমন কোনো স্বার্থও নেই যে, পাকিস্তান একঘরে হলে বাংলাদেশের তেমন ক্ষতি হবে। ফলে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড এবং সার্কের অন্য

সদস্যকে নিয়ে বিমসটেককে শক্তিশালী করলে বাংলাদেশের লাভ হবে। আর ভারতও সেটিই চাচ্ছে। কিন্তু মিয়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে জাতিগত বিভেদ।

বাংলাদেশে ভারতের সাবেক হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে বলেন, ‘‘সার্কের কথা ভুলে গিয়ে বাংলাদেশের উচিত আঞ্চলিক জোট বিমসটেকের দিকে নজর দেওয়া। মালদ্বীপকে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি আফগানিস্থানকেও যদি বিমসটেকে নিয়ে আসা হয় অন্তত শুরুর দিকে পর্যবেক্ষক হিসেবে, তাহলে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে একত্র হতে পারে। পাকিস্তানকে বাদ দেওয়া জরুরি বলে উল্লেখ করেন তিনি। কেননা পাকিস্তানকে যোগ করলে ইস্যুগুলো আগের গতিতেই ঘুরতে থাকবে। সমস্যার সমাধান হবে না ”। ভারতের সাবেক এই কূটনীতিক বলেন, ‘‘চাইলে আমরা বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে দ্বি-পাক্ষীয় কিংবা ত্রি-পাক্ষীক সহযোগিতার চিন্তাও করতে পারি ”। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সম্পর্কের টানাপড়েনের দিকে ইঙ্গিত করে পিনাক বলেন, ‘‘সম্পর্কের শুরুতে মিয়ানমারের আগ্রহ আছে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসা উচিত বাংলাদেশের”। ভারতও একই প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি আস্থা বাড়বে বলে জানান তিনি। এ পর্যন্ত দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে চারটি উপ-আঞ্চলিক জোট গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্ক। সার্কের সদস্য দেশগুলো বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ, ভূটান এবং আফগানিস্থান। গণচীন ও জাপান সার্কের পর্যবেক্ষক। আরেকটি জোট হলো বিমসটেক। বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো নিয়ে গঠিত এ জোটের মূল লক্ষ্য মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল ঘোষণা। ১৯৯৭ সালের ৬ জুন বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড ইকোনোমিক কো-অপারেশন (বিসটেক) নামে নতুন উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন হয়। পরে মিয়ানমার, নেপাল ও ভূটান যোগ দিলে ২০০৪ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে নাম পরিবর্তন করে ‘‘বিমসটেক” করা হয়। সার্কভুক্ত চারটি দেশ বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত ও নেপালকে নিয়ে ১৯৯৭ সালের ১৪ মে গড়ে ওঠে ‘‘বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল সংযুক্তি” বা বিবি আইএন নামে আরেকটি জোট। এর উদ্দেশ্য পানির উৎসের সঠিক ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ, সড়কের পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অপর জোটটি হলো দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক (সাসেক)। কৌশলগত বাণিজ্য সম্প্রসারণ রূপরেখার ওপর ভিত্তি করেই এ চুক্তি সই হয়েছে। অবশ্য এ অঞ্চলের বিভিন্ন জোট নিয়ে সম্প্রতি শুরু হওয়া নানা উদ্যোগের ব্যাপারে উদার মনোভাব দেখিয়েছেন দেশের আন্তর্জাতিক

নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক বিশ্লেষক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা। তারা মনে করেন সার্কের দরজা খোলা রাখা উচিত, সার্কের ঘরের দরজা বন্ধ করে এ অঞ্চলের উন্নতি সম্ভব নয়। বরং সার্ক কার্যকর থাকলে বিশ্বের অন্যান্য জোটের চেয়ে এ অঞ্চলের মানুষ অনেক বেশি লাভবান হবে। কিন্তু সার্ক এ পর্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ, অর্থনীতি ও বাণিজ্য কোনো দিকেই সফল হয়নি। এর জন্য পাকিস্তানই নানাভাবে দায়ী। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহিদুজ্জামান বলেন , "ভারত- পাকিস্তান বিরোধের কারণেই সার্ক কাঙ্ক্ষিত গতি পাচ্ছে না। ব্যাপারটি দক্ষিণ এশিয়ার সবাইকে হতাশ করেছে। এই জোটকে সফল করতে হলে সদস্যদের মনোজগতে পরিবর্তন আনতে হবে। সেই সঙ্গে অন্য জোটগুলোকে সচল রাখতে হবে এ অঞ্চলের মানুষের স্বার্থেই"। সাবেক কূটনীতিক শমসের মবিন চৌধুরী বলেন যে, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণে সার্ককে কার্যকর করা ঠিক হবে না বা হওয়া উচিতও নয়, সার্ক থাকতে হবে। ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্বের কারণে সার্ক সম্মেলন স্থগিত হলেও এই দ্বন্দ্ব দেশ দুটির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তবে এটা ঠিক সার্ক হয়তো তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সফল হয়নি। সার্ক সম্মেলন স্থগিত হয়েছে , বাতিল হয়নি। সুবিধামতো সময়ে এটি আবার অনুষ্ঠিত হবে। সার্কের কাজ চলছে। সাফটা হলো সার্কের সব থেকে বড় অর্জন। এ ছাড়া দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত সহজকরণের ক্ষেত্রে সার্কের ভূমিকা অনেক।[২৮] সার্কের এই অবস্থায় যে সার্কভূক্ত দেশগুলো অন্যান্য জোট গঠনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশ, ভূটান ও মালদ্বীপ জোট একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে যা পরবর্তী আলোচনায় উঠে আসবে।

তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মাদ আব্দুল হালিম, ''আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ'", (ঢাকা : প্রফেসরস প্রকাশনী, মার্চ, ১৯৯৯) পৃ-১।

২. মোস্তফা কামাল, ''আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাংলাদেশ ", (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২) পৃপৃ-১৩১-১৩৩

and (Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation, Article 1.) http://www.saarc-sec.org/SAARC-Charter/number of any article/

৩. See for details the SAARC Summit Declaration. (Appendix-2), Appendix-3, Appendix-4, Appendix-5, Appendix-6, Etc.

৪. তারিক হাসান, ''আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী'", (ঢাকা : রাজটীকা প্রকাশনা, সেপ্টেম্বর ২০০৪), পৃপৃ-২৯-৩১।

৫. Ibid

৬. তারেক সামসুর রেহমান, ''বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ", (সাভার : জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭), পৃপৃ-১৪০।

৭. আবুল কালাম,"আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশ তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোন'", (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃপৃঃ ২৮৭-৩১৩।

৮. A Year on the Road to Progress, The Daily Star (23 June 1997),p-7.

৯. Ibid, Mostafa Kamal, pp.131-143. And Abul Kalam,pp.278-313.

১০. See for details the 12th SAARC Summit Declaration.

and http://www.saarc-sec.org/SAARC-Charter/number of any article/

১১. Ibid.

১২. http://www.eximguru.com/exim/trade-agreement/safta-saarc-agreement.aspx

১৩. Ibid.

১৪. Ibid.

১৫. বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, Syed Sirajul Islam, "Bangladesh Pakistan Relation : from conflict to cooperation", in Emajuddin Ahmed (ed.), "Foreign Policy of Bangladesh : A small states Imperative, (Dhaka University Press Ltd. 1984), p.p-58-59.

১৬. আবুল কালাম, "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, দক্ষিণ-এশিয়া ও বাংলাদেশ তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোন", (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯) পৃপৃ-২৪৫-২৪৬।

১৭. Abul Kalam,"Co-operation in South Asia : Regional Studies (Summer 1988)", And Abul Kalam, "South Asia : Regional perspective in a systemic Framework", Asian studies, No. 10, May 1988), P.P 65-66.

১৮. Ati T. Sheikh,"South Asian Regional Co-operation for Peace and Stability", in Hafiz and Ifterkhruzzaman (eds.) Ibid, Page-225, Hamid H. Kizilbus,"Geopolitica Compulsion in the strategy for Peace and Security",Strategic Studies, Vol. Vi, Nos. 2 and 3, 9+ Winter – Spring (1982-1983), P-93.

১৯. ঐ, কামাল -পৃ-২৮২।

২০. Jagat S. Mehta,"Rescuing the Future : Coming to terms with Bequeathed Misperceptions",(Urban Champain ACDIS Library, UIUC- III, 1995), P.P-14-163) (Summary).

২১. Shelton Koditara,"Asymmetry and Commonalities",in Pran chopra and M. Shamsul Hup et al,"Future of South Asia", (Dhaka : The University Press Ltd. 1986), P-127.

২২. Surjit Mansingh,"India's Search for Power : India Gandhi's Foreign Policy 1966-1982",(New Delhi : Sage Publication, 1984), P-273.

২৩. Abul Hasan,"Challenges to SAARC", A paper Presented to regional seminar on "Security of south Asia and future of SAARC", Organized by BIISS, Dhaka on 24 June 2003.

২৪. World Development Report, April 2002.

২৫. "South Asia and the United States: After the cold war", A study mission, New York 1994, The Asia Society, p-26.

২৬. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন,"বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক ১৯৭১-১৯৮১", অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পি. এইচ. ডি,
পৃপৃ- ১২-২৫।

২৭. বণিক বার্তা, ১৪ জুলাই ২০১৪।

২৮. দৈনিক আমাদের সময়, ১০ অক্টোবর ২০১৬।

(বিশদ ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য: From SAPTA to SAPTA: Gravity analysis of south asian free trade, Seekkuwa Wasam Hirantha, Department of commerce, faculty of management studies and commerce, university of Jayewardenepura, Sri Lanka and visiting scholar, school of economics, university of nottingham, United kingdom. This research is financially supported by the association of international education, Japan 2003).

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ সাংস্কৃতিক ও আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক

মালদ্বীপ তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গণ্য হয়।[১] কিন্তু এর ভৌগোলিক গুরুত্ব অপরিসীম। মালদ্বীপ এমন একটি অবস্থানে রয়েছে, যার মাধ্যমে ইউরোপ হতে দক্ষিণ এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার যোগাযোগের কেন্দ্র বলে বিবেচনা করা হয়।[২] মালদ্বীপ ১৯৭৮ সালের ২২ মে মাসে ৩৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে।[৩] মালদ্বীপ ব্যবসার ক্ষেত্রে মূলত শ্রীলঙ্কার ওপর নির্ভরশীল।[৪] স্থানীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যতরী প্রথমত পণ্যসামগ্রী শ্রীলঙ্কায় পরিবহন করে এবং পরবর্তীতে ভারত মহাসাগরের মাধ্যমে অন্যান্য পোতাশ্রয়ে নিয়ে যায়।[৫]প্রতিবেশী দেশ মালদ্বীপের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রয়েছে। বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ উভয় দেশই সার্কের সদস্য। বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যের পরিমাণ খুবই কম। বাংলাদেশ মালদ্বীপে অল্প পরিমাণ রপ্তানি করে থাকে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে মালদ্বীপের সঙ্গে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে।[৬] মালদ্বীপ থেকে বিভিন্ন দ্রব্যাদি আমদানি করা হলেও রপ্তানি নেই বললেই চলে। মালদ্বীপে বাংলাদেশের রপ্তানি দ্রব্য- আলু, প্যাকেটঁজাত চা, মসলা, খনিজ পানি, ইত্যাদি।[৭] ১৯৯৮ সাল মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে বাংলাদেশের আবাসিক মিশন খোলার পর দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে মালদ্বীপ থেকে ৩৮.৬২ মিলিয়ন টাকার আমদানি করলেও এই সময়ে কোনো রপ্তানি হয়নি। এ অচলাবস্থা দূরীকরণে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।[৮] ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে দাবি ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলো হলো ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জাহাজ শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন, প্রতিরক্ষা, সংস্কৃতি খেলাধুলা, মালদ্বীপে অবস্থানকারী বাংলাদেশের শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, শ্রমিকদের মালদ্বীপে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশী শ্রমিকরা মালদ্বীপের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সার্ক নেতারা ভৌগোলিক , সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়া গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মাহমুদ হোনাই এবং চীফ এক্সিকিউটিভ অব মালদ্বীপ সিভিল এভিয়েশন অথোরিটি হুসাইন জালিল এর মধ্যে দুদেশের সরাসরি

বিমান যোগাযোগ চালুর চুক্তি হয়। সাপ্তাহিকভাবে এই বিমান চলবে।[৯] বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প বিকাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে মালদ্বীপের হাইকমিশনার বলেন যে, বাংলাদেশ অবস্থানগতভাবে পর্যটন শিল্পের জন্য অনন্য স্থান। বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত ও সুন্দরবন রয়েছে। এ সব স্থানকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। যা বাংলাদেশের জন্য অনেক সাফল্য বয়ে আনবে, যেমনি এনেছে মালদ্বীপের ক্ষেত্রে। মালদ্বীপের পর্যটন শিল্পের সাফল্য সম্পর্কে বলেন- "স্বল্পোন্নোত দেশ মালদ্বীপের অগ্রগতি নির্ভর করে পর্যটন শিল্পের ওপর। মালদ্বীপে পর্যটন শিল্প শুরু হয় বহু বছর পূর্বে ".[১০] মালদ্বীপ অনেকের কাছেই অপরিচিত ছিল কিন্তু মালদ্বীপ তার নিজস্ব ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে, যা পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তিনি আরো বলেন, "মালদ্বীপ বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি নেওয়া শুরু করেছে। এই জনশক্তি মালদ্বীপে কারখানা, কন্সট্রাকশন ও সেবাখাতসহ সকলক্ষেত্রে কাজ করছে। মালদ্বীপে বর্তমানে কর্মরত বিদেশি কমকর্তাদের মধ্যে বাংলাদেশি হচ্ছে ৬০ শতাংশ"। মালদ্বীপে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দক্ষতার সাথে কাজ করছে বলে উল্লেখ করে ঢাকায় নিযুক্ত মালদ্বীপের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার আহমেদ আদিল বলেন যে, মালদ্বীপের জনসংখ্যা পাঁচ লাখেরও কম, প্রতিবছর ১ মিলিয়ন পর্যটক বেড়াতে আসে ফলে কাজের জন্য মালদ্বীপের অনেক জনশক্তি প্রয়োজন।[১১] জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দুই দেশের উদ্যোগ সম্পর্কে দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপ অন্যতম। ফলে আন্তর্জাতিক ফোরামে দুই দেশ জোরালোভাবে তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারে।[১২] দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ অনেকটাই আমদানি নির্ভর, প্রায় সকল পণ্যই আমদানি করে।[১৩] আমদানি নির্ভর ছোট এ দ্বীপরাষ্ট্রটি বাংলাদেশি পণ্যের বাজার হতে পারে। এরকমই মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মালদ্বীপের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার আহমেদ আদিল, সম্পাদক (জাস্ট নিউজ বিডি.কম) মুশফিকুল ফজল আনসারীকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে। বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের দীর্ঘ ৩৫ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে আহমেদ আদিল বলেন দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মালদ্বীপে বাংলাদেশ মিশন চালু হয় ১৯৮৮ সালে এবং ঢাকায় ২০০৮ সালে। দু'দেশের ঐতিহাসিক যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করে বলেন, উভয় দেশের সহযোগিতার সম্পর্কের অনেক প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে-মালদ্বীপের লোকগল্পে চট্টগ্রামের কথা রয়েছে। মধ্যযুগে বাংলার মুদ্রা হিসেবে যে কড়ি ব্যবহার হত তা মালদ্বীপ হতে আনা হত । এ থেকে ধারণা করা যায় দুদেশের সম্পর্ক কত প্রাচীন। কূটনৈতিক সুসম্পর্ক ও ঐতিহাসিক যোগসূত্র থাকা সত্ত্বেও দুদেশের বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। যার প্রধান কারণ দুদেশের মধ্যে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকা। দু'দেশের মধ্যে সরাসরি শিপিং লিংক তৈরি করার

কথা বলা হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর এবং মালদ্বীপের হিথাদো বন্দর এর মধ্যে সরাসরি শুরু করার কথা আলোচনা করা হয়। যার মাধ্যমে মালদ্বীপ বাংলাদেশ হতে বিশেষ করে শুল্কমুক্ত পণ্য প্রবেশ, খাদ্য সামগ্রী, চা, জনশক্তি, জলবিদ্যুত শক্তি ও নির্মাণ সামগ্রী আমদানী করতে পারবে, যা বর্তমানে থাইল্যান্ড বা ভারত থেকে করা হয়। মালদ্বীপের পর্যটন, জলবিদ্যুৎশক্তি এবং সেদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানানো হয়। মালদ্বীপ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প তৈরিতে সাহায্য করবে এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা প্রকাশ করলে মালদ্বীপ পর্যটনখাতে বিনিয়োগ করতে রাজি আছে।[১৪] দু'দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মালদ্বীপের হাসপাতাল খাতের বিকাশের জন্য বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি রপ্তানি নিয়ে ও আলোচনা করা হয়। ঔষধসহ সকল বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যের শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়ার জন্য এফবিসিসিআই এর সভাপতি মালদ্বীপের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়া উভয় পক্ষই শিক্ষা, ট্যাক্স, পর্যটন, কৃষি খাতে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে সম্মত হন, যা দু'দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদার করবে।[১৫] এর ফলে দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের অগ্রগতি ঘটবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন- আহমেদ আদিল। এছাড়া মালদ্বীপে বাংলাদেশের প্রায় ৪০ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক কাজ করছে। মালদ্বীপ বাংলাদেশ থেকে আরো দক্ষ জনবল নিতে আগ্রহী।[১৬] বিশেষ করে মালদ্বীপ বাংলাদেশ থেকে ডাক্তার, নার্স এবং ঔষধ নিতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ সফররত মালদ্বীপের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আহমেদ জামশেদ মোহাম্মদ। সচিবালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. আ ফ ম রুহুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে এ আগ্রহের কথা জানান তিনি। এসময় মালদ্বীপের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে অগ্রগতির প্রশংসা করে বলেন, "দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দৃঢ় করলে এক দেশ আরেক দেশ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে পারবে।" বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের চ্যালেঞ্জগুলো প্রায় একইরকম উল্লেখ করে তিনি বলেন, "স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। তিনি মালদ্বীপে কর্মরত চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা ও বাংলাদেশে তৈরি ঔষধের প্রশংসা করেন "। ডা. রুহুল হক এসময় বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, "চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সহযোগিতার ফলে দেশের মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে"। তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ঔষধের গ্রহণযোগ্যতার কথা তুলে ধরে বলেন যে, বিশ্বের ৮৭টি দেশে বাংলাদেশের ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে এবং দেশের ৯৭ ভাগ চাহিদা দেশীয় ঔষধ দ্বারা মেটানো সম্ভব হচ্ছে। মালদ্বীপের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের চিকিৎসা ও নার্সিং শিক্ষায় সে দেশ থেকে আরও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির

সুযোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। এসময় স্বাস্থ্য সচিব এম. এম. নিয়াজউদ্দিনসহ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ. কে. এম. আমির হোসেনসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।[১৭] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি হিসেবে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতি স্থাপিত হ য় মালদ্বীপের আদ্দু সিটিতে। একে স্মরণীয় করে রাখতে আদ্দু সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে ১০টি ভাস্ক র্য তৈরির অংশ হিসেবে আদ্দুর হিথাদোতে বাংলাদেশের স্মৃতিসৌধের রেপ্লিকাটি স্থাপন করা হয় যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্মোচন করেন। ইস্পাতের তৈরি ১১৯ কেজি ওজনের রেপ্লিকাটি দৈর্ঘ্যে ৯ ফুট ও প্রস্থে ৪ ফুট। স্থপতি সৈয়দ মনিরুল হোসেনের নকশায় সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের আদলে ইস্পাতের রেপ্লিকাটি তৈরি করেন ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান। তিনি নিজে এজন্য মালদ্বীপে গিয়েছিলেন। স্থপতি হামিদুজ্জামান খান তার শিল্পকর্ম সম্পর্কে বাংলানিউজকে টেলিফোনে বলেন, "হিথাদোতে স্থাপিত রেপ্লিকার নিচে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের স্মৃতি হিসেবে সাভারে স্থাপিত মূল জাতীয় স্মৃতিসৌধের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখা হয়েছে"। তিনি বলেন, "বাংলাদেশেরপ্রথম জাতীয় বিজয় দিবস উদযাপনকালে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাভারে স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এ কথাটিও লেখা রয়েছে"। হামিদুজ্জামান খান আরও বলেন যে, "মূল স্মৃতিসৌধের ৭টি স্তরের বর্ণনাও এতে লেখা রয়েছে"। খুব অল্পসময়ের মধ্যেই এটি তৈরি করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।[১৮] এ আলোচনা থেকে বলা যায় বাংলাদেশের সাথে মালদ্বীপের যোগাযোগ প্রাচীন কাল থেকে শুরু হলেও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সম্পর্কের ঘাটতি রয়েছে, তবে বিগত কয়েক বছর যাবৎ দু'দেশের মধ্যে পর্যটন, স্বাস্থ্য, জনশক্তি রপ্তানি, জলবায়ু নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এগুলো কার্যকর হলে দু'দেশের সম্পর্ক আরও গভীর হবে।

বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ **মধ্যকার বিভিন্ন সাদৃশ্য:** বাংলাদেশের সাথে মালদ্বীপের অনেক মিল আছে। তাই দেশটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয়। তাছাড়া-

- বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ উভয় দেশেরই শক্তিশালী প্রতিবেশি রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত।
- বাংলাদেশ, মালদ্বীপ উভয়ই স্বল্পোন্নত (LDC) দেশ।
- দেশটি বাংলাদেশের মতোই মুসলিম অধ্যুষিত।
- বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ, উভয়ই দক্ষিণ এশীয় দেশ হিসাবে সার্কের সদস্য।
- দুই দেশই আগে ছিল ইউরোপীয় শক্তির (ব্রিটেনের) উপনিবেশ।[১৯]

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ : জলবায়ু বদলে যাচ্ছে বিশ্বে ও বাংলাদেশে। বদলে যাচ্ছে মানুষসহ সব জীবের বাঁচার পরিবেশ। মানুষেরই কৃতকর্মে প্রকৃতি বিরূপ হয়ে উঠছে। বিশ্বের তাপমাত্রা এমনভাবে বাড়ছে যাতে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ ও তাদের বসতি ডুবে যাওয়ার ভয় রয়েছে। বাংলাদেশে সিডর, আইলা, জলাবদ্ধতা, লবনাক্ত ও খরার বাস্তবতায় এটি আর ভবিষ্যতের ভয় নয় বিপদ এখন দোরগোড়ায়। এই পরিস্থিতিতে এখনই যদি সচেতন না হওয়া যায় তাহলে খুব নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ ডুবে যাবে সমুদ্রতলে আর বিশ্ব মানচিত্র থেকে মুছে যাবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র মালদ্বীপের নাম। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মানবসভ্যতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। এর সুদূর প্রসারী প্রভাবের ফলে ঝুঁকির মুখে পড়বে মানুষের বিবিধ মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তা। এসব অধিকার ও নিরাপত্তার মধ্যে মানুষের জীবন ও সম্পদ, খাদ্য, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্য, বসতি, ভূমি, জীবিকার উৎস, কর্মসংস্থান ও তাদের উন্নয়নের অধিকার ও রয়েছে। এসবের ফলে নিকট ভবিষ্যতে বহু মানুষ বাস্তুভিটাচ্যুত হতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো, ব-দ্বীপ অঞ্চল, কিউবা, ফিজি, মালদ্বীপ, মোরিশাস, ত্রিনিদাদের মত দ্বীপ ও স্বল্পোন্নোত দেশগুলোর জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা বাড়বে। তা গ্রাম থেকে শহরে, এমনকি দেশ থেকে দেশে মানুষের স্থানান্তর বৃদ্ধি করবে। এই অভ্যন্তরীণ ও বর্হিদেশীয় স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি করবে নতুন নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা।[২০] সুতরাং বিশ্বের সার্বিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের উচিত পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা। তা না হলে সার্বিক বিশ্বে অস্থিতিশীল পরিবেশের আবির্ভাব হবে যার বিশেষ ভূক্তভোগী হবে বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের মতো দেশগুলি।

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য গ্রীণহাউস গ্যাস গুলো অর্থাৎ কার্বণ ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং ক্লোরোফ্লোরো (CFC) গ্যাস গুলো বিদ্যমান। Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC) কর্তৃক প্রণীত এক রিপোর্টে বলা গ্রীনহাউসের মাত্রা ২০২০ সালের মধ্যে তা ৪০ ভাগ কমিয়ে আনতে হবে।[২১] এখানে আরো বলা হয়, বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বৃদ্ধি পেলে এবং গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ বেশি হলে আবহাওয়া পুরোপুরি অশান্ত হয়ে যাবে।

এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। এর ফলে অসময়ে বৃষ্টি হচ্ছে এবং যেখানে বৃষ্টি হওয়ার কথা নয় সেখানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে, অশান্ত হচ্ছে বঙ্গোপসাগরসহ উপকূল অঞ্চলের আবহাওয়া, বাড়ছে ঘুর্ণিঝড়, বাড়ছে পাহাড়ের বরফগলা। বিজ্ঞানীদের ধারণা এর ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং এতে করে বাংলাদেশের বিপুল অংশ তলিয়ে যাবে। তবে বিশ্ব তামপাত্রা বৃদ্ধির কারণে ধান, গম ইত্যাদির উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এরপর আসছে জীবিকার নিরাপত্তার বিষয়। ইতোমধ্যে দেখা যায়, উপকূলে তিন নম্বর সিগন্যাল ঘন ঘন দেয়া হচ্ছে, অর্থাৎ জেলেদের জীবিকার নিরাপত্তা নেই। এছাড়া ঘুর্ণিঝড়ের তীব্রতা ও গতি অন্যতম চিন্তার কারণ। এর পর এসে যায় খরা এবং অসময়ে বৃষ্টিপাত নিয়ে চিন্তা। এছাড়া নগরীর জলাবদ্ধতা, জমির উর্বরতা হ্রাস, পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় তো আছেই। এবার আসা যাক সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে। যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তাহলে যে উপকূল সুন্দরবনের দক্ষিণে বরগুনা, পাথরঘাটা, আমতলী, ভোলা-নোয়াখালীর উপকূল হয়ে কক্সবাজার চলে গেছে, সেই উপকূল অনেক সামনের দিকে চলে আসবে। এটি হয়তো যশোর হয়ে ফরিদপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুরকে অতিক্রম করে চাঁদপুর, ফেনীর পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে নামবে অর্থাৎ সমুদ্রটি দেশের উপকূলীয় এলাকা কে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।[২২] খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। মাছের উৎপাদন কমে যাবে। উপকূলীয় এলাকায় জৈব বৈচিত্র্য তার, বৈচিত্রতা হারাবে। ধ্বংস হবে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমভাবে গড়ে তোলা উপকূলীয় বনাঞ্চলের গাছ ও পশুপাখি। এদিকে ঢাকায় এক বিজ্ঞানী দাবি করছেন এবং বৃটিশ এক সাংবাদিক বলেছেন, বাংলাদেশ ৭৫ ফুট বা ২৫ মিটার পানির তলায় ডুবে যাবে। তাদের ধারণার মাধ্যমে তারা সমুদ্রটি ময়মনসিংহের দিয়ে নিয়ে গেছেন। যদি ২৫ মিটার পানি বৃদ্ধি পায় তাহলে রংপুরেও পৌছে যাবে সমুদ্র। ইউনেস্কোর প্রতিবেদন মতে , ২০০৭ সালের মধ্যে সমুদ্র স্তরের ৪৫ সেন্টিমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে সুন্দরবনের ৭৫% ডুবে যেতে পারে।[২৩] তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার তাগিদে পরিবেশ দূষণ থেকে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের দূরে থাকা উচিত। তা শুধু নিজে দেশের জন্যই নয় সার্বিক অর্থে সমগ্র বিশ্বের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন ও মালদ্বীপ : জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (UNEP) আর্থিক কার্যক্রম উদ্যোগের সদস্য বীমাকারকদের এক রিপোর্ট বলা হয়েছে, অনেক ঘন ঘন গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় ঘুর্ণিঝড়ের দরুন ক্ষয়ক্ষতি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি হেতু ভূমি তলিয়ে যাওয়া এবং মৎস্য, কৃষিশিল্প এবং পানি সরবরাহে স্বাভাবিকতা হারিয়ে যেতে পারে। এতে আরো বলা হয় মালদ্বীপ, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ও মাইক্রোনেশিয়া ফেডারেশনভূক্ত অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত ক্ষতির পরিমাণ এসবদেশের জাতীয় সম্পদ বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন কমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভারত মহাসাগরের অথৈই জলরাশি অসংখ্যা ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি মালদ্বীপ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। কিছু কিছু দ্বীপ আছে যেখানে কোন যাতায়াত ব্যবস্থা নেই এবং সেসব দ্বীপে এখানো মানুষ বসবাস করে। হাতে গোনা যেসব দ্বীপে মানুষ বসবাস করে সেগুলোর অবস্থাও ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে হিমালয় পর্বতমালার জমাট বরফ গলতে শুরু করবে এবং ভারত মহাসগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে ডুবে যেতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ মালদ্বীপ। হয়ত বিশ্ব মানচিত্র থেকে খুব নিকট ভবিষ্যতে হারিয়ে যেতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দ্বীপ রাষ্ট্রটি। আর এই হারিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয় কোন দেশের প্রত্যক্ষ আক্রমণ নয়, বৃহৎ শক্তির পদানত নয়, অভ্যন্তরীণ গোলযোগও নয়, কেবলমাত্র জলবায়ুর বিরূপ প্রভাবই এজন্য দায়ী। দেশটির সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য প্রতিবেশী দেশ নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয় এবং এদিক থেকে দেশটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কেবলমাত্র বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেই দেশটি ডুবে যাবে পানির নিচে। হয়তো কেবলমাত্র জলবায়ুর কারণে ভৌগোলিকভাবে বিলুপ্ত ঘটবে দেশটির যা স্বাভাবিকভাবে কারো কাম্য হতে পারেনা। ২০০৬ সালে ২৪ ডিসেম্বর মালদ্বীপে সুনামীর ফলে দেশটির জিডিপি ৬২ % কমে যায় ।[২৪] তাই মালদ্বীপ যেন ভবিষ্যতে আর এরকম বড় ধরণের সুনামীর সম্মুখীন না হয় সেদিকে বিশ্ববাসীর সজাগ দৃষ্টি অত্যবশ্যকীয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী ধনী **রাষ্ট্রগুলোর বিলাসিতা :** "পরিবেশ উপনিবেশবাদ নিপাত যাক, বৈশ্বিক উষ্ণতারোধ করো, ডুবে যাওয়ার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো"। এই শ্লোগান নিয়ে বিশ্বের দীর্ঘতম (কক্সবাজার) সমুদ্র সৈকতে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করে মানবাধিকার ও পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন "ট্রি"।[২৫] বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং বাংলাদেশ ও মালদ্বীপসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রের ডুবে যাওয়া এর জন্য দায়ী ধনী রাষ্ট্রগুলোর বিলাসিতা।

ধনী রাষ্ট্রগুলোর অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নি:সরণের কারণে উত্তর মেরুর নিষ্পাপ হিমবাহু বা গ্লেসিয়ার আর টিকে থাকতে পারছে না। আগে শীতকালে গ্লেসিয়ার ছড়িয়ে পড়ত আর গরমকালে ছোট হয়ে আসত। কিন্তু গ্লেসিয়ার সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি কয়েক বছর ধরে নজরে আসতে শুরু করে। এতে উন্নত বিশ্ব একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনের মাধ্যমে জানা যায় যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ উন্নত রাষ্ট্রগুলো এই বিরূপ আবহাওয়া যার জন্য দায়ী এ নিয়ে কোপেনহেগেনের জলবায়ু সম্মেলনে দাবী ওঠে, যুক্তরাষ্ট্র ২০০৫ সালের তুলনায় ২০২০ সাল নাগাদ কার্বন নির্গমণ কমাবে ১৭ শতাংশ এবং চীন ২০০৫ সালের তুলনায় ২০২০ সাল নাগাদ কার্বন নির্গমণ কমাবে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ । ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন মিলিতভাবে যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চীনের কার্বন নিঃসরণ তার চেয়েও তিন-চারগুন বেশি হবে। এদিকে ব্রাজিল তার ইটভাটা গুলো থেকে ধোঁয়ার মাধ্যমে বিশ্ব উষ্ণতা সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে চলেছে।[২৬] সুতরাং আশা করা যায় ধনী রাষ্ট্রগুলো পরিবেশ উপনিবেশবাদ থেকে বের হয়ে আসবে। যার ফলে বৈষ্ণিক উষ্ণতারোধ হবে এবং ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের মতো ব-দ্বীপ বা দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো।

বিশ্বের এই পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ : বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ ও মালদ্বীপসহ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো মোটেই দায়ী নয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে (বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ)স্বল্পোন্নোত দেশগুলোতে। এর প্রতিকার অবশ্যই দরকার।সম্প্রতি কোপেনহেগেন এর সম্মেলনে পৃথিবীর প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ স্লোগান দেয় যে, এই পৃথিবী মুনাফার জন্য নয়। বাসযোগ্য আর কোন পৃথিবীও নেই। গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে এই ধরিত্রীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর এই সুন্দর পৃথিবী রক্ষার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১. বাংলাদেশকে অভিযোজন (অ্যাডাপটেশন) ও কার্বন নিরসনের জন্য তহবিল গঠনের দাবীর পাশাপাশি উন্নত দেশগুলো যাতে কার্বন নির্গমন কম রাখে, সে বিষয়ে সোচ্চার হতে হবে। কার্বন বাণিজ্য ও প্রযুক্তি হস্তান্তর (টেকনোলজি ট্রান্সফার) উপযোগী প্রযুক্তি

গ্রহণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক) জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প ও ভূমিকার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

২. সম্প্রতি মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট, কেবিনেট মন্ত্রীদের নিয়ে সমুদ্রের ৫ মিটার পানির নিচে উন্নত দেশ গুলোর কার্বন নিঃসরনের প্রতিবাদ হিসেবে বৈঠক করেছে। ন্যায়বিচারে প্রত্যাশায় উত্তরের ধনী দেশগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ১৭ হাজার ফুটের বেশি উচ্চতায় এভারেস্টে নেপালের প্রায় ২৪জন মন্ত্রীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। হিমালয় পর্বতমালার বরফ আশঙ্কাজনক হারে গলছে। এর প্রভাব কেবল নেপাল নয় সমগ্র বিশ্বের ওপর পড়বে। ফলে বিশ্ব পরিবেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সুতরাং মালদ্বীপ এবং নেপাল এই সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে সচেতন করে যা বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

৩. ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর জোটের সদস্য সংখ্যা ৪২। কিউবা, ফিজি, মালদ্বীপ, মোরিশাস, ত্রিনিদাদ জলবায়ুর ক্ষতির শিকার হচ্ছে। কোপ-১৫ সম্মেলনে এসে মালদ্বীপ, ভূটান ও ফিজির মতো দেশগুলো শক্ত অবস্থান নিয়েছে। ১৯৯৭ সালের স্বাক্ষর করা কিয়াটো চুক্তিতে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে ২০১২ সালের মধ্যে ১৯৯০ সাল মাত্রার তুলনায় গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ৫ দশমিক ২ শতাংশ কমানোর শর্ত দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এই শর্ত পালন করা হয়নি অভিযোগ করে দ্বীপরাষ্ট্রগুলো কিয়াটো প্রটোকলের চেয়ে কঠোর ও আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন চুক্তির দাবি জানায়।

৪. বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী ক্ষতির ১৫ শতাংশই বাংলাদেশের। এজন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোপেনহেগেনের সম্মেলনে অভিযোজন তহবিলের ৪৫০-৬০০ বিলিয়ন ডলারের ১৫ শতাংশ দাবি করে। সেখানে তিনি বলেন, উষ্ণায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য মোটেই দায়ী নয়।

৫. বিশ্বকার্বন দূষণ রোধ করার জন্য বাংলাদেশের ইট প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো ডেনমার্কের সাথে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ইট প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো হাইব্রিড হোপম্যান কিল্‌ন পদ্ধতিতে ইট প্রস্তুত করবে। এই পদ্ধতিতে

এমনভাবে ইট তৈরি করা হবে যাতে কোন ধোঁয়া বায়ুমণ্ডলে যাবে না এবং ঐ ধোঁয়া আবার কারখানাতেই নরম মাটির ইট শুকাতে ব্যবহার করা হবে।[২৭]

এ অধ্যায়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এ দু'দেশই সার্কের সদস্য, যার ফলে পরস্পরের মধ্যে সহযোগীতার মনোভাব বিদ্যমান। দুটি দেশ-ই জলবায়ুর বৈশ্বিক উষ্ণতারোধে একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। ধনী রাষ্ট্রগুলোর পরিবেশ উপনিবেশবাদ নিপাত যাক এই শ্লোগানে মালদ্বীপ ও ভূটান, বাংলাদেশের সাথে একাত্মতা পোষণ করেছে যা তিনটি দেশকে একই প্লাটফর্মে দাঁড় করিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনসহ আরোও অন্যান্য বিষয়ে এ দুটি দেশের অবস্থান একই সীমারেখায় রয়েছে। যেমন : নিরস্ত্রীকরণ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা প্রভৃতি। মালদ্বীপ দ্বীপরাষ্ট্র হওয়ায় দেশটি মূলত মৎস্যশিল্প ও পর্যটনের ওপরে নির্ভরশীল। মৎস্যশিল্প এবং পর্যটন খাতটি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি যা মালদ্বীপ বাংলাদেশ থেকে আমদানী করতে পারে। দ্বীপরাষ্ট্র মালদ্বীপ আমদানী নির্ভর হওয়ায় দেশটি বাণিজ্যের দিক থেকে বাংলাদেশী রপ্তানি পণ্যের বাজার হতে পারে। পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য কোন প্যাকেজট্যুর প্রোগ্রাম গ্রহণ করলে তা দু'দেশের জন্য যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সমৃদ্ধি বয়ে আনবে তেমনি দু'দেশের আন্তঃসম্পর্ক আরো জোরদার হবে।

বাংলাদেশ ও ভূটান সাংস্কৃতিক ও আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক

ভূটানকে মূলত স্বেচ্ছায় বহুকাল নিজেদের অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তবে ১৯৬১ সালে বিশ্ব ডাক সংস্থার সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে ভূটান বর্হিবিশ্বের সাথে তার যোগাযোগের ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত করেছে।[২৮] ভূটান ১৯৭১ সালের ২১ মে জাতিসংঘ এবং ১৯৭৩ সালে NAM এর সদস্যপদ লাভ করে।[২৯] জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে মাধ্যমে ভূটান আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করছে। পূর্ব হিমালয়ের কোলে অবস্থিত ভূটান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। বাংলাদেশ ও ভূটানের সম্পর্কের সূচনা হয়েছে সেই ১৯৭১ সালেই।[৩০] বাংলাদেশ ও ভূটানের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের প্রতি তাদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি বিদ্যমান ছিল। তৎকালীন ভূটানের রাজা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত ভাবে কলকাতায় যেয়ে সেখানে রিফিউজি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি জানান। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন এবং সাত লক্ষ রুপি সমপরিমান রিলিফ পণ্য প্রদান করেন। সেই সহানুভূতির প্রতিফলন হিসেবে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে ভূটান প্রথম স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি প্রদান করে। যা বাংলাদেশের জন্য তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া টেলিগ্রামটি ছিল।

"On behalf of my Government and myself, I would like to convey to Your Excellency and the Government of Bangladesh that we have great pleasure in recognizing Bangladesh as a sovereign independent country. We are confident that the great and heroic Struggle of the people of Bangladesh to achieve freedom from foreign domination will be crowned with success in the close future. My people and myself pray for the safety of your great leader Skeikh Mujibor Rahman and we hope that God will deliver him safety from the present peril so that he can lead your country and people in the great task of national reconstruction and progress". [৩১]

Jigme dorji wangchuck

King of Bhutan

6 December 1971

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভূটানের সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পর থেকেই বাংলাদেশ ভূটানের সম্পর্ক আন্তর্জাতিকভাবে শুরু হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানীদের পরাজয়ের পর সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশের সাথে ভূটানের সম্পর্কের ভীত রচিত হয়।[৩২] বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভূটান (Foreign Affairs Department) চালু করে। ১৯৭০ সালে এবং (Minisry of Froeign Affairs) চালু করে ১৯৭২ সালে।[৩৩] ভূটান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর, ভূটান বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে । ১৯৭২ সালে উভয় দেশ দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরপর পরই ১৯৭২ সালে ভূটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে এসে দুই দেশের কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দেন। ১৯৭৩ সালে দুই দেশের প্রধানের দিল্লীতে সাক্ষাৎ হয়। তখন দুই দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৩ সালে দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯৭৩ সালের ২৯ এপ্রিল তৎকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে ভূটানের রাষ্ট্রদূত প্রশংসাপত্র প্রদান করে। ভূটানের সাথে অন্যান্য দেশের সম্পর্ক ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩৪] ভূটানের সাথে বিশটি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এর মধ্যে প্রথমদিকে রয়েছে- অষ্ট্রিয়া, বাহরাইন, বাংলাদেশ, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ভারত, জাপান ও মালদ্বীপ। ভূটানের আবাসিক কূটনৈতিক মিশন রয়েছে দিল্লী, ঢাকা, কুয়েত ও ব্যাংককের সাথে। এর মধ্যে বাংলাদেশী এবং মালদ্বীপের অধিবাসীদের ভিসার প্রয়োজন হয় না।[৩৫] ভূটান সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রী লোনটো দাওয়া তিজারিং (Loynto Dawa TYahering) ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে অফিসিয়াল সফরে বাংলাদেশে আসেন এবং বাংলাদেশের তৎকালীন স্থানীয় সরকার ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী শামসুল হক ১৯৭২ সালে ভূটানের প্রস্থানকৃত রাজা জিগমে দর্জি ওয়াং চুক (Sigme Dorji Wang Chuck) এর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভূটান সফর করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে (১-৫) জুন ভূটানের চতুর্থ রাজার রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।[৩৬] ভূটানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ১৯৭৪ সালে ঢাকায় আসেন, তখন দুই দেশের মধ্যে পারস্পারিক উন্নয়নের জন্য ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক সহযোগীতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৭৮ সালে ভূটান বাংলাদেশের সাথে প্রথম (diplomatic Mission) কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করে যা ভারত ব্যাতীত ভূটানের প্রথম সম্পর্ক।[৩৭] যার ফলে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ থেকে

বুড়িমারি-জয়গা-ফুন্টসিলং-থিম্পু বাণিজ্যিক সড়ক নির্মাণ করা হয়।[৩৮] দীর্ঘ সময় ধরে দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী হাইকমিশন বিদ্যমান, কিন্তু ১৯৭৫ সালে শেখ মজিবুর রহমানের মৃত্যু বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা তৈরী করে। এ সময় দুই দেশের সম্পর্ক কিছুটা শিথিল আকার ধারন করে। ১৯৮০ সালে আবার ভূটান ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি হয় এবং ভারত তার ব্যবসার সুবিধার্থে ভূটান ও বাংলাদেশের মধ্যে রেল ও সড়ক পথে ট্রানজিটের জন্য রাজী হয়। বাংলাদেশ ও ভূটানের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক ১৯৭১ সালে শুরু হলেও ব্যবসায়িক চুক্তি ১৯৮০ সালে সম্পাদিত হয়।[৩৯] তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করার জন্য ভারতের ভেতর দিয়ে ভূটানের সাথে ট্রানজিট ব্যবস্থা তখন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালে ভারত একটি চুক্তির মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করে। এর মাধ্যমে ১৯৭৭ সালের চুক্তিটি নবায়ন করা হয়। বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করার জন্য ট্রানজিট নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ১৯৮০ সালে উভয় দেশ নিজ নিজ রাজধানীতে দূতাবাস খোলে। ভূটান ও বাংলাদেশ সরকার তাদের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্ককে মজবুত করার জন্য ভূটান সরকার যেমন বাংলাদেশ সফর করে ঠিক তেমনি বাংলাদেশ সরকার ও ভূটান সফরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে ভূটানের কূটনৈতিক মিশন খোলা হয়। তখন দু'দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ককে বৃদ্ধি করার জন্য একটি ট্রানজিট চুক্তি হয়েছিল, যা পরবর্তীতে নবায়ন না হলেও বর্তমানে এটি নিয়ে জোর প্রচেষ্টা চলছে। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ও ভূটানের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনার পর দু'দেশের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয় যে, দু'দেশের মধ্যে ড্রুক এয়ার (Druk air) নামক বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হবে । ভূটানের একমাত্র বিমানবন্দর পারোতে অবস্থিত।[৪০] ১৯৮২ সালে সিঙ্গাপুর এবং হংকং এ পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক পরামর্শদাতা (Consultants) নিয়োগ করা হয়।[৪১] ১৯৮৪ সালে ভূটানের ৪র্থ রাজা জিগমে সিংগে ওয়ানচুক (Jigme Singye Wang Chuck) বাংলাদেশে আসেন। এ সফর বাংলাদেশ-ভূটান সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করে। জিগমে সিংগে ওয়ানচুক (Jigme Singye Wang Chuck) এই রাষ্ট্রীয় সফরে তিনি বাণিজ্য চুক্তি, ট্রানজিট, দুই রাষ্ট্রের মধ্যে খসড়া চুক্তি (প্রটোকল) এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।[৪২] ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ভারত Memorandum Of Understanding (MOU) চুক্তি হয় যার ফলে বাংলাদেশ ও ভূটানের মধ্যে বাণিজ্য পথ প্রসারিত হয় এবং ভূটান তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যের সুযোগ পায়।[৪৩] ১৯৮৫ সালে ভূটানের সাথে ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড এবং

ইউরোপীয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি (EEC) এর সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক (diplomatic channels) কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হয়। ১৯৮৪ সালে ভূটান চীন সম্পর্ক তৈরি হয়। এর ফলে ভূটানের বহির্বিশ্বের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের পথ সুগম হয়।[৪৪] ১৯৮৫ সালের জুনে রাজা জিগমে সিংগে ওয়ানচুক (Jigme Singye Wangchuck) সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশে আসেন এবং তৎকালীন সাইক্লোন ও দুর্গত মানুষের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সার্ক এর বৈদেশিক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অংশ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভূটান সফর করেন ১৯৮৫ সালে।[৪৫] এরই মধ্যে ১৯৮৫ সালে গঠিত হয় দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। ১৯৮৫ সালের পর থেকে সার্ক এর মাধ্যমে দুটি দেশ বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করে চলেছে যা সার্ক অধ্যায়ের আলোচনায় বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে ।[৪৬] ১৯৮৬ সালে দু'দেশে একমি বিমান চুক্তি সাক্ষরিত হয়। দু'দেশের মধ্যে সাপ্তাহিক ফ্লাইট চালু হয় ।[৪৭] ১৯৮৮ সালে ভূটানে বন্যা হয় তখন বাংলাদেশ সরকার হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ৩ ঘণ্টার সফরে ভূটান যান এবং বন্যাদুর্গতদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। এসময় ভূটান ও বাংলাদেশ বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ন্ত্রণে একযোগে কাজ করে। ১৯৮৯ সালের ২-৪ আগস্ট বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভূটান সফর করেছিলেন সার্ক বৈদেশিক মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের অংশগ্রহণ করার জন্য। ১৯৯০ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী দ্বি-পাক্ষীক বানিজ্যের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য ভূটান সফরে গিয়েছিলেন। তেমনি ১৯৯১ সালের এপ্রিল ভূটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় এসেছিলেন। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে ভূটানের শিল্প মন্ত্রী বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা করার জন্য বাংলাদেশে এসেছিলেন।

এসব দ্বিপাক্ষিক সফরের মাধ্যমে দু'দেশের যোগাযোগ, বাণিজ্য, বিদ্যুৎ, ট্রানজিট নিয়ে আলোচনা হয়। তবে এসব আলোচনা খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়নি। ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে সার্ক সামিটে অংশ গ্রহনের জন্য ভূটানের রাজা বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। সার্কভুক্ত দেশসমূহের কল্যাণকর কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়। ২০০২ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের তৎকালীণ বাণিজ্য সচিব ভূটানের থিম্পুতে গিয়েছিলেন দ্বি-পাক্ষীক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের জন্য।[৪৮] এই অর্থ-বছরে বাংলাদেশ ভূটান থেকে আমদানী করে ৩ .৯২ মি. ডলার এবং বাংলাদেশ ভূটানে

রপ্তানি করে ১.৬৭ মি. ডলার, যা অতি নগন্য।[৪৯] দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৩ সালে ভূটান ও বাংলাদেশ ৫ বছর মেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে।

২০০৪ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ শিল্প একাডেমির একটি সাংস্কৃতিক দল ভূটানের থিম্পু, পারো ও পুনাখাতে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান অংশ গ্রহণ করে, যা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভূটানের কাছে সুন্দরভাবে প্রকাশের পথকে উন্মুক্ত করেছে। ১৩তম সার্ক সামিট এ অংশগ্রহনের জন্য ভূটানের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে এসেছিলেন। ২০০৬ সালের ২১মে বাংলাদেশের কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত সার্ক পর্যটন মন্ত্রীদের আলাচনায় অংশগ্রহণের জন্য ভূটানের পর্যটন মন্ত্রী এসেছিলেন।

২০০৮ সালের ৯ই জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত দারিদ্র্য দূরীকরণ শীর্ষক BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) এর মিটিং এ অংশগ্রহণের জন্য ভূটানের অর্থমন্ত্রী এসেছিলেন বাংলাদেশে। ভূটান, ভারত ও চীনের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য নেপালের মতো বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে । ভূটানের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (FBCCI) এর সাথে বৈঠক করে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।[৫০] ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ভূটান, বাংলাদেশ থেকে ১০.৮ মি. ডলার আমদানি এবং বাংলাদেশ ভূটানে রপ্তানি করে ০.৭৮ মি. ডলার মূল্যের পণ্যসামগ্রী।[৫১] ভূটানের অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী লিয়েনচেন বলেন যে, শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকার তাদের দেশের কৃষকদের দারিদ্র্য উপশম করবে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। এই চুক্তিতে দু'পক্ষই স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের পক্ষে বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খান এবং ভূটানের অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রী লিয়েনচেন এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় ভারতের মধ্য দিয়ে দুদেশের মধ্যে একটি লিংক রোড এর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যা দুদেশের বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য জরুরী। ভূটান মূলত বিদ্যুৎ, এলাচ, জিপসাম, বাঁশ, হস্তশিল্পের উৎপাদিত পণ্য, সিমেন্ট, ফল, মূল্যবান পাথর, প্লাস্টিক, সফটওয়ার, পাউডার, ফলের রস এবং মসলা ইত্যাদি রপ্তানি করে। ভূটানের প্রধান রপ্তানি কারক দেশ হচ্ছে ভারত। ভূটানের মোট রপ্তানির ৫৮.৬ শতাংশ শুধুমাত্র ভারতের নিকট থেকেই অর্জন করে । এছাড়াও ভূটান মোট রপ্তানীর অংশ হিসাবে হংকং থেকে (৩০.১) শতাংশ ও বাংলাদেশ থেকে (৭.৩) শতাংশ অর্জন করে।[৫২] বাংলাদেশ, ভূটানের আপেলের বড় আমদানীকারক। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ, ভূটান থেকে ৮৪২.৬৪৬ ম্যা. আপেল আমদানী করে এবং ২০০৭-২০০৮ সালে ২০,৪২৬.৮৭৩ ম্যাঃ ম্যান্ডাবিন আমদানী করে। ভূটান মূলত আমদানী করে জ্বালানি ও লুব্রিকেন্ট, শস্য, যানবাহন, ফেব্রিক্স, ধান, তৈরি পোশাক, ম্যালামাইন পণ্য, থালাবাসন,

বিস্কুট, চিপস্, নুডলস্, গাড়ির ব্যাটারী, রান্নার তেল ইত্যাদি। এইসব পণ্য ভূটান; ভারত, জাপান ও সুইডেন থেকে আমদানী করে। ভূটান ও বাংলাদেশ মধ্যকার দ্বিপাক্ষীক চুক্তি সম্পাদন এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ছোট ও মাঝারি বিভিন্ন বাণিজ্য খাতে দুই দেশের উদ্যোক্তরা একত্রে কাজ করলে দুই দেশের জন্যই (বাণিজ্যের ক্ষেত্রে) কল্যাণ বয়ে আনবে। বাংলাদেশ ভূটান বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য সবসময়ই ভূটানের পক্ষে ছিল।[৫৩] বাংলাদেশের তৈরি দ্রব্যের রপ্তানির ক্ষেত্রে ভূটানে আরও প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন। দু'দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সচল রয়েছে। ভূটানে বাংলাদেশী পণ্যের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। কিন্তু এরপরেও ভূটানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ভূটানে রপ্তানি করেছে ৩৯.৭৮ মিলিয়ন টাকার পণ্য অথচ আমদানি করেছে ২২০.৮৩ মিলিয়ন টাকার পণ্য। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে ভূটান ১১ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের পাটজাত দ্রব্য, মেলামাইন সামগ্রী, সিরামিক, কনডেন্সড মিল্ক, তৈরি পোশাক, হালকা পানীয়, পটেটো চিপস, বিস্কুট, ঔষধ ও প্রসাধন সামগ্রী আমদানি করে। এই সময় বাংলাদেশ ভূটান থেকে ৫৬ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের ফল, খাদ্যদ্রব্য, মার্বেল, লাইমস্টোন ও ম্যাংগো জুস আমদানি করে। ২০০১-০২ অর্থবছরে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের জন্য ভূটানে বাংলাদেশে রপ্তানির পরিমাণ ১১ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলারে নেমে আসে এবং ভূটান থেকে আমদানির পরিমাণ ও কমে ২৯ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এই বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির মূলে বাংলাদেশের উদ্যেগের অভাব বলে ব্যবসায়ীরা দাবী করছেন। বিরাজমান সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে তথ্য ও উপাত্তের সাহায্যে আলোচনা করা হলো:

Trade and Investment Year	**Improts from Bhutan**	**Export To Bhutan**	**Bala nce**
2004-05	8.59	5.10	3.49
2005-06	12	1.72	11.60
2006-07	10	1.40	8.58
2007-08	13.74	1.35	12.39
2008-09	12	0.61	11.39

Export Promotion Bureau, TCB Bhaban, 1, Kawran Bazar (2nd & 4th Floor),C/A, Dhaka 1215, Bangladesh.[৫৪]

যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে এসে বাংলাদেশ ও ভূটানের বাণিজ্যের পরিমান দাঁড়ায়, আমদানির ক্ষেত্রে USD ২৫ মিলিয়ন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে USD ৩ মিলিয়ন। দুই দেশের সম্পর্ক গতিশীল

অবস্থায় বিদ্যমান, তবে ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সালে এসে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূটানের ৯০টি পন্যের ওপর বাংলাদেশ ট্যারিফ মুক্ত করে দিয়েছে, যা দু'দেশের বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ করবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া বাংলাদেশ ভূটানের মধ্যে যৌথ উদ্যোগে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টনের আলোচনা শুরু হয়েছে। ভূটান ৫০ হাজার মেগাওয়াট এর ও বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম। যা বাংলাদেশে সরবরাহ হলে বাংলাদেশ অনেক উপকৃত হবে। ২০১৪ সালে সার্ক বিদ্যুৎ প্রকল্পকে এই অঞ্চলের কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। স্থলবেষ্টিত ভূটান ট্রান্সসিস্পেট এর জন্য বাংলাদেশের চট্রগ্রাম, মংলা এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর এর মত সৈয়দপুর বিমান বন্দর ও ব্যবহার করবে। এই অঞ্চল ট্রানজিট সুবিধার জন্য এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক এর সহযোগিতায় সার্ক এর অধীনে বাংলাদেশ, ভূটান ও ভারত ট্রানজিট ব্যবস্থা আলোচনাধীন। এ দেশগুলোর মধ্যে কার্গো, যাত্রী যানবাহন যোগাযোগের মাধ্যমে সহজতর করার প্রয়াস চলছে, যা বাংলাদেশ ও ভূটানের সম্পর্ককে আরো গতিময় করে তুলবে। তাছাড়া পূর্বের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাংলদেশের ১৯৮৮ সালে বন্যায় ভূটান বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছে। ২০০৯ সালে ভূটানে ভূমিকম্প হয়,তখন বাংলাদেশ ভূটানকে সহযোগিতা করেছে। ভূটানের রয়েল ভূটানিজ আর্মির জন্য বাংলাদেশ একটি করে বৃত্তি প্রদান করে। ভবিষ্যৎতে দুই দেশের সম্পর্ক আরো জোরদার হবে, যদি সার্ক এবং বিমসটেক (B1MSTEC) এর মাধ্যমে আলোচিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, ট্যারিফ মুক্ত বানিজ্য এবং বানিজ্যের প্রসারের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়।[৫৫] বাংলাদেশে কমলা এবং আপেল খুব জনপ্রিয় কিন্তু বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু এ ফলের জন্য উপযুক্ত না, ফলে বাংলাদেশ ভূটানে এসব ফল উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে পারে এবং প্রজেক্টগুলো পরিচালনার জন্য জনশক্তি বিনিয়োগ করতে পারে। যৌথভাবে ফলের চাষ করে এ দুটি দেশে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে রপ্তানিও করতে পারবে। বাংলাদেশ এবং ভূটানের যৌথ উদ্যোগে পর্যটন ব্যবসা নিয়ে ও আশা রাখা যায়। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, পাহাড়ি জমিতে বেশি ভাল হয়। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে ভূটানে জনশক্তি এবং কৃষিখাতে মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থনীতিতে নতুন দ্বার উন্মোচন করতে পারে। ভূটানের অর্থনীতি দিনদিন বাড়ছে তাই বাংলাদেশের গার্মেন্টস, প্রসাধনী, ঘর সাজানোর বিভিন্ন আসবাবপত্র দিয়ে ভূটানে বাংলাদেশের বাজার তৈরি করা যেতে পারে। বাংলাদেশ ও ভূটান তামাবিল রুট পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারলে দুদেশের মধ্যে সহযোগিতা আরো বৃদ্ধি পাবে। ভূটান ও বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ বিদ্যুৎ উৎপাদন চেষ্টা চলছে। ভারত তার অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ট্রান্সমিশন অনুমতি দিতে সম্মত

হয়েছে। এটি কার্যকর হলে বাংলাদেশ অনেক উপকৃত হবে।[৫৬] উপরের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত দুদেশের সহযোগিতার ক্ষেত্রও সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র সমূহ বর্ণনা করা হল--

ভূটান-বাংলাদেশ সহযোগিতার কিছু ক্ষেত্র : ১৯৭১ সালের পর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে দুটি দেশ একসাথে অনেক ইস্যুতে কাজ করেছে। সেগুলো হলোঃ

ভূটানের সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ প্রদান : ভূটানের সেনাবাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। ভূটানের সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সেবামূলক স্টাফ কোর্স করানো হয় বাংলাদেশের (Defence Service Command) স্টাফ কলেজে। বাংলাদেশে প্রশিক্ষণরত ভূটানের সেনাবাহিনীদের জন্য প্রতিবছর একটি বৃত্তি প্রদান করা হয়।

সাংস্কৃতিক সহযোগিতা : ভূটান ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষীয় সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যা দুই দেশের মধ্যকার সাংস্কৃতিক বিনিময়কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান করেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে : শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ ও ভূটান গুরুত্বপূর্ণ সহযোগীতার দ্বার উন্মোচন করেছে। ভূটানের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে মেডিকেল ও প্রকৌশল বিভাগে লেখাপড়া করছে। এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভূটানের শিক্ষার্থীরা মেডিকেলে শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিক্ষাবৃত্তি লাভ করছে। শিক্ষাবৃত্তির এই সংখ্যা পূর্বে ছিল দুজন বর্তমানে তা বাড়িয়ে চারজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ভূটানের শিক্ষার্থীদের জন্য চারটি আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ভূটানের শিক্ষার্থীদের জন্য বুয়েট (BUET) এ কিছু আসন বরাদ্দ রয়েছে। সার্ক কোটায় এমবিবিএস (MBBS) কোর্সে তাদের জন্য ও সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ রয়েছে।

যোগাযোগ : ভূটান-বাংলাদেশের মধ্যে ড্রাক এয়ার (Druk Air) নামক বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ১৯৮৬ সালের জুন মাসে। এই চুক্তির ফলে ভূটানের ড্রাক বিমান দ্বি-সাপ্তাহিকভাবে (two weekly) ভূটান থেকে বাংলাদেশের যাত্রী নিয়ে আসা যাওয়া করে। এছাড়া ভূটান থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশের সাথে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা চলছে।

বাণিজ্য : ভূটান ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যক সম্পর্ক বিদ্যমান। বিভিন্ন সময়ে ভূটান বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সফর হয়েছে যা সফলতা লাভ করেছে। ভূটান-বাংলাদেশ আমদানী-রপ্তানি প্রবাহ বিদ্যমান যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এর হার অনেক কম । বাংলাদেশ ও ভূটানের মধ্যকার আন্তঃবাণিজ্যের প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরজন্য প্রয়োজন ভারতের সহযোগিতা এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।

ভূটান ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র :

পর্যটন : ভূটানের হিমালাঞ্চলের প্রাণ জুড়ানো দৃশ্য, দেশের সমৃদ্ধ কৃষ্টি এবং বর্হিবিশ্ব হতে তুলনামূলক বিচ্ছিন্নতা ও এর চারদিকের অপূর্ব রহস্যময়তা ভূটানকে একটি শক্তিশালী পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করেছে। অবশ্য সরকার দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং এর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর পর্যটনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হ্রাসের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পর্যটন উন্নয়নের কাজে সতর্কতার সাথে এগিয়েছেন। সরকার দেশের নির্বাচিত এলাকা সমূহে সরকারী খাতের উদ্যোগে শুধুমাত্র গ্রুপ ট্যুরের অনুমতি দিয়েছেন। ভূটান এবং বাংলাদেশের ঢাকার সাথে ড্রাক এয়ার (পারো বিমান বন্দর হতে) এর মাধ্যমে ভারতের কলকাতার সাথে যুক্ত করেছেন, যা বাংলাদেশ ও ভূটানের মধ্যকার পর্যটন শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে যৌথ পর্যটন শিল্প (Tour Package Program) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। রাজকীয় সরকার ড্রাক এয়ার বহরে বৃহদাকার বিমান অন্তর্ভূক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ভূটান বিমান পরিবহন সার্ভিস সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন বিভাগ ও পারো বিমান বন্দর সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জ্বালানী শক্তি : ভূটানের প্রভূত বনজ সম্পদ, জ্বালানীর পর্যাপ্ততাকে সহজলভ্য করেছে। জ্বালানীর কাঠ সর্বপ্রকার অবাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহারের চাহিদা মিটায় এবং দেশের মোট জ্বালানী ব্যবহারের প্রায় ৯০ ভাগ পূরণ করে। পক্ষান্তরে, মাথাপিছু বাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহার অতি অল্প। প্রয়োজনীয় জ্বালানীর শতকরা ১০ ভাগেরও কম। ১৯৮২ সালে বাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহার ছিল এরূপ, কয়লা শতকার ৩৩ ভাগ, পেট্রোলিয়াম শতকরা ৫৭ ভাগ এবং বিদ্যুৎ শতকরা ১০ ভাগ। ১৯৮৪ সালে ১০.৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট জ্বালানী ব্যবহার হয়েছে। ১৯৮৫ সালে বাণিজ্যিক জ্বালানীর বিক্রয় দাড়ায় ১০.৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট। চুখা হাইডেল প্রজেক্টের টারবাইন হতে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। ভূটানের

জলবিদ্যুতের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য। ভূটান পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির অধীনে পল্লীগৃহে পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। ভূটান সরকার পরীক্ষামূলকভাবে সৌর আলোক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভূটান জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করলে দু'দেশই উপকৃত হবে।[৫৭]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয়দেশ একে অপরকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারে। যেমন: জলবিদ্যুত প্রকল্প বাস্তবায়ন।

কৃষি ও পরিবেশ বিজ্ঞান : কৃষি ভিত্তিক ও পরিবেশ বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে ভূটান বাংলাদেশ পারস্পরিক সমঝোতার হাত প্রসারিত করতে পারে। একে অপরের পরিপূরক কৃষি পণ্য উৎপাদন করে দুদেশের খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখতে পারে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

সেনাবাহিনী : রয়েল ভূটান সেনাবাহিনী (The Royal Bhutan Army) নামে ভূটানের সেনাবাহিনী পরিচিত। সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণ স্বেচ্ছামূলক। সেনাবাহিনীতে অংশ গ্রহণের সর্বনিম্ন বয়স আঠারো বছর। তারা ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা প্রশিক্ষিত। ভূটানের এই সেনাবাহিনীর বার্ষিক খরচের পরিমান হল US$ ১৩.৭ মিলিয়ন যা ভূটানের জিডিপি এর ১.৮ শতাংশ। সম্পূর্ণ স্থলবেষ্টিত দেশ ভূটানের কোন নৌবাহিনী নেই। বাংলাদেশ ভূটানের রয়েল ভূটানিজ সেনাবাহিনীর জন্য বাংলাদেশে ডিফেন্স সার্ভিস কমাণ্ড এবং স্টাফ কলেজে একটি কোর্স এবং ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। ছোট হোক বা বড় প্রত্যেকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বয়ংসম্পূর্ণ সেনাবাহিনী থাকা আত্যাবশ্যক। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ভূটানের জন্য সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতার হাত সব সময় বাড়িয়ে দিবে।

বিদ্যুৎ : ভূটান ও বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন চেষ্টা চলছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য : ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দু'দেশ আরো ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। যা দু দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সম্পৃক্ত করবে। বাংলাদেশ ২০০১-২০০২ সালে ভূটানে রপ্তানি করে প্রায় $১.১৮ মিলিয়ন যা নিতান্তই সামান্য এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। বাংলাদেশ ও ভূটানের আন্তঃবাণিজ্য উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ কার্যকর করা উচিত (১) গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের মূসক ছাড় দেওয়া (২) মুক্ত বাণিজ্য এলাকা তৈরি (৩) উদার বাণিজ্যনীতি।[৫৮] যদিও এগুলো সার্ক এর মাধ্যমে কার্যকর হবার কথা।

বাংলাদেশ ও ভূটানের মধ্যকার বিভিন্ন সাদৃশ্য :

- ❖ বাংলাদেশ ও ভূটান উভয় দেশেরই শক্তিশালী প্রতিবেশি রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত।
- ❖ বাংলাদেশ, ভূটান উভয়ই স্বল্পোন্নত (LDC) দেশ।
- ❖ উভয় দেশই সার্কের সদস্য রাষ্ট্র।
- ❖ ১৯৭৩ সালে NAM গঠনে উভয় দেশই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

সার্কের একজন অন্যতম সদস্য হিসেবে ভূটানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সার্ক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এর কার্যক্রমকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে ভূটান। এছাড়াও ভূটান দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সার্ক তার অর্ন্তভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সুতরাং দু'দেশের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[৫৯]

বাংলাদেশের সাথে ভূটানের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ ও বিভন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া :

বাংলাদেশের সাথে ভূটানের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দসহ বিভন্ন মহল। তারা বলেছেন যে, ভূটান আমাদের নিকটতম প্রতিবেশি দেশ হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ৬০ কি মি ট্রানজিটের অভাবে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ভূটান-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক তেমন একটা গতি পায়নি। বিশ্লেষকরা বলছেন যে সম্প্রতি প্রতিবেশি দেশ ভারত, নেপাল ও ভূটানে যাবার জন্য বাংলাদেশকে ট্রানজিট সুবিধা দিতে রাজি হয়েছে। সেই সাথে ভারত বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা চাইছে। এ অবস্থায় বাংলাদেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখেই ভারতের কাছ থেকে ট্রানজিট সুবিধা নিতে হবে। বিশ্লেষকরা বলছেন যে, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা পরিষদ (সার্ক) গঠিত হলেও ত্রিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নেপাল ও ষাট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভূটানের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক উন্নয়ন শুধুমাত্র ভারতের অনমনীয় মনোভাবের কারণে হয়নি। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতা ও ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসি আইয়ের সাবেক সহ-সভাপতি আবুল কাশেম হায়দার রেডিও তেহরানকে বলেন যে, ভারত বাংলাদেশের ২৫টি পণ্য শুল্কমুক্তভাবে তাদের দেশে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেও তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। ভারত এমন এক সময় বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটানে প্রবেশের ট্রানজিট দিতে রাজি হয়েছে যখন বাংলাদেশর ঐ সব দেশে বাণিজ্য করে খুব একটা লাভবান হবার সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে এই ধরনের সুযোগ

প্রদানের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশর কাছ থেকে ট্রানজিট আদায়ের সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও দৈনিক নিউ নেশন পত্রিকার সম্পাদক মোস্তফা কামাল মজুমদার রেডিও তেহরানকে বলেন যে, ভূটানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি অত্যন্ত ভাল উদ্যোগ। নেপাল ও ভূটানে যাওয়ার ট্রানজিটের বিনিময়ে এদেশের ভেতর দিয়ে ভারতকে ট্রানজিট দেবার বিষয়টি বাংলাদেশের জনগণ সহজে মেনে নিবে না। তিনি আর ও বলেন যে, এশিয়ান হাইওয়ের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা বলে বাংলাদেশের কাছ থেকে সুবিধা আদায়ের কৌশল নিয়েছে। তবে এ দেশের নীতি-নির্ধারণী মহলকে দেশের স্বার্থ বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশ এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। একদিকে ভারত ট্রানজিট সুবিধা নিতে চাইছে, অন্যদিকে মার্কিনীরা এ অঞ্চলে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে চাইছে। বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদের ওপর অংশীদারিত্ব নিয়ে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে বিরোধ চলছে। বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যে চলমান রোহিঙ্গা সমস্যা ও রয়েছেই। এ অবস্থায় যে কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। সময় এবং খরচ বাঁচাতে বাংলাদেশের নদীপথ ও স্থলসড়ক ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এদিকের দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশগুলোয় খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নেওয়ার প্রক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদে চালু রাখতে চায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। বর্ষা মৌসুমসহ বছরের বেশিরভাগ সময় ভারতের এ প্রদেশগুলো খাদ্যের সরবরাহ সংকটে থাকে। খাদ্যপণ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি, মালবাহী রেল ইঞ্জিনের অভাবসহ নানা কারণে এই সংকট বিরাজ করে বলে মন্ত্রী জানান। এছাড়া এসব রাজ্যের সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রসহ অন্যান্য রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ঘাটতির মূলে রয়েছে স্থলপথের বৈরী অবস্থা। রাজ্যগুলোর চারপাশ জুড়ে রয়েছে মিয়ানমার, ভূটান, চীন ও বাংলাদেশ। মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত অঞ্চলটি পাহাড়ি হওয়ায় সে দিক দিয়ে পণ্য পরিবহন অত্যন্ত দুরূহ। অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের মধ্যকার বাংলাদেশ রুটটি ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে দেশটির সরকার। বিশেষ করে বর্ষার মৌসুমে বন্যা ও ভূমিধসের কারণে ভারতের মূলভাগের সঙ্গে এ রাজ্যসমূহের সড়কপথ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে ভারী যন্ত্রাংশ কোনো কিছুই সরবরাহ সম্ভব হয় না। ফলে ভারত বহুদিন ধরে বাংলাদেশের কাছে রেলওয়ে, সড়কপথ ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহারে অনুমতি চেয়ে আসছে। খরচ ও সময়ের দিক দিয়ে এটি তাদের জন্য অত্যন্ত লাভজনক হবে। উল্লেখ্য যে নয়াদিল্লি থেকে গোয়াহাটি হয়ে আগরতলার দূরত্ব যেখানে ২৬৩৭ কিলোমিটার আর কলকাতা ১ হাজার ৬৫০ কিলোমিটার সেখানে কলকাতা থেকে বাংলাদেশ হয়ে আগরতলা মাত্র ৩৫০ কিলোমিটারের দূরত্বে। ফলে

বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে পণ্য পরিবহন করতে পারলে ভারতের কেন্দ্রের সঙ্গে এসব রাজ্যের প্রায় সাড়ে ছয়শ' কিলোমিটার দূরত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব। এতে দেশটির অন্যান্য অংশের সঙ্গে রাজ্যগুলোর বাণিজ্যিক ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব। সময় ও খরচ উভয়ই হিসেবেই লাভজনক। বাণিজ্যিক বিচ্ছিন্নতার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষের দূরত্বও কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে দিল্লি। ভূটান বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে নৌপথে ট্রানজিট চাইছে। আর নৌপথে ভূটানকে ট্রানজিট সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে, বাংলাদেশের নদীবন্দরগুলোর সক্ষমতা যাচাইয়ে ভূটানের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে কাজ করছে বাংলাদেশের আট সদস্যের একটি কমিটি। নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান জানিয়েছেন যে, ভূটানের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আন্তঃদেশীয় একটি চুক্তি হওয়ার পর বাংলাদেশের নদীপথ ব্যবহারের আগ্রহ দেখায় ভূটান এবং নৌ পথে ট্রানজিট সুবিধার প্রস্তাব দেয়। বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে কুঁড়িগ্রামের বুড়িমারী স্থলবন্দর হয়ে সড়কপথে এতদিন পণ্য পরিবহন করে আসছে ভূটান। কিন্তু এখন তারা চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে নৌপথে ট্রানজিট সুবিধা চাইছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক, সামাজিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করার মনোভাব নিয়ে ট্রানজিট সুবিধার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে জানান নৌপরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান। তিনি বলেন, "তারা চাইছেন বাংলাদেশের চট্রগ্রাম ও মংলা পোর্ট থেকে আমাদের নদীপথগুলো ব্যবহার করে ভারতের ধুবড়ি পোর্টে তাদের মাল নিয়ে যেতে। ধুবড়ি পোর্ট থেকে ভূটান অনেক কাছে, মূলত আমাদের নদীপথগুলো তারা ব্যবহার করতে চাইছে"। কমিটির একজন সদস্য শেখ মাহফুজ হামিদ জানান, "নারায়ণগঞ্জের পানগাঁও, মাওয়া আর চাঁদপুরে নদী বন্দরগুলোর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতিবেদন দিতে পারবেন বলে তিনি আশা করছেন"। শেখ মাহফুজ হামিদ বলেন যে, তিনটি পয়েন্টে কাজ করছি, আমরা জানি কী করতে হবে না হবে। তবে ভূটানের সঙ্গে দুটো বিষয় আলোচনাধীন, ভূটানের সঙ্গে বাংলাদেশের "আন্তঃবাণিজ্য" ও আরেকটা হলো " ট্রানজিট"। ট্রানজিটটা কনটেইনারে করতে হলে পানগাঁওয়ে নতুন যে বন্দর হচ্ছে ওটা তারা পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করবে। আর যদি বেশি করে কার্গো বহনের জন্য ওরা মংলা বন্দরকে ব্যবহার করে তাহলে ট্রান্সশিপমেন্টের কোন পয়েন্ট তাদের দরকার হবে না। পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্রের কাছেই অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ও পারস্পরিক লেনদেন মৌলিকভাবেই একটি রাজনৈতিক ব্যাপার, তা যেকোনো বিষয়কে ঘিরেই আবর্তিত হোক না কেন। "পররাষ্ট্রনীতি" কথাটার মানে তাই। যখন কোনো দুটি দেশ নিজেদের স্বার্থসংশিষ্ট বিষয় পররাষ্ট্র বিভাগের আলোচনার মাধ্যমে সামাধান করতে এগিয়ে আসে বা

আসার অনিবার্যতা সৃষ্টি হয় তখন সেখানে যে বাণিজ্য বা অপরাপর বিষয় ইতোমধ্যে রাজনৈতিক শর্তের অধীন হয়ে পড়েছে তা স্পষ্ট। তাছাড়াও রাষ্ট্র-সত্তার রাজনৈতিক স্বার্থ ও বিবেচনার স্বতঃসিদ্ধ ভিত্তিই হলো, তার আওতাভুক্ত আর সকল বিষয়কে নিজের অধীন করে নেয়া। মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কোনো প্রয়োজন, সুবিধা বা বিবেচনাই রাজনৈতিক সত্তার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে না। এই বৈশিষ্ট্যসূচক দিকের কারণেই 'বাণিজ্য' বা 'অর্থনীতিক' ইস্যু পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে নিষ্পত্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই শর্ত মেনে নিয়ে দুটি দেশ আলোচনায় বসে, নিরসনের চেষ্টা চালায়। সেটা বাজারের স্বভাবিক প্রক্রিয়ায় নিজস্ব ভারসাম্য আনয়ন কিংবা নিছক অর্থনীতির গণ্ডির মধ্যে আর কোনোভাবেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায় রাষ্ট্রের নীতিগত সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষার মতো গুরুতর বিবেচনার বিষয়। যেখানে জাতীয় আকাঙ্ক্ষা, ঐক্য ও অভিষ্ট অর্জনের সাথে সঙ্গতিপরায়ণ সদূরপ্রসারী কৌশল এবং পরিকল্পনা গ্রহণই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে বিবেচ্য। অভিন্ন জাতীয় অবস্থানের সূচনাই কেবল সাফল্য লাভে প্রয়োজনীয় সেই শক্তি সঞ্চার করতে পারে। বাংলাদেশে কার্যত যা অনুপস্থিত। এই সমূহ বিপদের মধ্যে একটি জাতীয় অবস্থান তৈরির প্রচেষ্টায় ভারতের প্রস্তাবিত ট্রানজিট নিয়ে ধারাবাহিক বিশ্লেষণ অব্যাহত রয়েছে।

নিজের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলায় সামরিক উদ্যোগের পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সহজতর করতে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে ভারত দীর্ঘদিন ধরে বিরামহীন কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে আসছে-সবকয়টি সরকার একইভাবে তৎপর ছিল। বাংলাদেশ এ যাবত সুবিধাটি দেয়নি ভারতকে, এর বিপরীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারের অবস্থান দৃশ্যত ভিন্ন ভিন্ন ছিল। আবার কোনো সরকার এই সুবিধা দিতে আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছেন, উদ্যোগও নিয়েছিলেন, তবে সন্দেহ নাই কোনো ইতিবাচক উদ্যোগই চুড়ান্ত হয়নি এ পর্যন্ত। বাংলাদেশের সরকারের অবস্থান হচ্ছে-" ট্রানজিট" একটি 'অর্থনৈতিক ইস্যু'। তারা বলছেন, এটা নিয়ে যারা রাজনৈতিক বিতর্ক করতে চায় তারা আসলে প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন চায় না, বরং ভোটের সুবিধা আদায়ের জন্য সস্তা রাজনীতির অংশ হিসাবে তারা ট্রানজিট প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়। যখন বাংলাদেশের সরকার ট্রানজিটকে অর্থনৈতিক ইস্যু বলছেন, পাশাপাশি অন্যপক্ষ ভারত তখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লাভের খতিয়ান দাঁড় করাচ্ছেন। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ট্রানজিট সুবিধা দিলে বাংলাদেশ বিরাট অংকের টাকা পাবে। যেমন; পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢুকে প্রতিদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় এক হাজার ট্রাক যাবে। প্রতিটি ট্রাক যদি ট্রানজিট ফি হিসাবে এক

হাজার টাকা দেয় তাহলে বছরে এই টাকার পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৬ কোটি টাকা। এছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ভারত অর্থ বিনিয়োগ করবে। ট্রানজিট সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থান হবে, বাংলাদেশি নাগরিকরা নিয়োগ পাবে। তাছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের সাথে সরাসরি বৈধ বাণিজ্য চালু হবে এবং বাংলাদেশও এর থেকে সুবিধা নিতে পারবে। ঢাকায় নিযুক্ত বিদায়ী ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী বলেছেন, "আমরা ট্রানজিটের ব্যাপারে আগ্রহী। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ট্রানজিট সুবিধা চালু হলে দুই দেশই আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এতে জাতীয় নিরাপত্তা কোনোক্রমে হুমকির মুখে পড়বে না, বরং এর মাধ্যমে উভয় দেশেরই উপকৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সুবিধাগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতির উন্নয়নে তা সময়োপযোগী ভূমিকা রাখবে"। তিনি জানিয়েছিলেন ভারত মনে করে ট্রানজিট একটি নিখাদ অর্থনৈতিক ইস্যু, কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়। কিন্তু বাংলাদেশে কেন এটাকে রাজনৈতিক ইস্যু বানানো হয়েছে তার কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। ঠিক এ অবস্থান নিয়েই বাংলাদেশের সরকার ট্রানজিটের পক্ষে নিজের দেশে জনমত তৈরির চেষ্টা করছেন। ট্রানজিট সুবিধা আদায়ে ভারত তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্যই বাংলাদেশের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখবে। যে সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে ভারতের পক্ষে তা সঙ্গত কারণেই অসম্ভব। আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম যখন দেশটিতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিলো তখন অবশ্য জনমত কোন বিবেচ্য বিষয় ছিল না। প্রথমত, রাষ্ট্রের স্বাধীনতার সশস্ত্র যুদ্ধে ভারতের বিশাল ভূমিকা ছিল। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল ভারতের সমর্থিত বাংলাদেশ সরকারের হাতে-যেখানে আওয়ামী লীগই সরকার গঠন করেছিল-কাজেই বাংলাদেশের জনমত তখনই কোনো আঞ্চলিক সম্পর্কের ধরনের কারণে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে চলে যাবে এমন আশঙ্কা ছিল না। তৃতীয়ত, যেহেতু আনুষ্ঠানিক শাসন কায়েমের সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির বদল ঘটেছিল কাজেই ওই অল্প সময়ে ভারতের পক্ষেও ট্রানজিট সুবিধার মতো একটি দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামোগত সুবিধা আদায় করে নেয়া সম্ভব ছিল না। তার ও পরে দীর্ঘমেয়াদে সামরিক শাসনে ট্রানজিটের বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান পাল্টে যায়। নব্বই এরপরে বিএনপি'র নেতৃত্বে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসলে ট্রানজিট আলোচনা কূটনৈতিক পর্যায়ে নতুনভাবে ওঠে আসে। সরকারের বাইরেও নানা নীতি-নির্ধারণী ফোরাম ও জনপরিসরে নানা মাত্রায় আলোচনা চলে। সরকার দৃশ্যত যেকোন ধরনের আঞ্চলিক সহযোগিতায় আগ্রহের ঘোষণা দেন। পাশাপাশি ট্রানজিট আলোচনার টেবিলে বাংলাদেশ অন্যান্য অমীমাংসিত ইস্যু তুলে আনে। অমীমাংসিত ইস্যুগুলোর

মধ্যে আছে অভিন্ন নদী সমস্যা, সীমান্ত বিরোধ, নেপাল ও ভূটানের সাথে বাংলাদেশের ট্রানজিট সুবিধা, বাণিজ্য ঘাটতি এবং সর্বোপরি নিরাপত্তা। বরাবরই ট্রানজিট সংক্রান্ত আলোচনায় অন্যান্য ইস্যু তুলে আনার বিরোধী ভারত, দেশটি ট্রানজিট টেবিলে বড়জোর বাণিজ্য ঘাটতি প্রসঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী হয়েছে। বাংলাদেশকে জানাচ্ছে- বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে ট্রানজিট ভালো উপায় হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হচ্ছে ক্রমাগত বাড়ন্ত বাণিজ্য ঘাটতি তৈরী হওয়ার কারণ হচ্ছে পণ্য চলাচলে ভারতের বাজার বহির্ভূত নানান প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গৃহীত নীতির অংশ হিসাবে বাংলাদেশের বাজার সম্প্রসারণে ইচ্ছাকৃত বাধা সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি পদ্ধতিগতভাবে বৈরীতার অবস্থান বজায় রেখেছে। সেই নীতির পরিবর্তন করে প্রাথমিকভাবে সদিচ্ছার পরিবেশ তৈরি না করে উল্টো ঘাটতি কমাতে বাংলাদেশকেই উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানী বাড়িয়ে এবং পণ্যের ওপর ধার্যকৃত অশুল্ক বাধা তুলে দিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে হলে ভারতের ইতিবাচক অবস্থান দরকার। বাজারের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় প্রাপ্য সুবিধাটুকু আগে বিনা শর্তে উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। তা না করে একেই এখন রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের হাতিয়ার বানানো হয়েছে। অন্য দিকে ট্রানজিট টেবিলে বসে বাংলাদেশ 'নিরাপত্তা' ইস্যু তোলে ভারতকে কূটনৈতিক 'না' বলার জন্য। অন্য একটি রাষ্ট্রের যান চলাচলের জন্য এত দীর্ঘ একটি পথ উন্মুক্ত করে রাখা পারিপার্শিক বাস্তবতা বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতি যৌক্তিকভাবেই ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে তাতে-সন্দেহ নাই। তাছাড়া তেমন ঝুঁকি নিতে ভারতও প্রস্তুত নয়। "বাংলাদেশ" যখনই "নেপাল-ভূটানে ট্রানজিট" সুবিধা পাওয়ার প্রস্তাব করে, নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারত বরাবরই তা নাকচ করেছে। ভারতকে ষাটের দশকের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে বাংলাদেশ-পাকিস্তান তার পশ্চিম ও পূর্ব অংশের মধ্যে যোগাযোগের স্বার্থে ট্রানজিট চেয়েছিল। সেটাকে তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওয়ারলাল নেহেরু "একটি অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত আব্দার" বলে মস্করা করেছিলেন। বলেছিলেন,"ভারতের নিরাপত্তার প্রতি এমন ট্রানজিট হবে মারাত্মক হুমকি। তাছাড়া ট্রানজিট সামরিক উদ্দেশ্যে যখন ব্যবহৃত হবে তখন উত্তর পূর্বাঞ্চলের সশস্ত্র স্বাধীনতাকামি গোষ্ঠীগুলো শত্রুর তালিকায় ভারতের সাথে বাংলাদেশকেও অন্তর্ভূক্ত করবে"। কাজেই বাংলাদেশ যখন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কথা বলে তখন ভারত 'না' শুনতে পায়। যদি সুবিধাটি দেয়ার প্রশ্নে বাংলাদেশ একমত হয়ে নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলতো তবে তা ভিন্নতরভাবে তোলা হতো। তখন আলোচনা হতো কিভাবে যথাসম্ভব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। অবশ্য একটি রাষ্ট্র নিজের নিরাপত্তা 'যথাসম্ভব' পর্যায়ে রেখে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে । পারস্পরিক আস্থার ঘাটতি ও

মর্যাদার সম্পর্কই যেখানে অনুপস্থিত সেখানে এতবড় নিরাপত্তা ঝুঁকি নিতে কেন বাংলাদেশ প্রস্তুত হবে । এরকম আরো বেশ কিছু প্রসঙ্গ বাংলাদেশের তরফ থেকে তোলা হয়েছে যেগুলো ট্রানজিটকে সম্ভব করে তোলার আলোচনা নয়, বরং উল্টোটা। যেমন বাংলাদেশের যোগাযোগ ও পরিবহন অবকাঠামোর দুর্বলতা। বলা হয়, ভারতকে ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশের রেলপথ ও পরিবহন ব্যবস্থা এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যাপক চাপের মুখে পড়বে। দেশের সড়ক যোগাযোগ এমনিতেই নানা সমস্যায় জর্জরিত। যানবাহনের বর্তমান চাপ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে সবাইকেই। এ অবস্থায় ভারতের ভারি যানবাহন চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, রাস্তা মেরামত ও প্রশস্ত করতে বিশাল অঙ্কের অর্থের পাশাপাশি ফসলি জমিতেও হাত পড়বে। ব্রিজ তৈরি হলে নদীর গতিপথ পাল্টাবে, গভীরতা কমবে। এছাড়া চোরাচালান বৃদ্ধি, মাদকদ্রব্য ও এইডস বিস্তারের ঝুঁকির কথা বলা হয়। দীর্ঘ ট্রানজিট পথের ক্ষেত্রে এমন ঝুঁকি স্বাভাবিক এবং দ্বিপাক্ষিক সমন্বয়ে ঝুঁকি নূন্যতম পর্যায়ে রাখা সম্ভব। একইভাবে যোগাযোগ ও পরিবহন অবকাঠামোর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ট্রানজিট বাড়তি চাপ হবে, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুর্বলতা বাংলাদেশের নিজের প্রয়োজনেই দূর করা দরকার এবং যে বাড়তি চাপ ট্রানজিটের কারণে আসবে, সেক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে প্রধানত ভারতের উদ্যোগ নেয়ার কথা। কিন্তু এটা এমন কোনো সমস্যা নয় যার কারণে ট্রানজিট চূড়ান্তভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। বাংলাদেশে (১৯৯১-৯৬) সাল ও (২০০১-০৬) সালে দুই মেয়াদে বিএনপি সরকার এসব প্রতিবন্ধকতার কথাই অব্যাহতভাবে ট্রানজিট টেবিলে উঠিয়েছে। বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন সরকার যখন এসব বিষয়ে কথা না বলেই তুলনামূলক অনেক বেশি ইতিবাচক অবস্থান নিয়েছে তখন বহু পুরনো ওইসব ইস্যুতে ভারতের অবস্থান জানান দিচ্ছে। বাংলাদেশ যদি ট্রানজিট প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক হিসাব-নিকাশ করতে বসে তাতে করে লাভের ঘরে থাকবে শূন্য। 'শূন্য' লাভের বিনিময়ে আইন-শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, ও অবকাঠামোগত ঝুঁকি সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার মতো রাজনৈতিক ঝুঁকি নেবে বাংলাদেশ-যদি ভারতের 'অর্থনৈতিক' প্রস্তাব গ্রহণ করে। বাংলাদেশের সরকার যদি আলোচনা করে চুক্তিতে নিজেদের অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের কাছে সত্যিকার অর্থেই এটি একটি সফল 'অর্থনৈতিক' ইস্যু হতে পারে, যেমনটি ভারত জোর দিয়ে বলে আসছে। বাস্তবে তা হলো ঠিক বিপরীত, ট্রানজিট ভারতের জন্যও একটি নিরেট রাজনৈতিক ইস্যু। তাহলে একই ইস্যু বাংলাদেশের জন্য অ-রাজনৈতিক হতে পারে না। অবকাঠামো নির্মাণ, অর্থনৈতিক লেনদেন বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ করে কার্যকর উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বলছে ভারত কিন্তু তা না করে সংলগ্ন বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করার প্রস্তাব দিতে পারতো

দেশটি। যাতে করে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে ওই অঞ্চলকে সরবরাহ এলাকা করে সাত-কন্যাকে বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় কার্যকরভাবে, এবং ট্রানজিট ব্যবস্থার চেয়েও কম খরচে। চট্টগ্রাম বন্দর ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের ওপর থাকায়, শুধু সুবিধা ব্যবহারকারী ভোক্তা হিসাবে সাতকন্যার অর্থনৈতিক প্রকল্প ভারতকে অনেক বেশি লাভ এনে দিতে পারতো। কিন্তু এমন প্রস্তাব দেয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব না। একটি কারণ বাংলাদেশ-সাতকন্যা সীমান্তের অর্থনৈতিক জোনের মাধ্যমে সমর সম্ভার সরবরাহ সম্ভব না। তার চেয়ে বড় কারণ হলো- ভারত একটা রাষ্ট্র বটে এবং রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে রাষ্ট্র সবসময়ই রাজনৈতিক ইস্যুতে কাজ করে। সাতকন্যায় উন্নয়নে নির্ধারক উপস্থিতি এবং নিয়ন্ত্রক হিসাবে রাষ্ট্রের হাজিরা অর্থাৎ রাজনৈতিক উপস্থিতি জরুরি। ট্রানজিট সুবিধা ভারতের দরকার মূলত রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার লক্ষ্যে চলমান সামরিক তৎপরতা সহজতর করা এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় শুরু করার জন্য। ভারতের এই দুর্ভাবনা কি অর্থনৈতিক নাকি রাজনৈতিক? এর জবাব রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারত দু'পক্ষের-ই জানা আছে-রাজনৈতিক। সুতরাং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশে নিশ্চয় তার হিসাবে রাখবে যে অন্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দুর্ভাবনা দূর করতে কেবল তখনই অংশীদার হওয়া যায় যখন তা শেষ পর্যন্ত নিজের রাজনৈতিক দুর্ভাবনা বাড়ায় না। ফলে বাংলাদেশের মতো স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রের কাছ থেকে ট্রানজিট সুবিধা পেতে হলে ভারতকে অবশ্যই ইসুটিকে 'রাজনৈতিক' ইস্যু হিসাবে আলোচনার টেবিলে ওঠাতে হবে। বছরের পর বছর ধরে যেসব বিষয় ট্রানজিট-টেবিলে উঠতে দেয়া হয়নি- অভিন্ন নদী সমস্যা, সীমান্ত বিরোধ, নেপালের ও ভূটানের সাথে বাংলাদেশের ট্রানজিট সুবিধা, বাণিজ্য ঘাটতি এবং সর্বোপরি নিরাপত্তা, নিজের স্বার্থ আদায়ে বাংলাদেশকে চাপে রাখার মতো যেসব বিষয় ভারত হাতে আছে- এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতা করতে হবে অর্থাৎ ট্রানজিটের স্বার্থ আদায়ে ওসব বিষয়ে বাংলাদেশকে চাপমুক্ত করতে হবে। তাহলে পরে খুব সম্ভবত বাংলাদেশ সীমিত পরিসরে নিরাপত্তা ঝুঁকির বহনের কথা বিবেচনায় নিতে পারে, যদি নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারত সহযোগিতামূলক ভূমিকা নেয়। অবশ্য সুবিধা আদায়ে অন্য পথও নিতে পারে ভারত। বাংলাদেশ যদি তার রাজনৈতিক হিসাব নিকাশ করতে ব্যর্থ হয় যদি দেশটি 'অর্থনৈতিক ইস্যু'তে ইতিবাচক অবস্থান নিয়ে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তকে ঝুঁকিগ্রস্থ করে তবে ভারত বর্তমান অবস্থান থেকে সরে না এসেও ট্রানজিট সুবিধা নিতে পারে। সেক্ষেত্রে ট্রানজিটের হিসাব-নিকাশ বাংলাদেশ যাতে রাষ্ট্রের জায়গা থেকে রাজনৈতিকভাবে করতে না পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে ভারতকে। উদিয়মান অর্থনৈতিক শক্তি ভারত সেটা অবশ্যই করতে সচেষ্ট থাকবে। বাংলাদেশ তার অভ্যূদয়ের সূচনাপর্ব

থেকেই প্রতিবেশী ভারতকে সততার আস্থায় আনার চেষ্টা করে আসছে এবং ভারতের কাছ থেকেও যুগপৎভাবে সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ প্রাপ্তির মাধ্যমে আশ্বস্ত হতে চেয়েছে। কেবল ঐতিহাসিক কার্যকারণ ও ভৌগোলিক নৈকট্যের জন্যেই নয়, স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতায়, বন্ধুত্বে ও সহযোগিতায় মুক্তমনের মুজিব সরকার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার প্রতিদান হিসেবেও ভারতকে রাষ্ট্রাচারের বৃত্তের বাইরে গিয়ে বিপুল বিনিময় প্রদান করেছেন। কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল তাই স্বাধীনতা-পরবর্তী সাড়ে তিন বছরের আওয়ামী লীগ সরকারের আমলকে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। পর্যবেক্ষক মহল অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে সন্দেহের সাথে প্রশ্ন তুলেছেন যে, ভারতকে এখন যে বন্দর-ট্রানজিট-করিডোর-খনি-বিদ্যুৎ-অবকাঠামোর সুবিধাদি একতরফা শর্তহীনভাবে দেয়া হচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের প্রাপ্তি কতটুকু। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের স্বর্ণযুগে (১৯৭১-'৭৫ সালের ১৫ আগস্ট) ফিরে তাকালে দেখা যাবে যে গঙ্গার ওপর ভারতের ফারাক্কা বাঁধ চালু এবং ভারতকে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য ভূ-খণ্ড বেরুবাড়ি হস্তান্তর করা সত্ত্বেও চুক্তি অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশকে যুগপৎ প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়নি। পাকিস্তান কে 'উচিৎ শিক্ষা' দিতে ভারত গঙ্গার পানি প্রবাহ আটকের লক্ষ্যে ফারাক্কায় যে বাঁধ নির্মাণ করেছিল তা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ফারাক্কা প্রকল্প তারা অব্যাহতই রাখেনি। বরং মুজিব সরকারের বন্ধুসুলভ সরলতার সুযোগে মাত্র কয়েকদিনের জন্য যে ফারাক্কা বাঁধ চালুর অনুমতি আদায় করে নিয়েছিল ভারত তাকেই ফারাক্কা বাঁধ চালু করে গঙ্গার প্রবাহ একতরফা তুলে নেয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এক্ষেত্রে ভারত নৈতিকতা, কূটনৈতিক সততা কিংবা সৎ প্রতিবেশীসুলভ নীতিমালা বাস্তবায়িত না করে মুজিব সরকারকে সরাসরি প্রতারিত করেছে। মুজিব সরকারের আমলেই যখন গঙ্গার পানি নিয়ে আন্তর্জাতিক পানি প্রবাহে বাংলাদেশ তার ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির দাবি উত্থাপন করে তখন ভারতীয় চানক্য কুশলীরা এর নতুন ফ্যাকড়া যুক্ত করে বাংলাদেশের সাথে আর একবার প্রতারণা করেছে। অর্থাৎ ভারত গঙ্গার মূল পানি প্রবাহে বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা অস্বীকার করে গঙ্গার প্রবাহে অন্য নদীর পানিপ্রবাহ যুক্ত করে পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি সাপেক্ষে বাংলাদেশকে পানি দেবার অর্থহীন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের পানি প্রাপ্তিকে শর্তযুক্ত, জটিল ও বিলম্বিত প্রক্রিয়ায় ফেলে দেবার কূটনীতিতে দিল্লী সফল হলো। মুজিব সরকারের সময় সর্বোচ্চ সরকারি পর্যায়ে ১৯৭৪ সালের সীমান্ত চুক্তি (মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি) অনুযায়ী বাংলাদেশ তার ভূ-খণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ বেরুবাড়ির স্বত্ত্ব ত্যাগ করে ভারতকে চিরতরে প্রদান করা সত্ত্বেও চুক্তি অনুযায়ী ভারত তিন যুগেও তিন বিঘা করিডোর বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করেনি। অথচ একই চুক্তি

অনুযায়ী তিন বিঘা করিডোর তাৎক্ষণিক বাংলাদেশকে হস্তান্তর করার অঙ্গীকার করেছে ভারত। দ্বিতীয়ত, ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি বাংলাদেশের পার্লামেন্টে উপস্থাপন করে মুজিব সরকার যা টিফাই করে সাংবিধানিক বৈধতা দিলেও ভারত ঐ চুক্তি তাদের পার্লামেন্টে উত্থাপন করে যা টিফাই করেনি। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এর চেয়ে বড় প্রতারণা দুনিয়ার কূটনীতির ইতিহাসে নেই। রাষ্ট্রের স্থপতি মুজিব-তনয়া শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা ও সততার নিদর্শন হিসেবে ভারত অন্তত ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির সাংবিধানিক বৈধতা দান করে তিন বিঘা করিডোর হস্তান্তর এবং সীমান্ত বিরোধ মীমাংসা করে সৎ প্রতিবেশীসুলভ মানসিকতার পরিচয় দিবে বাংলাদেশে ভারতপন্থী রাজনীতিক বুদ্ধিজীবীদের এমন-ই প্রত্যাশা। বাংলাদেশ সীমান্তের ভূমি দখল এবং সীমান্ত এলাকায় নিরীহ বাংলাদেশীদের ওপর ভারতীয় বিএসএফ আগ্রাসী ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারত যদি নদী প্রবাহের ওপর উজান-ভাটির দেশের পানির প্রাপ্যতার আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করতো এবং বাংলাদেশের প্রতিবেশীসুলভ সদিচ্ছার মূল্য দিত তাহলে দু'দেশের মধ্যে পানিবন্টন নিয়ে কোন সমস্যা হতো না বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ভাটির দেশ হিসেবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতের নদী আগ্রাসনের শিকার। একাধিক দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী প্রবাহের পানি বণ্টনের ন্যায্য চুক্তি সমূহের দিকে লক্ষ্যে করলে দেখা যাবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলারোডো নদীর পানি বণ্টন সমস্যার সমাধান হয়েছে প্রাপ্যতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে। এ নদীটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি রাজ্য অতিক্রম করে ম্যাক্সিকো হয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। নদীর পানি বণ্টন নিয়ে সাতটি রাজ্যের মধ্যে যেমন আন্তঃবিরোধ ছিল তেমনি ম্যাক্সিকোর সাথেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ ছিল। তবে বার্ষিক পানি প্রবাহের পরিমাণ নিরূপণ করে সবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেই এ সংকটের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে ভারত পাকিস্তানের সাথে সিন্ধু নদীর পানি প্রবাহ নিয়ে ভাগাভাগি চুক্তি করেছে। পাকিস্তানের সাথে ভারতের একাধিক যুদ্ধ ও অব্যাহত বৈরীতা সত্ত্বেও ভারত সিন্ধু নদীর পানি চুক্তি লংঘন করছে না। ভারত গঙ্গা ও অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনে প্রতিবেশীসুলভ শুভেচ্ছার পরিচয় দেয়নি যে সদিচ্ছা দেখিয়েছে পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছোট দেশ মেক্সিকোর প্রতি। এদিকে ট্রানজিট নিয়ে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটানের ট্রানজিট ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু নেপাল ও ভূটানের অর্থনীতি যেখানে ভারত নিয়ন্ত্রণ করছে সেখানে এই দুদেশের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীন বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি ভারতের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। ট্রানজিট নিয়ে এত আলোচনার পরও নেপাল ও ভূটানের সাথে বাংলাদেশের ট্রানজিটের বাস্তবে কার্যকারিতা নেই। ইতোপূর্বে ভারতের অসহযোগিতায় বাংলাদেশ নেপালের সাথে বাংলাবান্ধা স্থল

বন্দরকে দ্বি-পাক্ষিক ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করতে পারেনি। এমনকি ভারতীয় ভূ-খণ্ড দ্বারা বেষ্টিত সমুদ্র সংযোগবিহীন দেশ নেপালের সাথে ভারত মাঝে মাঝেই রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে স্থলপথে পণ্য প্রবাহের আদান প্রদানে বাধা দিয়ে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশ জাতীয় নিরাপত্তা, অবকাঠামোর ওপর অধিকার ত্যাগ করে ভারতের বন্দর-ট্রানজিট করিডোর ট্রান্সশিপমেন্ট, জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীডে ভারতের সংযুক্তি ইত্যাদি প্রদানের বিনিময়ে ভারত থেকে কি পাবে তার নির্দিষ্ট কোনো বর্ণনা নেই। বিশেষজ্ঞ মহল অতীত ও বর্তমানের ভারতের নীতি-অবস্থান দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাংলাদেশকে তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাত রাজ্যের করিডোর-হিন্টারল্যান্ড হিসেবে ব্যবহারের এই নীল নকশাকে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব হারানোর আশঙ্কা হিসেবে বিবেচনা করছেন। এর সাথে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতি ও স্বপ্নেরও কোন মিল নেই। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন যে ভারতকে এসব কিছু পেতে হলে বাংলাদেশের প্রতি অতীতের অবিচারসমূহ নিরসন করতে হবে এবং সদিচ্ছার প্রমাণ দিতে হবে। গঙ্গা-তিস্তাসহ সকল অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা দিতে হবে এবং এসব নদীর ওপর একতরফা বাঁধ ভেঙ্গে ফেলতে হবে। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বন্ধুত্ব ও সৎ প্রতিবেশী সুলভ সম্পর্কের মাঝখানে যে অনাস্থার প্রাচীর তোলা হয়েছে তা উপড়ে ফেলতে হবে।[৬০] দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ-ভারত অমীমাংসিত ইস্যু, নেপালের ও ভ ূটানের ট্রানজিট ইস্যু, পাকিস্তানের কাশ্মীর ইস্যু ভারতের বিরুদ্ধে এ দে শগুলোকে একই অবস্থানে দাঁড় করায় । সুতরাং ভারতের প্রয়োজন প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সু-সম্পর্ক ব জায় রাখা ।[৬১] ট্রানজিট আলোচনায় বাংলাদেশ যদি ভারতের পাশাপাশি নেপাল ও ভূটানের সাথে ট্রানজিট প্রস্তাব ফলপ্রসু করতে পারে তবে তা বাংলাদেশ ও ভূটানের সম্পর্ককে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক নতুন গতিময়তা প্রদান করবে।

তথ্যনির্দেশ

১. Peter B. Norton President and Chief Executive Officer, Joseph j. Esposito, "UN, New Encyclopedia Britannica ", Volume-7, Macropedia, (President Publishing, 15th edition, 1968), p-732.

২. ISub-regional Cooperation in South Asia: India, Sri Lanka and Maldives, edited by Venugopal B Menon, Joshy M Paul, Indian Ocean region, e-book.

৩. মোস্তফা কামাল,"আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাংলাদেশ ", (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারী, ২০০২),পৃষ্ঠা-৭৮.

৪. James Lyon, "Maldives" (Lonely Planet Publications Pty Ltd., 2003-10), p-9. ISBN 9781740591768. Retrieved 2011-02-01. And "Maldives travel guide" (online).

৫. James Lyon, "Maldives", (Lonely Planet Publications Pty Ltd.,October 2003), p. 9. ISBN 978-1-74059-176-8.

৬. Ibid.

৭. Verinder Grover, "Asian countries politices & government", Chapter- "Bhutan", (New Delhi : Deep and Deep, 2000), P-661, ISBN-8171009425,
And James Lyon, "Maldives",(Lonely Planet Publications Pty Ltd.,October 2003). p. 9. ISBN 978-1-74059-176-8.

৮. Ibid.

৯. The Daily Star, May 09, 2012.

১০. মালদ্বীপের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার আহমেদ আদিলের দেওয়া সাক্ষাৎকার জুলাই ১৫, ২০১১ (দ্যা ডেইলি স্টার)।

১১. Ibid.

১২. SAARC Summit. (Review) http://www.saarc-sec.org/SAARC-Charter/number of any article/ (online).

১৩. মালদ্বীপের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার আহমেদ আদিলের, সম্পাদক (জাস্ট নিউজ বিডি.কম) মুশফিকুল ফজল আনসারীকে দেয়া এক সাক্ষাতকারের মন্তব্য ।

১৪. মালদ্বীপের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার আহমেদ আদিলের দেওয়া সাক্ষাৎকার জুলাই ১৫, ২০১১ (দ্যা ডেইলি স্টার)।

১৫. Ibid , bangladesh24.com-16 Nov. 2012.

১৬. http://www.bdnews24.com/details.php?cid=2&id=58692.

১৭. সাক্ষাৎকার মাহমদুল হাসান, রিপোর্টার, ভোরের কাগজ,২০১৩।

১৮. The Daily Star, July 15, 2011.

১৯. মোস্তফা কামাল, "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাংলাদেশ", পৃ-৭৮।

২০. সাক্ষাৎকার ঃ জনাথন হারি, ব্রিটিশ সাংবাদিক, দি ইনডিপেন্ডেন্ট অব ব্রিটেন (ওয়েবসাইট)।

২১. **হারুনুর রশিদ, "**জলবায়ু পরিবর্তন : **বিপদে** বাংলাদেশ**", (**ঢাকা : পার্ল পাবলিকেশন্স, সাল জানা নেই), পৃ- **১৫৮।**

২২. সাগর সরওয়ার (২৪ নভেম্বর , ২০০৯। আব্দুল্লাহ আল-ফারুক , সম্পাদক। "জলবায়ু পরিবর্তন , আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই দূর করতে হবে"। জার্মানী : ডয়েচ ভেলে। সংগৃহীত জুন ৩ , ২০১০। ইফতেখার মাহমুদ (২৩ এপ্রিল, ২০১০)। "জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে বিজ্ঞানীদের নতুন তথ্য : বাংলাদেশ ডুববে না"। ঢাকা : দৈনিক প্রথম আলো। সংগৃহীত জুন ৫, ২০১০।

২৩. "Case Studies on Climate Change and World Heritage", UNESCO, 2007

২৪. Ministry of Foreign Affiars, Male, Maldives. (Official website).

২৫. মানবাধিকার ও পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন 'ট্রি' এর মতানুসারে (অফিসিয়াল ওয়েবসাইট)।

২৬. প্রথম আলো, ২৭-১১-২০০৯ এবং ১০-১২-২০০৯।
ভোরের কাগজ, ২৩-১২-২০০৯ ।

২৭. লেখক মন্তব্য : অধ্যাপক , ভূ-বিজ্ঞান বিভাগ , লক হ্যাভেন ইউনিভার্সিটি , পেনসিলভানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র,। mkhalequ@lhup.edu
And Bangladesh climate change strategy and action plan and ministry of foreign affiars, Male, Maldives, (Official website).

২৮. "বিশ্ব ডাক সংস্থা" (ওয়েবসাইট)।

২৯. Bhutan Country study guide, Volume-1, Strategic Information and developments, P. 139 and Rahimullah Yusufzai, P-22.

৩০. মোস্তফা কামাল, "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাংলাদেশ", (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা, ২০০২), পৃ-৭৮।

৩১. http: bd news 24.com/bangladesh/2014/12/06/ bhutan pm -hand –over –message –of- recognization.

৩২. ঐ, পৃষ্ঠা-৭৮।

৩৩. Rose Leo E, “The Politics of Bhutun”, (Cornell University Press ,1977), P.P- 90-91.

৩৪. Ihtesham Kazi, “International Affairs : Global Concerns of the 21st century”, (New Delhi : Pip International Publication-2008), p-116.

৩৫. Ibid.

৩৬. Ibid.

৩৭. kohli Marnorama, “Bhutan’s strategic Environment Changing perception”, Article, Indian article quarterly, vol 42, no 2, 1986, pp. 15, 151.

৩৮. Economic and Political Relations Between Bangladesh and Neighboring Countries, p-35), PDF Book (online).

৩৯. Joint Research Program Series No:132, Sub-Regoinoal Relation in the Eastern South Asia : With Special Focus on Bangladesh and Bhutan, Institute of Develpoing Economies, IDE-JETRO, ed. March 2014, P-162-163.

৪০. Ibid.

৪১. Kohli Manorama, p-151.

৪২. Ibid.

৪৩. Economic and Political Relations Between Bangladesh and Neighboring Countries, p-40(PDF online Book).

৪৪. Kohli Manorama , p-151.

৪৫. Ibid.

৪৬. Rahimullah Yusufzai, P-33. And kohli Marnorama, “Bhutan’s strategic Environment Changing perception”, p. 15

৪৭. Ibid.

৪৮. SAARC Summit from 1985 to 2008,
And http://www.saarc-sec.org/data/summit/country.htm.

৪৯. Ibid.

৫০. Ibid.

৫১. Ibid.

৫২. CIA World Factbook Bhutan, 2007-2008, 2009-2010 (Website).

৫৩. তথ্যসংগ্রহ ঃ তথ্য কেন্দ্র, বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভূটান বাংলাদেশ দূতাবাস, National Portal of Bhutan.

৫৪. Tourism Council of Bhutan, Official govt. (Official website).

And Hindusthan Times , 18 December 2013.

And Times of Assam, Thursday December 19, 2012.

প্রেস বিবৃতি বাংলাদেশ ভূটান ফরেন অফিস আলোচনা, ঢাকা, বাংলাদেশ।

http://www.jugantor.com/current news/2013/08/05/18651#sthash.oEpkJwnn.dpuf

৫৫. Bangladesh, Butan, India, Nepal, sign motor vehicles agreement "netIndian", in netIndian news , network Retrieved 2 July 2015.

Entrepreneurship lacks keeps untapped Bangladesh Bhutan trade prospects. Ittefaq-The nation 28 april, 2010 retrieved 25 September 2010.

Narandra Kr. Singh, "Encyclopaedia of Bangladesh", (Anmol Publications Pvt. Ltd., 2003). P.P-151-156-ISBN 978- 81-261-1390-3.

৫৬. Tourism Council of Bhutan, Official govt. (website).

And Hindusthan Times , 18 December 2013.

And Times of Assam, Thursday December 19, 2012. প্রেস বিবৃতি বাংলাদেশ ভূটান ফরেন অফিস আলোচনা, ঢাকা, বাংলাদেশ। And

http://www.jugantor.com/currentnews/2013/08/05/18651#sthash.oEpkJwnn.dpuf

৫৭. দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৮৭।

৫৮. Ibid.

৫৯. Ibid.

৬০. নেছার আমিন , ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স করেসপন্ডেন্ট, ২৭ ডিসেম্বর ২০০৯, ধারাবাহিক উপস্থাপনার সারমর্ম।

Nasar1000@gmail.com.

www.chintaa.com/index.php/chinta/showArchive2/61/bangla

৬১. Roop Singh Baraith,"Transit politics in south Asia", (Jaipur : Alekh Publications, 1989), p.p-182-183.

মালদ্বীপ ও ভূটান সাংস্কৃতিক ও আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্ক

মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ রাষ্ট্র। অপরদিকে ভূটান পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে স্থলবেষ্টিত একটি দেশ। ১৯৪৭ সালে ভূটান স্বাধীন হলেও ভারত চুক্তি ১৯৪৭ সালে ভূটান স্বাক্ষর করে ভূটান ভারতের কাছ থেকে বৈদেশিক সম্পর্কে ব্যাপারে প্রথম নির্দেশনা নেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়। এরপর বহুবছর ভূটান নিজেকে বর্হিবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। ১৯৬১ সালে বিশ্ব ডাক সংস্থার সদস্য পদ লাভের মাধ্যমে ভূটান বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে। অপরদিকে মালদ্বীপ ১৯৬৮ সালে গণপ্রজাতান্তিক দেশ হিসেবে অবির্ভূত হলেও ভারত ও মালদ্বীপের কুটনৈতিক সম্পর্ক শুরু হয় ১৯৮৪ সাল ২০ জুলাই। ভূটানে মালদ্বীপের বা মালদ্বীপে ভূটানের দূতাবাস নেই। বাংলাদেশে অবস্থানরত ভূটানের রাষ্ট্রদূত মালদ্বীপের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে এবং শ্রীলঙ্কায় অবস্থানরত মালদ্বীপের রাষ্ট্রদূত ভূটানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করে। সুতরাং বলা চলে ভূটান ও মালদ্বীপের সম্পকর্কে এ বিষয়টি সীমাবদ্ধতায় রূপান্তিত করেছে। তাছাড়া ভূটানের অর্থনীতি অধ্যায়ে রচিত বিষয় লক্ষ্য করলে দেখা যায় ভূটানের অর্থনীতি ভারতের ওপর এবং মালদ্বীপের অর্থনীতি অধ্যায়ের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মালদ্বীপের অর্থনীতি মূলত শ্রীলঙ্কার ওপর নির্ভরশীল। শ্রীলঙ্কা ব্যতীত ভারতের সাথেও মালদ্বীপের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। মালদ্বীপের অর্থনীতি মৎস্য ও পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় মালদ্বীপের অর্থনীতি কিছুটা অসম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ভূটান, মালদ্বীপ সম্পর্ক বিশ্লেষন করলে দেখা যায় দু'দশের মধ্যে সৌজন্যমূলক সু-সম্পর্ক বিদ্যমান। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোঃ আব্দুল গাইয়ূম ভূটান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে দু'দেশের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া দুই দেশের মধ্যে ভিসাহীন যোগাযোগ সম্পর্ক তৈরী হয়। পরস্পরের সহযোগিতায় কারিগরী বিষয়ে শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে ভূটান মালদ্বীপের সাতজন নার্সকে নার্সিং রয়েল ইনস্টিটিউট অব হেল্থ সায়েন্স শিক্ষা প্রদান করে। তাছাড়া মালদ্বীপ সরকারের অনুরোধে ভূটান সরকার মালদ্বীপের স্বাস্থ্যখাতে সহযোগিতা করতে রাজী হয়। এর বিপরীতে মালদ্বীপ সরকার ভূটানিদের হোটেল এবং ক্যাটারিং সার্ভিস বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করতে রাজী হয়। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত দু'দেশের অফিসিয়ালদের মধ্যে অবিরত যোগাযোগ হলে এরপর তাদের মধ্যে তেমন কোন চুক্তি সম্পদিত হয়নি। ১৯৮৫ সালে সার্ক গঠিত হওয়ায় দুটি দেশই সার্কের

অর্ন্তভূক্ত হয়। সার্ক গঠনের পর এ দুটি দেশের কূটনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক আঞ্চলিক জোট গঠন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অধিষ্টিত পঞ্চম ও নবম সার্ক সম্মেলনে ভূটানের রাজা জিগমে সিংহে ওয়ান চুক অংশ গ্রহণ করেন, তেমনি ১৯৯১ সাল এবং ১৯৯৫ সালে সার্কের চেয়ারম্যান হিসেবে এবং ১৯৮৭ সালে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মোঃ আব্দুল গাইয়ূম ভূটান ভ্রমণ করলেও দু'দশের মধ্যে বর্নণামূলক তেমন কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। তবে দু'দশের মধ্যে সৌর্হাদ্যমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান, যার ফলশ্রুতিতে অতিমাত্রায় জোয়ার ভাটার ফলে মালদ্বীপ ক্ষতিগ্রস্থ হলে ভূটান ১ মিলিয়ন গুলট্রাম সম-মূল্যের রিলিফ প্রদান করে। তাছাড়া মালদ্বীপ ভূটান সম্পর্ক সার্কের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।[১] তাছাড়া দুটি দেশের-ই ভৌগলিক অবস্থান তাদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরির বৈরী আবহাওয়ার পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। ভূটান সম্পূর্ণ স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র। অপরদিকে মালদ্বীপ দ্বীপ রাষ্ট্র। সুতরাং এ দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সু-সম্পর্ক তৈরির জন্য সার্কভূক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর আন্তরিকতা ও সদ্ভাব অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া এ দুটি দেশের মধ্যে সু-সম্পর্ক তৈরি হওয়া দূরূহ ব্যাপার। যেমন- উদাহরণসরূপ বলা যায়, মালদ্বীপ ১৯৬৫ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত মালদ্বীপের সাথে অন্যান্য দেশের দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা আস্তে আস্তে দুর করে মালদ্বীপের সাথে অন্যান্য দেশের সুরেলা সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান করেছে। পারস্পরিক সমঝোতা ও ঘনিষ্ট সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত ও মালদ্বীপ তাদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন করেছে। ১৯৭৬ সালে দুই উভয় দেশ তাদের সামুদ্রিক সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি চুক্তিতে পৌছেছিল। মালদ্বীপের এটল দ্বীপগুলি সামরিকভাবে দুর্বল তা সত্ত্বেও ভারত তাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি সম্মান বজায় রাখার অঙ্গীকার করেছে। মালদ্বীপের আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারত সংবেদনশীল সম্মান প্রদর্শন করে। তাছাড়া স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে মালদ্বীপের বৈদেশিক শাক্তি ও কৌশলগত গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য গণআইল্যান্ডকে মালদ্বীপের পক্ষ থেকে ইজারা প্রদানে অস্বীকার করাতে ভারত সমর্থন প্রদান করে। এর অংশ হিসেবে ভারত মালদ্বীপের ছোট রাজ্যগুলির নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং ১৯৮৮ সালে মালদ্বীপের অভ্যুথানের সময় ভারত মালদ্বীপকে সামরিক সহায়তা প্রদান করে। ২০০২ সালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী A.B.Vajpayee মালদ্বীপের রাজধানী মালে সফরে যান এবং তখন মালদ্বীপের উপকূলীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় মালদ্বীপের নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুসজ্জিত করার প্রস্তাব দেন। ভারত মালদ্বীপে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে মালদ্বীপের অবকাঠামো বিকাশে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই সহায়তার অধীনে প্রথম

প্রকল্প ছিল একটি মাছের স্ক্যানিং প্লান্টের সহায়তা প্রদান। ১৯৭৭ সালে ভারত মালদ্বীপে বিমান বন্দর স্থাপনে সহায়তা প্রদান করে এবং সেটিকে আধুনিকীকরণ করে। ১৯৮৬ সালে ভারত মালদ্বীপের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে চুক্তির অধীনে ভারত মালদ্বীপে দুইশত বিছানাসহ একটি সাধারণ হাসপাতাল, একটি নার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, একটি কেরোনারী ইউনিট এবং টেলিযোগাযোগ আবহাওয়া বিজ্ঞান ও তাদের প্রাচীন মঠের সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে। ১৯৯০ সালে ভারত মালদ্বীপে গ্রীন হাউজ প্রভাব প্রতিরোধের জন্য একটি পরিবেশগত সহায়ক প্রোগ্রাম এবং তার পাশাপাশি বিদেশী অফিসে বেসামরিক কর্মচারীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সংগঠনে সহায়তা প্রদান করে। তাছাড়া বিগত বছরগুলোতে ভারত মালদ্বীপকে তথ্য-প্রযুক্তি, পর্যটন এবং কৃষি শিল্পে সহায়তা বৃদ্ধি করেছে। [২]

একইভাবে দুটি অসম দেশের সুনিবিড় বন্ধুত্বের একটি বিরল ঘটনা উপস্থাপন করেছে ভারত ও ভূটান। মালদ্বীপ ছাড়া ভারতের সাথে কারো বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি, তবে ১৯৪৯ সালের ৮ আগষ্ট ভারত ভূটানের সাথে বিশেষ সম্পর্কগুলো চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের চুক্তি দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চুক্তিটির ২ নম্বর ধারাটি তাদের সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এটি ভূটানের অভ্যন্তরীন প্রশাসনে ভারতের হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতিলিপি, যা তাদের সম্পর্কের সাবেক পরামর্শক দ্বারা সহমতে পৌছেছে এবং তারা এর পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করবেন। প্রতিরক্ষা বিষয়ক বিষয়ে ভূটান ভারত থেকে বা ভারতের মাধ্যমে অস্ত্র আমদানি করতে সম্মত হয়েছে। চুক্তিটি দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছে এবং একে অপরের নাগরিকদের স্বচ্ছতার বিধান অর্ন্তভুক্ত করেছে। এটি পারস্পরিক সম্মতি দ্বারা স্থগিত বা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত চিরস্থায়ী একটি চুক্তি। ভূটান চুক্তিটি সংস্কারের জন্য অব্যাহত ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যদিও এটির সংশোধনের যথেষ্ট সমালোচনা বিদ্যামান রয়েছে। ভূটান স্থলবেষ্টিত ও স্বল্পোন্নোত দেশ হওয়ায় অর্থনৈতিক সহায়তা এবং উন্নয়নের জন্য ভারতের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। ভারত ভূটানের প্রথম দুইবার ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনাকে পুরোপুরি অর্থায়ন করে এবং পরবর্তী পরিকল্পনাগুলোতে আংশিক অর্থায়ন করেছে। ভারত ভূটানে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক খাতে সহযোগিতাসহ চুক্কা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ২৪৪০ মিঃ রূপি সহায়তা প্রদান করেছে। ভারতে বিদ্যুৎ রপ্তানি করে ভূটান তার রাজস্বের ভারত কর্তৃক ৪০% সংগ্রহ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ভারত কতৃক নির্ধারিত মোট সাহায্যের ৫০ শতাংশ পায় ভূটান। ভূটানের মোট আমদানির শতকরা ৭০ ভাগ এবং রপ্তানির ৯০ ভাগ ভারতের সাথে সম্পাদিত হয়। আমদানি রপ্তানি সুষ্টুভাবে পরিচালনার জন্য ভারত ভূটানকে ১৩টি ট্রানজিট রুট প্রদান করেছে।

ভূটান ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য আরো ট্রানজিট রুট দাবি করে আসছে। পাঁচ দশক ধরে ভারত- ভূটান সম্পর্ক উষ্ণতা এবং বন্ধুত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে।[৩] এ দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সু-সম্পর্ক তৈরির জন্য ভারতের আন্তরিকতা ও সদ্ভাব অত্যন্ত প্রয়োজন।

ভূটান ও মালদ্বীপ সাদৃশ্য :

১. ভূটান এবং মালদ্বীপ উভয়ই জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য বিশ্বের অন্য সব দেশের সাথে সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে।

২. দু'দেশই (Under development). স্বল্পোন্নোত দেশ।

৩. দুটি দেশই দারিদ্রতার সাথে লড়ছে।

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ ব্যবসা বাণিজ্যের দরকার তা এ দুটি দেশে তার অভাব রয়েছে।

৫. ভূ-রাজনৈতিক (Geo-strategic) কারণে এ দুটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিও একই রকম। ভূটান ১৯৪৯ সালে ভারতের সাথে চুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে, অপরদিকে মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কার সাথে সমঝোতা করে চলেছে।

৬. দু'দেশই জাতিসংঘ সনদ মেনে চলে এবং NAM এর সদস্য।[৪]

৭. উভয়ই SAARC এর সদস্য ।[৫]

এদুটি দেশের সম্পর্ক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মালদ্বীপ ও ভূটান দুটি দেশই ভারতের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই ভারতের সদিচ্ছা ব্যতীত অপরাপর দেশসমূহের সাথে বাণিজ্যিক সু-সম্পর্ক স্থাপন এদুটি দেশের জন্য একটি দূরূহ ব্যাপার।

তথ্যনির্দেশ

১. World Wildlife Fund (2001),"Maldives-Lakshadweep-Chagos Archipelago tropical moist forests", Wild World Ecoregion Profile, National Geographic Society,Archived from the original on 2010-03-08. Retrieved 30 December 2010.

And "Bhutan", World Institute for Asian Studies. 21 August 2006, Archived from the original on 1 August 2006,Retrieved 23 April 2009.

এবং বিশ্ব ডাক সংস্থা (অফিসিয়াল ওয়েবসাইট)

২. Phadnis Urmila and Ela Dutt Luithui,"Maldives : Winds of Change in an Atoll State", (Article: New Delhi, South Asian, 1986), web. archive.

৩. Kohli Manorama,"Dependency to Interdependence", A Study of Indo-Bhutan Relations, (Article: New Delhi, Vikas, 1993). web. archive.

৪. https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement#Countries.

৫. Upper middle income, World Bank, Retrieved-18, sep 2015.

উপসংহার

হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণে ভূটান ও বাংলাদেশ অবস্থিত এবং ভারত মহাসাগরের দ্বীপ রাষ্ট্র মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত। দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশগুলোর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি, তাছাড়া অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত ও দরিদ্র, অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত। ফলে এ দেশগুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলে সংজ্ঞায়িত। সুতরাং এসব দেশের উচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক জোট গঠন করে বৃহৎ শক্তির কূটনীতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং নিজেদের মধ্যে আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সমৃদ্ধ অর্জন করা। এ তিনটি দেশ যদি একত্রে কাজ করে তবে তিনটি দেশের জন্যই তা হবে মঙ্গলজনক ও কল্যাণকর। বিশ্বায়নের যুগেও বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো অনেক সুবিধা বঞ্চিত। তাই এই সব দেশের উচিত নিজেদের মধ্যে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা। অভিসন্দর্ভের মূল আলোচনায় তিনটি দেশ সম্পর্ককে মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি দেশের পরিচিতি, পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য, মূলনীতি নির্ধারকসমূহ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক অবস্থা, সার্কের মাধ্যমে অর্থনীতিকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, বাণিজ্য ও ভৌগোলিক সম্পর্কের খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

বর্তমান যুগ সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিকতার যুগ। স্নায়ু যুদ্ধোত্তর নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় বিশ্বায়নের কারণে মুক্তবাজার অর্থনীতির এ যুগে কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। নানা কারণে এক দেশকে অন্যদেশের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। ক্রমবর্ধমান শিল্প-বাণিজ্য ও উন্নয়ন প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রসমূহকে জোটবদ্ধ করেছে। তাছাড়া উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এখন দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। ফলে বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক জোট গঠনের বিষয়টি ক্রমশ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ইইউ, এপেক, নাফটা ও আসিয়ান প্রভৃতি জোটের মত দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোও সার্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিসহ গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করে চলেছে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলো এগিয়ে চলেছে। এশিয়ার হাইওয়ে ও ট্রানজিট নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। ভূটান

বাংলাদেশের অভ্যন্তর দিয়ে ট্রানজিট ও সমুদ্র বন্দর ব্যবহারে আগ্রহী। সিলেটের তামাবিল, লালমনিরহাটের বুড়িমারি ও শেরপুরের নওকা দিয়ে ভূটান-বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়টি আলোচনাধীন। এ বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ভারত এক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভূটানের সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হলে ভূটান মংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পাবে। এতে তৃতীয় কোন দেশের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের দ্বার উন্মোচিত হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূটানে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের আগ্রহ ব্যক্ত করে বিদ্যুৎ ক্রয়েরও প্রস্তাব দিয়েছেন। শান্তিপূর্ণ ও দারিদ্র্যমুক্ত দক্ষিণ এশিয়া গড়তে ভারতের বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব প্রয়োজন । দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি এবং সমঝোতা স্মারক দু'দেশের পারস্পরিক অমীমাংসিত বিষয়ের সন্তোষজনক সমাধানের পথ নির্দেশনা তৈরি করবে। বহুল আলোচিত ও প্রত্যাশিত ইতিবাচক প্রয়াসগুলোকে অগ্রসর করতে পারলে প্রতিবেশী দেশটির সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সন্ত্রাসদমন, ট্রানজিট, সীমান্ত বিরোধ ও ব্যবস্থাপনা, পানিবন্টন, বাণিজ্য বৈষম্য বিলোপ এবং বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৫০দফা যৌথ আলোচনার কথা চলছে। এর উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হল : (১) তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে জেআরসি বৈঠক, (২) ভারতে শুল্কমুক্ত পণ্য প্রবেশের অধিকার পাবে বাংলাদেশ, (৩) বাংলাদেশকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিতে ভারতের সম্মতি, (৪) রেলওয়ে উন্নয়নে বাংলাদেশকে এককালীণ ১০০ কোটি ডলারের ঋণ সহায়তা প্রদান, (৫) ৩০০ বাংলাদেশীকে শিক্ষাবৃত্তি দেবে ভারত, (৬) দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ও তিনবিঘা করিডোর ফ্লাইওভার নির্মাণ, (৭) ভূটান ও নেপালের পণ্যবাহী ট্রাক জিরো পয়েন্ট থেকে বাংলাবান্ধা ও ফুলবাড়ী সীমান্ত স্থলবন্দরে ২০০ মিটার রাস্তা ব্যবহার করতে পারবে, (৮) চট্রগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করতে পারবে ভারত, (৯) দু'দেশ একে অন্যের সমুদ্র, রেল ও সড়কপথ ব্যবহার করবে, (১০) ২০১১ সালে রবীন্দ্রনাথের ১৫০তম জন্ম বার্ষিকী দু'দেশের যৌথ উদ্যোগে উদযাপন, (১১) নেপাল ও ভূটানে ট্রানজিটের জন্য বাংলাদেশকে ভারতের সীমান্ত ব্যবহারের সম্মতি, (১২) বাংলাদেশের আশুগঞ্জ ও ভারতের শিলঘাট বন্দরকে পোর্ট অব কল ঘোষণা, (১৩) দু'দেশের সীমান্ত সমস্যা মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির আলোকে সমাধান, (১৪) রোহনপুর-সিঙ্গাবাদ ব্রডগেজ রেল যোগাযোগ চালুর বিষয়ে

ঐক্যমত, (১৫) ইছামতি নদী খনন এবং মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিখ, আত্রাই, ধরলা ও ফেনী নদীর তীর সুরক্ষায় পদক্ষেপ, (১৬) BSTI-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতের সহায়তা ঘোষণা, (১৭) সাবরূম-রামগড় এবং দেমাগিরি-যেগামুখ স্থলশুল্ক স্টেশন সক্রিয়করণ, (১৮) ২০১১-১২ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্যপদ লাভে ভারতকে এবং ২০১৬-১৭ সালে একই পদে বাংলাদেশকে ভারত সমর্থন জানাবে।[১] উপযুক্ত চুক্তির বাস্তবায়নের আলোকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ-ভারত দুটি দেশই অর্থনৈতিকভবে উপকৃত হবে। বাংলাদেশের চট্রগ্রাম ও মংলা বন্দর ভারতসহ যদি এই অঞ্চলের দেশগুলো ব্যবহার করে তবে বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবেই উপকৃত হবে। এছাড়া প্রতিবেশী দেশ যাদের সমুদ্র বন্দর নেই, তারা এদেশের সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করলে বাংলাদেশের কিছু বাড়তি আয় হবে। তবে প্রতিবেশী দেশগুলো যাতে বন্দর ব্যবহার করতে পারে সেই অনুযায়ী তা উন্নত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, এবং জনবল উন্নয়ন প্রভৃতি। ভারতের সাথে সমঝোতা অনুযায়ী বাংলাদেশের দু'টি সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। দু'টি সমুদ্র বন্দরেই আসা-যাওয়ার রাস্তা অর্থাৎ রেল ও সড়কের উন্নয়ন করতে হবে। যদি চট্রগ্রাম বন্দর ভারতকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তবে আখাউড়া থেকে চট্রগ্রাম রেলপথের উপর অনেক বেশি চাপ পড়বে। এজন্য রেলের এই অংশে আরেকটি লেন তৈরি করতে হবে। কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট-আগারতলা পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন করতে হবে। নেপাল ও ভূটানের মংলা বন্দর ব্যবহারের বিষয়টি আগে থেকেই আলোচিত। নেপাল ও ভূটান যদি মংলা বন্দর ব্যবহার করে তবে ভারতের ভূমি ব্যবহার করার জন্য নেপাল ও ভূটান সরকারকে ভারতের কাছে আবেদন করতে হবে। আঞ্চলিক যোগাযোগ ও সহযোগিতার ব্যাপারে বাংলাদেশ রাজি হলে ভারতকে এই আবেদনে সাড়া দিতে হবে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গ ও মংলা বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। ফলে মংলা বন্দরের ২০-২৫ ভাগ কার্যক্ষমতার পরিবর্তে বন্দরের পুরো কার্যক্ষমতা ব্যবহার করা যাবে। এজন্য দু'দেশের রেলপথ ও সড়কপথের উন্নতি প্রয়োজন। ভারত থেকে রোহনপুর-বেনাপোল হয়ে খুলনা আসবে। এর ফলে রেলপথের ওপর চাপ বাড়বে এজন্য সড়কপথের উন্নয়নের পাশাপাশি রেলপথেরও উন্নতি আবশ্যক। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বন্দরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। এক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট করা দরকার যে, বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দেশের। কারো হাতে এই নিরাপত্তার ভার ছেড়ে দেওয়া যায় না। বন্দর ব্যবহার করতে হলে

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের কাছে বন্দর দিয়ে আসা-যাওয়া করা পণ্যের তালিকা দিতে হবে। ভারতের উলফাসহ বিচ্ছিন্নতাবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর তৎপরতার বিষয়টি তুলে ধরে অনেকে নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা করেন। সেক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, বাংলাদেশ তার ভূ-খণ্ড কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী দল বা গোষ্ঠীকে ব্যবহার করতে দেবে না, পাশাপাশি উলফাসহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও বাংলাদেশকে ব্যবহার করা যাবে না। নেপাল ও ভূটান যদি বাংলাদেশের স্থল, নৌ ও আকাশপথ ব্যবহার করে তৃতীয় কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে চায়, তাহলে ভারতকে সমঝোতা চুক্তিস্বাক্ষর করতে হবে। ভারত যদি এটা করতে না চায় তাহলে আঞ্চলিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা এবং এ অঞ্চলের উন্নয়ন পুরোপুরি অর্জিত হবে না। এদিকে মংলা বন্দর ভারত ব্যবহার করার জন্য বাংলাদেশের ট্রাক ব্যবহার করবে। এজন্য সড়কপথের উন্নয়ন করতে হবে। এশিয়ান হাইওয়ের সাথে এসব সড়ক সংযুক্ত হলে প্রতিবেশী দেশগুলো সহ সবাই উপকৃত হবে। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও দুই দেশের মধ্যে সাফটা চুক্তির আওতায় একটি সম্পর্ক আছে কিন্তু উপ-আঞ্চলিক সম্পর্কটা আরো জোরদার করা উচিত। এ সম্পর্ক জোরদার হলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তা স্পষ্ট ও দীর্ঘ প্রভাব রাখবে। ভারত বাংলাদেশের রপ্তানী বৃদ্ধির সঙ্গে আরেকটি বিষয় জড়িত, সেটা হল উত্তর-পূর্ব ভারতে বাণিজ্য সুবিধা বাড়ানো। ভারতে পাট রপ্তানিও একটি সম্ভাবনাময় খাত ছিল। কিন্তু পাটের উপর লেভেলিং করাটাও পাট রপ্তানির জন্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানির ৯০% হয় ল্যান্ড কাস্টমসের মাধ্যমে। এই ল্যাণ্ডকাস্টমসের পর্যায়ে বাংলাদেশের বড় দুর্বলতা আমদানি-রপ্তানিকারক ভোক্তাদের খরচ বেশি। এজন্য ল্যাণ্ডকাস্টমসের অবকাঠামো উন্নয়নে জরুরি। এটা করতে পারলে চীন, ভূটান, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি হবে এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। ভারতের পাশাপাশি চীন, ভূটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কাতে যদি বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা বাড়ে তাহলে রপ্তানির পরিমাণ অবধারিত ভাবেই বাড়বে।[২] বিশেষজ্ঞদের মতে, মংলা ও চট্রগ্রাম বন্দর থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্য উন্নয়নে সেগুলো খুব ভালভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এজন্য এই বন্দরগুলোর উন্নতি আবশ্যক। গভীর সমুদ্রবন্দর নিউমুরিং নিয়েও একই কথা বলা যায়। সেখানেও উন্নত সুবিধার ব্যবস্থা করা হলে বাণিজ্য সুবিধা বাড়বে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গেও বাংলাদেশের যোগাযোগকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। দক্ষিণ

এশিয়ার এই উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রসঙ্গে ভারতের সাবেক কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রী সোমপাল শাস্ত্রী বলেন যে, দক্ষিণ এশিয়ার পানি সমস্যার সমাধান করতে হলে বাংলাদেশে ও ভারতের একসঙ্গে আলোচনা করা ছাড়া বিকল্প নেই। এছাড়া জলবিদ্যুৎ নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ কৌশল, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূষণরোধে দুই দেশের একসঙ্গে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। টিপাইমুখ বাঁধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কোন কিছু ভারত করবে না। তিনি আরো বলেন যে, বড় দেশ ও বড় স্থাপনা একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। তবে এক্ষেত্রে বড় দেশকে সব সময় ছোটদেশের প্রতি উদার হতে হবে। তাহলে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। এদিকে নেপালের সাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রী দীপক গেওয়ালি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য পানি শুধু পান করার জিনিস নয়, এটি এ অঞ্চলের মানুষের জন্য একইসঙ্গে জীবিকা, প্রকৌশলবিদ্যা, সমাজ, রাজনীতি ও কবিতার অংশ। তিনি আরো বলেন যে, ফারাক্কা একটি ভুল চুক্তি। কিন্তু তার বাস্তবায়ন নিয়ে সমস্যা রয়ে গেছে। তিস্তা বাঁধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তিস্তা নদীর কয়েক কিলোমিটার সীমানার মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের দুটি ব্যারেজ নির্মাণ করেছে। এটা বড় ধরনের অপচয়। এই বাঁধের টাকা দুই দেশের মানুষের কর থেকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পানি সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না। অথচ আগে থেকেই দু'দেশ আলোচনা করে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করতে পারত। এতে আঞ্চলিক টানাপোড়ন কমত। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ লাভবান হতো।[৩] মালদ্বীপ পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় আমদানি নির্ভর মালদ্বীপ বাংলাদেশের রপ্তানীর বিশাল বাজার হতে পারে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে মালদ্বীপের সাথে যৌথ প্রযোজনায় পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এবং এর সাথে সম্পৃক্ত জনবল রপ্তানী, ঔষধ রপ্তানী প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে পারে। এছাড়া আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দু'দেশের সম্পর্ককে আলোচনায় সীমিত না রেখে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।[৪] সার্কের মাধ্যমে এবং দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে বহু সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র নিয়ে এ তিনটি দেশের মধ্যে ধারাবাহিক আলোচনা হচ্ছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত এ আলোচনার প্রাথমিক পর্যায় বলা যায়। ভারত এবং শ্রীলঙ্কার সদিচ্ছায় এসব

আলোচনা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়। কার্যকর হলে তা দক্ষিণ এশিয়ার সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

সুতরাং একবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আঞ্চলিকতার যুগে একটি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এই উপআঞ্চলিক সম্পর্ককে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন। সমঝোতা স্বাক্ষরের শর্তগুলো দ্রুত বাস্তবায়নেই দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করবে। এছাড়া সাফটা কত দ্রুত কার্যকর হয় সেটাও দেখার বিষয়। তাছাড়া উপআঞ্চলিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের অবকাঠামো উন্নয়ন অবধারিত। আলোচিত গবেষণার মাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়েছে যে গুলোর বাস্তবায়ন জরুরী যেমন- বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও ভূটান পর্যটন প্যাকেজট্যুর, বাংলাদেশ ও ভূটান জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং ট্রানজিট, বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ স্বাস্থ্যখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি, আমদানি, রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি। এভাবে সঠিক ও সময়োপযোগী চিন্তার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে এবং উপআঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। উপআঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বৃহৎ শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলো একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশগুলোকে ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. opinion: bdnews24.com/ bangla/ archives/3616. (Online)

২. Ibid.

৩. Ibid.

৪. bangladesh 24.com-16 nov 2012
http ://wwwbdnews 24. com/ditails.php?eid=2 and id= 58692
এবং মোস্তফা কামাল,“আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাংলাদেশ”, (ঢাকা : অবসর প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি-২০০২), পৃপৃঃ ৭৭-৭৮ ।

গ্রন্থপঞ্জি

সরকারি উৎস:

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মালদ্বীপের সংবিধান (Article-02) (Article-09), মালদ্বীপের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকারের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশের পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সংস্থা, National Board of Revenue, Bangladesh Manufactures and Exporter Association, Cabinet Members, Government Portal, ভূটান সরকারের ওয়েবসাইট, ভূটানিকা, ভূটানের পর্যটন পরিষদ সরকারি ওয়েবসাইট, Bangladesh Bureau of Statisties, Ministry of Planning, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Annual Export Receipts. Bangladesh Book, Import-Export Payment by Countries, Statistical Department of Bangladesh Bank, Bangladesh Ministry of Science and Information and communication technology, Ministry of Foreign Affaris, Ministry of Trade, Ministry of Finance. বাংলাদেশের সংবিধান, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গবেষণা অভিসন্দর্ভ :

বাংলাদেশ- নেপাল সম্পর্ক, ১৯৭১- ১৯৮১, সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পি.এইচ.ডি. ।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক, ১৯৭১-১৯৮১, আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পি.এইচ.ডি. ।

বাংলাদেশ চীন সম্পর্ক, ১৯৭১-১৯৮১, এ. কে.এম জসিম উদ্দিন, এম.ফিল থিসিস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।

Books:

Emajuddin Ahmed, "Foreign policy of Bangladesh : A small states Imperative Dhaka", (Dhaka University press Limited, Dhaka- 1984).

Emajuddin Ahmed, "Society and polities in Bangladesh", (Dhaka : Academic Publishers. Dhaka, ed 1989).

Ahmed Moudud, "Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman", (Dhaka University Press Limited, Dhaka -1984)

Alamgir Muhiuddin Khan, "Land Reform in Bangladesh", (Dhaka : Centre for social studies. ed. 1981)

Ihtesham Kazi, "International Affairs:Global Concerns of the 21st century", (New Delhi:Pip International Publication , 2008)

Ayoob Mohammed and others, "Bangladesh A struggle for nationhood", (Delhi : Vikas publications, 1971).

F.S. Northedge, "The nature of foreign policy" in F.S. Northedge (ed). "The Foreign Policies of the Powers", (London: Faber and Faber, 1968).

Emajuddin Ahmed, "Bangladesh and the Policy of Peace and Non alignment", Asian Affairs, Voll. 111. No. 2 (June 1981), P-126

Azar Edward E, "National Security in the Third World", (London : Edward Elgar Publishing House, 1988).

Bahadur Kalim, "South Asia in Transition", (Delhi : Indian Center for Regional Affairs, 1986).

Bhutto Zulfikar Ali, "The Third World New directions" (London: Quartet Books, 1977).

Denis wright, "Bangladesh Origins and Indian Ocean Relations (1971-1975)", (Dhaka: Academic Publishers, 1988).

Jahan Rounaq, “Bangladesh Politics, Problems and Issues” (Dhaka: UPL, 1980).

Jha S.K. Uneasy Partners, “India and Nepal in the post colonial Era”, (Delhi: Manas Publications, 1975).

Khan Zillur R, “Saarc and the Superpowers”, (Dhaka : UPL, 1991).

Khurshid Ahmed, “Pakistan, Bangladesh and Politics of South Asia”, (Karachi : Noorsi Publications, 1973).

Madan Davinder Kumar, “Indo-Bangladesh Economic Relations and Saarc”, (Delhi : Deep & Deep, 1996).

Mehta Narinder, “Foreign Policies of Indian and her Neighbours : India, Pakistan, Srilanka, Nepal, Bhutan and Bangladesh”, (Jullundhur : New Academic Press, 1977).

Narain Virendra and Upreti, “Saarc-A study of Perceptions and Politics” (Delhi : South Asian Publications Ltd., 1971). B.C (eds)

Raghavan Sudia, “The Indian Ocean Power Politics” (Delhi : Lancers Books, 1996).

Sharma S.R, “Bangladesh Crisis and Indian Foreign Policy”, (Delhi : Young Asia Publications, 1987).

Sobhan Rehman,“The Crisis of External Dependence, The Political Economy of Foreign Aid to Bangladesh”, (Dhaka : UPL, 1982).

Tinker Hugh, “South Asia: A Short History”, (London : Pall Mall Press, 1966).

Upreti B.C. and Ramkakant, “Indo-Nepal Relations”, (Delhi : South Asian Publications, 1992).

Varma S.P. and Mishra, K.P, “Foreign Policies of South Asia”, (Jaipur : Rajasthan, University Press, 1969).

Zafarullah Habib, “The Zia Episode in Bangladesh Politics”, (Delhi : South Asian Publishers, 1996).

Ziring Lawrence, “Bangladesh- Mujib To Ershad-An Interpretive Study”, (Dhaka : UPL, 1992).

আতিউর রহমান, “ সার্ক : রাজনৈতিক অর্থনীতি”, (ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৮৫)।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, “ বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও জাতীয় ঐকমত্য”, (ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯৬)।

আহমেদ মাযহার সম্পাদিত,“শেখ মুজিব : সংগ্রামী জননায়ক ও রাষ্ট্রনায়ক”,(ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৩)।

কামরুদ্দিন আহমেদ, “ স্বাধীন বাংলার অভ্যূদয় এবং অতঃপর”, (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮২)।

আবুল কালাম, “ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : তত্ত্বীয় ও বাস্তব রূপ”, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯০)।

মুনির উদ্দীন আহমদ (সম্পাদক), “বাংলাদেশ : বাহাত্তর থেকে পচাঁত্তর”, (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৮০)।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, “বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা”, (ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, ১৯৮২)।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, “ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ”, (ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৫)।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, “বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্র নীতি, বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া ও সাম্প্রতিক বিশ্ব”, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬)।

United Nations Record:

United Nations, UN Resolution on Membership of Bangladesh, Foreign Affairs, Water Resources Journal-Economic & Social Communication for Asia and Pacific.

SAARC

SAARC Chartered

SAARC Summit (Annexes)

News Paper:

The Bangladesh Observer Dhaka, January 14, 1972.

The Daily Star, May 09, 2012

The Bangladesh Times

The Bhorer Kagoj

The Times of India

The Daily Ittefaq

The Daily Star , July 15,2011

bangladesh24.com-16 Nov. 2012

Mahmudul Hasan, Reporter Desh T.V.

New Bangla -11 nov, 2011

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা :

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

Journal:

Journal of Bangladesh Institute of Inter National and Strategic Studies (BIISS)

Journal of International Relation, University of Dhaka,

Journal of South Asian and Middle Eastern Studies,

Asian Affairs

South Asian Journal

Bangla Pedia

Far Eastern Economic Review

Foreign Affairs

History Today

International Affairs

Pacific Affairs (Vancouver)

The Journal of Commonwelth and Comparative Politics (London)

Journal of International Affair Journal of Regional Studies,

Journal of International Ethnic Studies,

Asian Affairs, Vol. III, No. 2 (June, 1981),

Journal of Asian Studies.

Bureau of South and Central Asian Affairs (March-2008).

Annual Report 2004-5 Bangladesh Bank.

Schreiner, Mark (2003) A Cost Effectiveness.

Website:

http://www.everyculture.com/ja-ma/maldives.html

[N+IP Foreign. gov. mv/new+PL /news/ Article/ Iod]

http:///news.bbc.co.uk/2/h;south_asia/country_profiles/1166513.stm

http://www.bhutannica:org/

http://www.bhutan.govt.bt/

http:///news.bbc.co.uk/2/h;south_asia/country_profiles/1166513.stm

http://www.bhutannica:org/

http://www.bhutan.govt.bt/

Serchpremier Web 8 December 2011

http://www.world66.com/Asia/Southasia/bhutan/economy

Ministry of Tourism. Retrieved 3 April 2009

"Ministry of Foreign Affairs, Maldives", Foreign.gov.mv. Retrieved 2010-06-30.

Maldives, The World Bank

www.bdnews24.com

H.C.P. Bell, "The Maldive Islands; Monograph on the History, Archaeology and Epigraphy", (Reprint Colombo 1940. Council for Linguistic and Historical Research, Male' 1989).

H.C.P. Bell,"Excerpta Maldiviana",(Reprint Colombo 1922/35 edn. Asian Educational services, New Delhi 1999).

Xavier Romero-Frias, "The Maldive Islanders, A Study of the Popular Culture of an Ancient Ocean Kingdom", (online book).

Kalpana Ram, "Mukkuvar Women", (Macquarie University press, 1993).
(online book)

Clarence Maloney, "People of the Maldive Islands", Orient Longman. (online book).

H.A. Maniku & G.D. Wijayawardhana, "Isdhoo Loamaafaanu, Royal Asiatic Society of Sri Lanka", (Colombo 1986). (online book)

Xavier Romero-Frias, "The Maldive Islanders, A Study of the Popular Culture of an Ancient Ocean Kingdom", (Barcelona 1999, ISBN 84 7254 801 5).

Divehi Tārīkhah Au Alikameh, Divehi Bahāi Tārikhah Khidmaiykurā Qaumī Markazu. Reprint 1958 edn. Male' 1990. (online book)

Skjølsvold Arne, "Archaeological Test-Excavations On The Maldive Islands", (The Kon-Tiki Museum Occasional Papers, Vol. 2. Oslo 1991).

Begum N, "Enforcement of Safety Regulations in Garments Sector in Bangladesh, Proc. Growth of Garments Industry in Bangladesh Economic and Social Dimension", report- 2001, pp. 2008-226. (online)

HCP Bell, "The Maldive Islands, An account of the physical features, History, Inhabitants, Productions and Trade",(Colombo 1883, ISBN 81-206-1222-1).

Lincoln and Alvey Padelford,"Foreign and Domestic Policy must be mutually supporting it national policy aspirations are to be achieved in a atmosphere of political stability".

"International Religious Freedom Report 2007 - Bhutan", U.S. Department of State, 2007-09-14. Retrieved on 2008-01-06

Maldives History – original records, articles and translations

"The formation of foreign policy represents on its domestic side, a continuous series of compromises and adjustments between the different elements of governments and social structure", This article incorporates public domain material from websites or documents of the Library of Congress Country Studies.World Statesmen

1979 Wrold Bank Atlas : Population, Percaptia, Production and Growth Rates, pp-12-21.

Schreiner Mark,"A cost-Effectiveness Analysis of the Grameen Bank of Bangladesh", (Analysis-2003), Development Policy Review 21(3) : 357-382. doi10.IIII/467-7670.00215

GN H Survey 2010, The centre for Bhutan Studies, Retrieved 17 October 2013.

Member information on : India and WTO, World Trade Organization Archived from the original on 22 April 2009, Retrieved 23 April 2009.